শতবর্ষের বাংলা

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স
৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রকাশক : শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রবর্ত্তক পাব্লিশার্স
৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ
জন্মাষ্টমী, ১৩৬৩
মূল্য—ছয় টাকা

মুদ্রাকর : নির্ম্মলা ঘোষ
সঙ্ঘপ্রেস, চন্দননগর

নিবেদন

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ১৩৩০ সনের পূজা সংখ্যা "প্রবর্ত্তক"-এ "শতবর্ষের বাংলা" বাহির হইয়াছিল। সেই সংখ্যা "প্রবর্ত্তক" প্রকাশ হওয়া মাত্র নিমেষে নিঃশেষ হইয়া যায়। অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার আগ্রহাতিশয্যে উহা অবিলম্বে অংশতঃ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। যুগের সংশয়দোদুল কুজ্ঝটিকাময় রাজনৈতিক আব্‌হাওয়া খেয়ালে রাখিয়া, উহার প্রথম খণ্ডই তখন সন্তর্পণে পুনর্ম্মুদ্রিত করা হয়। জাতীয়তার প্রখ্যাত মনীষী ও প্রবক্তা বিপিনচন্দ্র পাল বইখানির একটি ক্ষুদ্র কিন্তু মর্ম্মস্পর্শী ভূমিকা লিখিয়া দেন। দেখিতে-দেখিতে এ-বইও নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম হয়।

যদিও আমাদের অন্তরের আশঙ্কা অমূলক ছিল না, তবুও বলিব যে, অতি অপ্রত্যাশিত ভাবেই ঠিক এই সময়েই রাজরোষের উদ্যত বজ্র সহসা নীলাকাশ হইতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া শুধু পূজাসংখ্যা "প্রবর্ত্তক" মাসিক পত্র নয়, শুধু "শতবর্ষের বাংলা" নয়, তদানীন্তন মুদ্রিত ও প্রকাশিত সমগ্র "প্রবর্ত্তক"-সাহিত্য অর্থাৎ গোটা "প্রবর্ত্তক" প্যাবলিশিং হাউস"টীর সকল বই ও পত্র-পত্রিকারই ব্রিটিশরাজের নিবন্ধন Customs Act" বিধি-প্রয়োগে প্রকাশক্ষেত্রে ফরাসী কুজ্ঝটিকাগর হইতে ইংরাজাধিকৃত ভারতরাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়া তাঁহারা সে দারুণ অগ্নিপরীক্ষায় কিশোর প্রবর্ত্তকসঙ্ঘকে তার ইংরাজী ও বাংলা মুখপত্রাদি তথা সমস্ত প্রকাশিত সঙ্ঘগ্রন্থাবলী সহ এই মৃত্যুবজ্র বুকে বহিয়াই অগ্নিশুদ্ধ নবজন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

অতঃপর চন্দননগর হইতে রাজনগরী কলিকাতায় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের

মুক্ত আত্মপ্রকাশ ও নূতন জীবনকেন্দ্র, কর্ম্মশালা ও প্রকাশ-বিভাগস্থাপন—সে এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক ঘটনা ও জীবন্ত সত্য।

সেই ঐতিহ্যময় পটভূমিতে দাঁড়াইয়াই আজ আমরা বাক্‌সিদ্ধ সন্তগুরুর অজস্র বাণী ও রচনাবলীর ধারাবাহিক পুনঃপ্রকাশে ব্রতী হইয়াছি। তাঁর পরিকল্পিত "শতবর্ষের বাংলা"র শুধু প্রথম খণ্ডটি নয়, উহার অপর দুই অংশ "স্বদেশীযুগের স্মৃতি" ও "বিপ্লবযুগ"ও আজ আর প্রকাশ ও প্রচার করায় পরাধীন যুগের ভয়-ভাবনা-বাধা নাই। "স্বদেশী যুগের স্মৃতি" নামে পরে সন্তগুরু স্বয়ং ১৩৩৮ সালে এক বিস্তারিত তথ্যপূর্ণ ও গভীর চিন্তাসমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। আমরা বর্ত্তমান সংস্করণে উপরোক্ত তিন খণ্ড "শতবর্ষের বাংলা" ও সন্তগুরু-রচিত শেষোক্ত গ্রন্থখানি—সব একই মর্ম্মসূত্রে সংগ্রথিত করিয়া একত্র প্রকাশ করার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছি।

মনীষী বিপিনচন্দ্রের প্রশ্নমর্ম্ম—"দেশের হাওয়া কি ফিরিয়াছে, ফিরিতেছে—নতুবা শতবর্ষের বাংলার কথা শোনায় কে আর শোনে কারা"—ইহারই সূত্রানুসরণে সারা বাংলার আশা ও বিশ্বাসের স্থল আজিকার মর্ম্মহারা উদীয়মান জাতির কাছেই এই অতীতের সুগৌরব পুণ্যকাহিনী পরিবেশন করিতেছি। বাঙালি ভাঙার তপঃ-সমুদ্রমন্থন করিয়া কিছু গড়ার অমৃতময় সত্য উদ্ধার করিয়াছে। সে নব জাতিগঠনের স্বপ্ন ও প্রেরণা এই আত্মবিস্মৃত মহাজাতির ভবিষ্যৎকেই বরণ করিতে হইবে—আমরা তাঁদের কাছেই আমাদের মর্ম্মনিবেদন করিলাম। "শতবর্ষের বাংলা"র সাধনা ও সিদ্ধি তাঁদেরই চিন্তায় ও জীবনে পূর্ণ হউক—সার্থক হউক—এই আমাদের মর্ম্মের আন্তরিক প্রার্থনা।

ইতি
প্রকাশক

ভূমিকা

হাওয়া কি আবার ফিরিয়াছে, ফিরিতেছে? না হইলে, বাংলার কথা লেখেই বা কে, শোনেই বা কারা? একদিন বাঙ্গালী বাংলার দিকে ছুটিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ত্রিংশকোটী ভারতবাসীর কথা কহেন নাই।

সপ্তকোটীকণ্ঠ কলকলনিনাদ করালে,
দ্বিসপ্তকোটী ভুজৈর্ধৃত খরকরবালে
কে বলে মা তুমি অবলে!

বলিয়া মায়ের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী ভারতের মোহে পড়িয়া এই ঋষিদৃষ্ট মন্ত্রের সপ্তকোটীকে ত্রিংশ কোটী করিয়াছে। তারপর, বাঙ্গালী ভুলিয়া গিয়াছিল যে, যে স্বাধীনতার সাধনায় সে আজ মাতিয়াছে, তাহা বাঙ্গালীর সনাতন সাধনা। প্রাচীন যুগের কথা ছাড়িয়া এই অর্ব্বাচীন কালেও, বাঙ্গালী শতবর্ষ ধরিয়া নানা ভাবে, নানা ক্ষেত্রে, এই এক লক্ষ্যের দিকেই ঋজু-কুটিল নানা পথে ছুটিয়াছে। আজ লোকে যাহা নিতান্ত নূতন ভাবিতেছে, তাহা বাংলার ইতিহাসে পুরাতন। আর মতের বা পথের পার্থক্য-নিবন্ধন আজিকার নব্য বাঙ্গালী নিজেদের স্বাদেশিকতার অভিমানের কুজ্ঝটিকায় যাঁহাদের স্বদেশ-প্রেমের মর্য্যাদা করিতে পারিতেছে না, তাঁহারাও এই মহাযজ্ঞেরই একদিন প্রধান হোতা ও পুরোহিত ছিলেন। রামমোহন কেবল ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা নহেন, কিন্তু তাঁহার অলোকসামান্য মনীষা নূতন বাংলারই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ কেবল মহর্ষি নহেন, কিন্তু বাংলার নূতন

স্বাধীনতার একজন শ্রেষ্ঠতম সাধক। কেশবচন্দ্র কেবল নববিধানই প্রচার করেন নাই, বাংলার আধুনিক জাতীয় সাধনারও একজন প্রধান আচার্য্য ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ আজ লোকনায়কের সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। লোকনায়কেরা বেশীদিন বাঁচিয়া থাকিলে সর্ব্বত্র এই দশা ঘটে। লোকমত খরবেগে অগ্রসর হইয়া যায়। লোকনায়কেরা সকলে সকল সময়ে এই তরঙ্গভঙ্গের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে স্থির হইয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু নব্য বাঙ্গালী জানে না, তাহার আজিকার এই স্বদেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার আস্ফালন অসম্ভব হইত, যদি সুরেন্দ্রনাথ আপনার মনীষা এবং বাগ্মিতা দ্বারা একদিন এই মহাযজ্ঞের আগুন না জ্বালাইয়া দিতেন। বাংলা যে কি বস্তু, বাঙ্গালীর এই সনাতন স্বাধীনতার সাধনার স্বরূপ যে কি, ইহা তলাইয়া দেখিবার অবসর আজ বাঙ্গালীর নাই। বাঙ্গালী আত্মহারা হইয়াছে; অথবা, মাঝখানে হইয়া পড়িয়াছিল; আবার মনে হয় যেন বাঙ্গালীর মতি ও গতি ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছে। না হইলে, শতবর্ষের বাংলার কথা লিখিতে প্রেরণা আসিত কোথা হইতে; আর এই পুণ্যকাহিনী শুনিতই বা কারা? আমাদের আধুনিক সাধনার, আধুনিক মাতৃপূজার পবিত্র নির্ম্মাল্যরূপে এই কাহিনী যদি বাঙ্গালী মাথায় তুলিয়া লয়, তবেই লেখকের কামনা পূর্ণ হইবে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

শতবর্ষের বাংলা

॥ এক ॥

বাংলার স্বদেশী যুগ একটা পতিত জাতির জাগরণের কাহিনী। ইহার বাহিরের দিক্‌টা আজ নানাভাবে লোকের নিকট প্রকাশিত; কিন্তু এত বড় ঘটনার অন্তঃপ্রেরণা যে কি তাহা অনেকে তলাইয়া দেখেন না। বিশেষতঃ, বাংলার বর্ত্তমান যুগের তরুণ যারা, তাদের নিকট ইহা সম্পূর্ণরূপেই অজ্ঞাত। ঘটনাগুলির বিবরণ দেশের মর্ম্মকথা জানিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে, ইহার মূল প্রেরণাটিকে ধরিতে হইবে; তবেই আমরা আজ এই নিদারুণ নৈরাশ্যের দিনে অন্তরে আবার শক্তি জাগাইয়া তুলিতে পারিব, এ জাতির মোহ-মুক্তি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইব।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে, দেশের হাওয়ায় আগুন ছুটিতেছিল। দীর্ঘদিনের স্তব্ধ জড়ত্ব চেতনার স্পর্শে স্পন্দিত হইতেছিল। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যে কি, সে প্রশ্ন করিবার সেদিন অবসর থাকে নাই, প্রয়োজনও ছিল না। কিছু করিতে পারিলেই সে দিনের তরুণ যেন বাঁচিয়া যাইত! প্রতি স্নায়ু, রক্ত-মাংস উত্তেজনায় লাফাইয়া উঠিত, কিছু একটা করিবার আদেশ পাইলে হয়—দেশের অবস্থা এমনই উত্তেজনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাই সে দিন নেতার অভাব হয় নাই, একটু

ভরসা করিয়া কেহ সম্মুখে দাঁড়াইলেই তখনই তাঁহাকে নেতার আসনে উঠাইয়া শত-শত কণ্ঠে জয়ধ্বনি আকাশ-বাতাস মুখরিত করিত। সে কি ধুম, কি উৎসাহ!

দেশের সর্ব্বত্রই এই ভাব। তরুণের প্রাণে একটু আগুন ছড়াইয়া দিবার মত কয়েকটা উত্তেজনার বাণী কেহ যদি বলিল, অমনি তাহাকে ঘিরিয়া একটা দল গড়িয়া উঠার যেন অসম্ভব ছিল না। তলে-তলে কাজের সাড়া পড়িয়াছিল, কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ কোথাও ছিল না। বহু বিভিন্ন-বিচ্ছিন্ন কর্ম্মকেন্দ্র গড়িয়া উঠিতেছিল, কিন্তু এগুলিকে সংহতিবদ্ধ করার জন্য বিশেষ কাহারও লক্ষ্য ছিল না। কেহ কাহারও খবর রাখার প্রয়োজন মনে করিত না। কিন্তু অকস্মাৎ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্টে, বঙ্গভঙ্গনীতি রদ করার জন্য নেতৃদের কণ্ঠে বহিষ্কার-মন্ত্র উচ্চারিত হওয়া মাত্র, অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই দেশব্যাপী আন্দোলন মাথা তুলিয়া উঠিল। তাহার মূলে ছিল—এই প্রস্তুতি। এতখানি প্রাণের পরিচয় পাওয়া যাইবে, দেশের নেতৃগণও তাহা ভাবেন নাই, রাজশক্তিও সেদিন স্তম্ভিত হইয়াছিল।

দেশ এই অনাগত কর্ম্মের জন্য কেমন করিয়া এতখানি প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল, সে কথা এখন বলিব না। তবে রাষ্ট্রক্ষেত্রে সেদিন মনীষী নরেন্দ্রনাথ সেন, দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন চিন্তাবীর দেশের কাণে রাষ্ট্রমুক্তির কথা শুনাইয়া আসিতেছিলেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিক ও কবি দেশকে লক্ষ্য করিয়া জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন, দেশের প্রাণে একটা নূতন আকাঙ্ক্ষার আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, বাংলার সর্ব্বত্র তাই দেশকে বড়

করার ভাব খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই টাউন হলের মহাসভায় বহিষ্কারনীতি গৃহীত হইবামাত্র, জাতি সমবেত শক্তি লইয়া এই পথে মরণপণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে উচ্ছ্বসিত মহাশক্তি ক্রমে যেরূপ ভীষণ রুদ্র মূর্ত্তি লইয়া জাগিয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া বয়কট-মন্ত্রের পুরোহিত নরেন্দ্রনাথও মুখ ফিরাইলেন। এই হেতু তিনি যে কি নিদারুণ অশ্রদ্ধার বোঝা বহিয়া শেষ জীবন-পাত করিলেন, তাহা ভাবিলেও মর্ম্মাহত হইতে হয়। তবে তাঁর দেশপ্রীতির পরিচয় বাঙ্গালী ভুলিবে না। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ-সভায়, তাঁর কণ্ঠেই বয়কট-মন্ত্র প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল—এ স্মৃতি মুছিবার নহে।

কতখানি প্রাণশক্তি সঞ্চয় করিয়া বাঙ্গালী কিছু করার জন্য যে প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহার সন্ধান দেশনেতৃগণ রাখিতেন না। নেতৃশক্তির সহিত দেশের প্রাণশক্তির পরিচয় এ দেশে সেদিন ছিল না; আজও যে তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্ভবপর হইয়াছে, তাহা মনে হয় না।

কাজের ভার পাইয়া জাতি যখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া কর্ম্মসিদ্ধির অব্যর্থ পথে চালাইবার মত সাহস ও যোগ্যতা সে যুগের কোন নেতারই ছিল না। কাজেই এই উন্মাদ প্রাণশক্তি পথের নির্দ্দেশ না পাইয়া তির্য্যক্ পথেই পা বাড়াইয়াছিল। ফলে, স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথও ভবিষ্যতে নেতার আসন হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন। সিদ্ধ নেতার অভাবেই বাংলার এত বড় জাগরণ সেদিন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ না হইলেও, যথোপযুক্ত সাফল্য লাভ করে নাই—সেই ক্ষুব্ধতা, সেই নৈরাশ্যের নিদারুণ ক্ষুণ্ণতা আজও অবসাদের মাত্রা বৃদ্ধি করে।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলন যাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যে নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল, জাতির প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করার সময়ে সে উদ্দেশ্যটুকুর কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলা হয় নাই। উত্তেজনার কষাঘাতে নেতৃদের কণ্ঠ অনর্গল অনল উদ্গীরণ করিত—যথানির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের পরিমিত বাক্যগুলি উচ্চারণ করিলে হয়তো দেশের উদ্যত প্রাণ সুসংযত হইয়াও লক্ষ্য সিদ্ধ করিত, কিন্তু প্রচুর সামর্থ্য হাতে পাইয়া নেতৃগণ সেদিন ইহার সুব্যবহার করিতে পারেন নাই। ইহার ফলে, কেবল যে শক্তির অপচয় হইয়াছে তাহা নহে; যে বিশ্বাসের ভিত্তির উপর জাতি প্রাণপ্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, সে বেদী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আজ আমরা ছন্নছাড়া—সে যুগের নেতৃগণের কোথাও বা কপট আচরণ, কোথাও বা অনভিজ্ঞতা ইহার জন্য দায়ী; কেননা, সেদিন যাঁহারা দেশের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, ভবিষ্যতে তাঁহাদের কাজে ও কথায় এত অধিক অমিল হইয়াছিল, যাহা সত্যই অভাবনীয়। প্রাণ লইয়া খেলা যেখানে, সেখানে এইরূপ নেতৃত্বের অভিনয়—মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার কারণ হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের উৎপত্তি কেমন করিয়া হইল, সে কথা গোপন ছিল না। মাত্র সেই কারণটুকু প্রদর্শন করিয়াই স্বদেশী-প্রচারকেরা ক্ষান্ত ছিলেন না; তাঁহারা অকস্মাৎ বাংলার প্রচণ্ড প্রাণশক্তিকে হাতে পাইয়া, এই সুযোগে ফাঁকি দিয়া বড় একটা কিছু করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন। কাজেই মুখ্য উদ্দেশ্যটী জাতির নিকট চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। ইহাতেও ক্ষতি ছিল না, যদি সেদিন আমাদের কথা ও কাজ সমান রাখিয়া চলার মত ত্যাগ ও তপস্যাকে বরণ করিয়া লইতাম। ইহার অভাবেই দেশের প্রাণ সর্ব্বক্ষেত্রে বীতশ্রদ্ধ হইয়া আত্মঘাতী হওয়ার পথ বরণ করিতে বাধ্য

হইল। তাহার ফল যাহাই হউক, তখন তাহা শ্রেয়োবোধে বরণ করিয়া লক্ষ্যের পথে চলার স্পর্দ্ধাই সত্য জাগরণের পরিচয় হইয়াছিল। বাঙ্গালী আজও এই পথেই যাত্রা করিয়াছে। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে প্রতিক্রিয়ামূলক যে অন্ধতা, তাহা সহজে দূর হয় না। গোড়ার গলদ ভবিষ্যতের পথ জটিল সমস্যাময় করিয়া তুলে। এইজন্যই এমন করিয়া কথাগুলি বলিতে হইল।

মোগলশক্তির অধঃপতনের পর হইতেই জাতির প্রাণ অন্তর্বিদ্রোহে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল; তারপর ইংরাজ-শক্তির অভ্যুদয়ে ইহা কিছু নিশ্চিন্ত হইল। তৎকালে ইংরাজ প্রতিনিধিগণও যে উদার ব্যবহার ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে জাতি যে ইঁহাদের মাথায় মুকুট পরাইয়া হৃদয়ে বড় আশা স্থান দিয়াছিল, তাহা ভারতের ইতিহাস অনুধাবন করিলে অনায়াসেই উপলব্ধ হয়। কিন্তু রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে, নানাভাবে ভারতের প্রাণ পুষ্ট করার কথা ছাড়া কাজে ভারতকে নিঃস্ব করার আয়োজন ক্রমেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ভারতের স্বার্থ ও ইংলণ্ডের স্বার্থ সংঘাতে-সংঘাতে ক্রমে এমনই বিসদৃশ স্বতন্ত্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল, যাহা অতি বড় রাজভক্ত প্রজাও আর অস্বীকার করিতে পারিল না। ইহার বিশেষ বিবরণ পরে দিব।

বাঙ্গালী বড় ভাবপ্রবণ জাতি। তাহার মনে আঘাত বাজিল, যখন ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আসাম দেশকে বাংলা হইতে শাসনসৌকর্য্যে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া হইল। রাজশক্তির অধীন মোটা বেতনের চাকুরী একটা লোভের বস্তু হইয়াছিল। বেতনের মাত্রাবৃদ্ধি হইলে, আজও যে সে প্রলোভন হইতে আমরা মুক্তি পাইয়াছি তাহা নহে; কেননা নূতন শাসন-যুগের প্রবর্ত্তনে যে নূতন উচ্চ বেতনের

পদগুলির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ঝোঁকে আমরা যেরূপ ছত্রভঙ্গ হই, তাহা দেখিলে ইহা সপ্রমাণ হয়। সেদিন অসমিয়ারা বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, অনেকগুলি উচ্চ বেতনের চাকুরী তাহাদের ভাগ্যে মিলিবে, এই আশায় ভঙ্গ-নীতিকে প্রশ্রয় দিয়াছিল। বাঙ্গালী আসাম হইতে বিযুক্ত হইয়া যত না ব্যথা অনুভব করুক, বঙ্গভাষাভাষী সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া হইতে বিভক্ত হইয়া তাহারা সেদিন একটা যন্ত্রণার দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিল মাত্র। অখণ্ড চেতনা-স্তর সেদিন সুপ্ত ছিল—ইহার অধিক অভিব্যক্তি দিবার সাধ্য তখন তাদের ছিল না।

ইংরাজশাসনে ভারতের যে একদল লোক সর্ব্বপ্রথমেই অশান্তির বাণী উচ্চারণ করিয়া দেশকে সচেতন হইতে বলে, তাহার মূলে ছিল স্বার্থ। অসমিয়ারা যে স্বার্থসিদ্ধির আশায় বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া শ্রেয়ঃ মনে করিল, কাজে তাহা সিদ্ধ হয় নাই। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অধিকাংশ ইংরাজ সর্ব্বোচ্চ বেতনের পদ অধিকার করে, ইহা লইয়া তাৎকালীন শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষের আগুন জ্বলিতে থাকে এবং এই অসন্তোষের মূল উপড়াইয়া দিবার প্রচেষ্টায় ইংরাজ গবর্ণমেন্ট উদাসীন হন নাই। কিন্তু এই অনির্ব্বাণ আগুনের মূলে স্বার্থের আবরণে একটা মহাপ্রেরণা ছিল, তাই সহস্র চেষ্টায় বেতনপ্রার্থী শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে হইতে এই সামান্য অসন্তোষের বহ্নি অপসারিত হইল না; বরং ইহা দেশব্যাপী হইয়া উঠিল। স্বদেশী যুগে এই আগুনই ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তনেও, ইহার আকারভেদ ঘটিলেও, মূলগত পরিবর্ত্তন হয় নাই—তাই আজও ইহা তুষের আগুনের মত দেশের মর্ম্মস্থল অধিকার করিয়া আছে।

আসামকে বঙ্গদেশ হইতে খণ্ডিত করিয়াও যখন সিভিলিয়ানদের যথেষ্ট স্থানসংকুলান হইল না, তখন বৃহৎ আসাম গড়িয়া তোলার প্রয়াস চলিতে লাগিল। কথা উঠিল—চট্টগ্রাম বিভাগ, নোয়াখালি ও টিপারার সহিত আসাম-গবর্ণমেণ্ট-ভুক্ত করা হউক। বাঙ্গালী আর চুপ করিয়া রহিল না। চট্টগ্রাম বিভাগের অধিবাসীরা তুমুল আন্দোলন উত্থাপন করিল। তখনও কিন্তু অখণ্ড বাংলার প্রাণ জাগিয়া উঠে নাই। চট্টগ্রাম বিভাগের এই ঘোরতর আপত্তির কথা তখন আমরা কেবল কাণেই শুনিতাম, মর্ম্ম দিয়া ব্যথা অনুভব করিতাম না। যাহা হউক, দেশবাসীর মত-বিরুদ্ধ কর্ম্ম হইতে সে ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট বিরত হইলেন। দেশে উল্লাসের ঢেউ উঠিল। গবর্ণমেণ্ট প্রজামত উপেক্ষা না করিয়া সে বার রাজভক্তির জয়মাল্য পাইলেন।

কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যাহা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা সহজে ছাড়িতে চাহিলেন না। মূলে অবশ্যই কিছু-না-কিছু স্বার্থ থাকেই। এক কড়া স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, প্রজার অনুরাগ ইংরাজ অধিক মূল্যবান্ মনে করিলেন না। পূর্ব্ব-প্রস্তাব সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হইল বটে ; কিন্তু কিছুদিন পরেই কথা উঠিল—কেবল চট্টগ্রাম বিভাগ নহে, ঢাকা ও ময়মনসিংহ আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়া স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট গড়িয়া তোলা হউক। এই প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়া মাত্র, দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। সে আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান সমানভাবেই যোগ দিল। গবর্ণমেণ্ট দেশের হাওয়া বুঝিয়া সে বারও চুপ করিলেন।

প্রজামতের বিরুদ্ধে না যাওয়ার জন্যই যে এইরূপ বিরতি তাহা নহে ; তলে-তলে ইহা আরও সুচিন্তিত ও অবধারিত ভাবে কাজে

পরিণত করার জন্যই বাহিরের দিক্ হইতে গবর্ণমেণ্ট নিশ্চেষ্ট রহিলেন। ভিতরে-ভিতরে কথা চলিতে লাগিল। সাধারণের অজ্ঞাতসারেই ভারতের তদানীন্তন ভাগ্যবিধাতা লর্ড কর্জ্জন ঠিক করিয়া ফেলিলেন—ফরিদপুর ও বরিশালের সহিত সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, অখণ্ড বঙ্গবাসীকে দ্বিখণ্ডিত করিবেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া, ২০শে জুলাই তারিখে ইহা লোকসমক্ষে জ্ঞাপন করিলেন। বাংলার ছোটলাট এণ্ড্রুস ফ্রেজার ও লর্ড কর্জ্জন—ইহাতে দেশের শ্রেয়ঃ সাধন হইবে, ইহা বুঝাইবার জন্য জমিদারদিগকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু বাঙ্গালী জাতি সেদিন জনমতের প্রতি এইরূপ অবজ্ঞায় মরিয়া হইয়া উঠিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট, বাঙ্গালী আত্মসম্মান-উদ্ধারের জন্য স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করিল, মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা লইল। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সাগরগর্জ্জনের মত শব্দ উত্থিত হইল—"বন্দে মাতরম্"।

॥ দুই ॥

এতখানি প্রাণ একদিনে জাগিয়া উঠার পশ্চাৎ ছিল শতবর্ষের সাধনা। পাল ও সেন রাজবংশের অধঃপতন হইলে, বাংলায় বিস্তৃত রাজ্যস্থাপনের স্বপ্ন লোপ পাইয়াছিল। পাঠান-মোগলের শাসন মানিয়া বাঙ্গালী এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিল যে, তাহাদের দেশ আছে, জাতি আছে। বাংলায় যে বারভুঁইয়ার প্রতিপত্তির কথা শুনা যায়, উহা দেশ ও জাতীয়তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ব্যক্তিগত বা বংশগত আধিপত্যরক্ষার ইতিহাস। এমন কি, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বাংলার বীরপুরুষদের কাহিনী আমরা আজ যেমন করিয়া দেখি, উহা বস্তুতঃ সেরূপ ছিল না; আত্মমর্য্যাদা ও আত্ম-স্বার্থ-সংরক্ষণে ইঁহাদের বীরত্ব আদর্শ-স্থানীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু দেশ ও জাতির প্রাণকে জাগাইয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের প্রয়াস ইহা নহে। আজ আমাদের এই বৃহত্তর আদর্শে জীবনগঠনের জন্য ইতিহাস হইতে উপযোগী উপকরণসংগ্রহের প্রয়োজন হইয়াছে। অতীতের দান ভবিষ্য জীবনগঠনের পক্ষে হিতকারী হইলেও, ইহার যথার্থ মূল্য যাহা, তাহার অধিক আমরা পাইব না, ইহা মনে রাখা দরকার। এমন কি ছত্রপতি শিবাজী স্বদেশ ও স্বজাতি বলিতে দাক্ষিণাত্য ও মহারাষ্ট্রীয় জাতিকেই বুঝিতেন, আসমুদ্রহিমাচল-বেষ্টিত সমগ্র ভারতে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিতে তিনি উদ্বুদ্ধ হন নাই। শিবাজীর তিরোধানের সঙ্গেই ছত্রভঙ্গ মহারাষ্ট্র-শক্তি স্বদেশের ধনরত্নলুণ্ঠনে অকাতর হইয়াছিল। মোগল গৌরবমণি আকবর ভারতসাম্রাজ্যের সম্রাট্ হইয়া ধর্ম্ম-সমন্বয়ের বেদীর উপর যে

অখণ্ড রাষ্ট্রগঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সফল হয় নাই—আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই সে কল্পস্বপ্ন সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হইয়াছিল। মোগলসিংহাসন হৃতবল হইলে, ভারতের অধিবাসী আপনাপন খণ্ড-খণ্ড স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত হইয়াছিল—অখণ্ড ভারতসাম্রাজ্যগঠনে উদ্‌বুদ্ধ হয় নাই। "জোর যার মুল্লুক তার"—এই প্রবাদ বোধহয় মোগল শক্তি অবসন্ন হইয়া পড়িলে, দেশের অবস্থা দেখিয়াই বাহির হইয়াছিল।

আমরা বাংলাদেশের কথাই ভাল করিয়া বলিতে পারি।

গুপ্ত, পাল ও সেনবংশ লইয়া বাঙ্গালীর অবশ্যই গর্ব্ব করিবার কিছু আছে। কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যচ্যুতির পর হইতেই, বাঙ্গালীর কপাল ভাঙ্গিয়াছে। আলিবর্দ্দী খাঁর আমলে, দিল্লীর রাজশক্তি হীনবল হওয়ায়, মহারাষ্ট্রীয় শক্তির অভ্যুত্থান হয়, শিবাজীর মৃত্যুর পর এক শতাব্দী কাল যাইতে-না-যাইতেই মহারাষ্ট্রীয় শক্তি রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় উদাসীন হইয়া লুণ্ঠনকার্য্যে ব্যগ্র হইয়া পড়ে, বর্গীর ভয়ে সেদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী শিশু জননীর কোলে জড়সড় হইয়া ঘুমাইয়া পড়িত। বাংলায় এই বর্গীর অত্যাচার দমন করা আলিবর্দ্দীর সাধ্যে আর কুলায় নাই। সেইদিন হইতে বাঙ্গালী ধনে-প্রাণে মরিতে বসিয়াছে।

ইহার পর ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট্ সাহ আলমের নিকট হইতে ইংরাজ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হন। এইদিন হইতে এই জাতির ভবিষ্যতের আশায় ছাই পড়িল। ইংরাজ রাজ্যের ভিত্তিতলে বাংলার কোটী-কোটী নর-কঙ্কাল স্তরের পর স্তর বিন্যস্ত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলি: "......বাংলার কর ইংরাজের প্রাপ্য। কিন্তু শাসনের ভার নবাবের উপর। যেখানে-যেখানে

ইংরাজেরা আপনার কর আপনারা আদায় করিতেন, সেখানে-সেখানে তাঁহারা এক-একজন কালেক্টার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু খাজনা আদায় হইয়া কলিকাতায় যায়। লোক না খাইয়া মরুক, খাজনা আদায় বন্ধ হয় না।"

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ রাজস্ব আদায় আবস্ত করিল। ১৭৬৬।৬৭ খৃষ্টাব্দে জোতদার, তালুকদাব, জমিদার প্রজার উপর পীড়ন যুড়িয়া দিল। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে বিধাতার কোপ অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়া দেশকে পুড়িয়া ছাই করিল। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালীর চক্ষে অশ্রু ঝরিল। তারপর ৭৬ সালের কথা বলিতে ভাষা যুটে না, এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শুধু এক মুষ্টি অন্নের অভাবে, কেবল বাংলায়, ১১৭৬ সালের পৌষ মাস হইতে ভাদ্রের মধ্যে এক কোটী লোক প্রাণ হারাইল। কলিকাতা যদিও একালের মত সে সময়ে সমৃদ্ধ ছিল না, কিন্তু ইংরাজের দৃষ্টির সম্মুখেই ৭৬০০০ হাজার লোক পথে পড়িয়া ক্ষুধার জ্বালায় ইহধাম ত্যাগ করিল। এই প্রায় দুই কোটী অস্থিকঙ্কালের উপর বাংলার ব্রিটিশরাজ বনিয়াদ গাড়িয়া যে শাসন-তন্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহার কর্ত্তৃপক্ষের পরিবর্ত্তন হইলেও, আজও তাহার সর্ব্বনাশী প্রভাব হইতে আমরা মুক্তির আশ্বাস পাইলাম না। জাতির মর্ম্ম পুড়িয়া গেল, বিদ্বেষের বিষাক্ত ধূম উদ্‌গীরণে দেশের শান্তিশৃঙ্খলাভঙ্গের যে ক্ষীণ উদ্যোগ মাঝে-মাঝে দেখা দেয়, তাহা মুমূর্ষু জাতিব আত্মরক্ষার অনিবার্য্য অভিব্যক্তি।

১১৭৬ সালের মন্বন্তরের প্রসঙ্গ তুলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র "আনন্দমঠ"-এ এই চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন: "লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পর কে ভিক্ষা দেয়!—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গরু বেচিল, লাঙ্গল-

যোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয় ফেলিল, ঘর-বাড়ী বেচিল, জোত-জমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুকুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল; যাহারা পলাইল, তাহারা অনেকে বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।"

ইহা উপন্যাসের কল্পনা নয়—সত্য। "ছিয়াত্তুরের মন্বন্তরের" কথায় এখনও বাঙ্গালীর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে—দুর্ভিক্ষের এমন মর্ম্মান্তিক দৃশ্য জগতের ইতিহাসে খুঁজিয়া পাইবে না। দারিদ্র্যের নির্ম্মম কষাঘাতে সেই যে বাঙ্গালীর প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে, আজও তাহার দুরবস্থার প্রতিকার হয় নাই।

হইবে কি প্রকারে? বাংলার এই দুইশত বৎসরের ইতিহাস অনুধাবন করিয়া দেখ—বাঙ্গালীর বাঁচিবার পথ নাই। বিন্দু-বিন্দু জীবন নিঙড়াইয়া রক্তস্রোতঃ নিরন্তর শতমুখে বাহির হইয়া যাইতেছে, —বাঙ্গালী এখনও যে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যায় নাই—উহা বিধাতার আশীর্ব্বাদ—কিন্তু বড় নিষ্করুণ—তিলে-তিলে মরার চেয়ে এই দুইশত বৎসরের মধ্যে একদিনে একেবারে তাহাদের নিশ্চিহ্ন হওয়াই ছিল ভাল।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দেওয়ানী সনন্দ পাইয়া ইংরাজ প্রথম দুই বৎসর রাজস্ব আদায়ের তেমন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। তারপর ১৭৬৮—৬৯ হইতে শোষণ-নীতির স্থায়ী বন্দোবস্ত হইল। তাঁহারা

এক বৎসরেই আদায় করিয়া লইলেন ২ কোটী ৫২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৮ শত ৫৬ টাকা। তারপর দারুণ দুর্ভিক্ষের বৎসর খাজনা আদায় বন্ধ রহিল না, সে বৎসর রাজস্ব উঠিল ১ কোটি ৩১ লক্ষ, ৪৯ হাজার ১ শত ৪৮ টাকা। ঘরে-ঘরে হাহাকার, মহামারীর প্রকোপে পথে-ঘাটে পড়িয়া লোক মারা যায়. ইংরাজের রাজস্ব আদায় হয় কি প্রকারে? ইংরাজ জমিদারদের সহিত দশশালা বন্দোবস্ত করিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস তখন বাংলার হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা, দশ বৎসরের জন্য বার্ষিক দেয় রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিয়া, তিনি যথারীতি খাজনা উঠাইয়া লইলেন, সেই সময় হইতে ইহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে চলিয়া আসিয়াছে। ইহার ফল ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, বলা যায় না। কেন-না মুসলমানদের শাসনাধীন, বাংলার ভূম্যধিকারিগণের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় নাই, ইংরাজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজস্ব না দিলে, জমিদারী নীলামে চড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। জমিদারদের এই নূতন নিয়ম ধাতে বসিতে-না-বসিতেই, কোথাও অর্থাভাবে, কোথাও অসতর্ক স্বভাববশতঃ তাহাদের প্রভাব হ্রাস পাইতে লাগিল, জমিদারদের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। বাংলার ভূম্যধিকারীই সে যুগে এক প্রকার দেশের রাজা ছিলেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজা এই দশশালা বন্দোবস্ত হওয়ার পর, অনতিকাল মধ্যেই ৮৪টি পরগণা হারাইয়া মাত্র ৬৭ খানা পরগণার মালিক রহিলেন। বাঙ্গালী এইরূপে শক্তি-শ্রী-মর্য্যাদা হারাইয়া ক্রমেই প্রবল ইংরাজশক্তির আসনতলে মাথা ঠুকিয়া স্বার্থসংরক্ষণে উদ্যোগী হইল। মিশনারীদের সার্টিফিকেট লইয়া ইংরাজের চাকুরীর জন্য অনেকেই লালায়িত হইয়া পড়িল। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হয় নাই। যে যত সংখ্যক ইংরাজী

শব্দ মুখস্থ করিতে পারিত, শ্রীরামপুরের মিশনারীরা তাহাকে সেই হিসাবে সার্টিফিকেট দিতেন। বাঙ্গালীর অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমা কোথায় গিয়া ঠেকা খাইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করা সেদিন সহজ কথা ছিল না।

সে যুগে বাঙ্গালী ধর্ম্মের চেয়ে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই বড় করিয়া ধরিয়াছিল। প্রতিমা-পূজার মধ্যে সত্যকে হারাইয়া কে কত বড় প্রতিমা গড়িয়াছে, কত টাকার সাজ করিয়াছে, কত লোক খাওয়াইয়াছে, এইরূপ জাঁকজমকের মাত্রা ধর্ম্মের ধ্বজা হইয়া উড়িত। সমাজের জঘন্য রুচির পরিচয় পাই ঝুমুর, কবি, তরজার লড়াই প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায়, তা'ছাড়া অবরোধের কঠিন নাগপাশে কুললক্ষ্মীদের জীবন কি ভীষণরূপে আড়ষ্ট হইয়াছিল, তুচ্ছ ছাগবলির মত সতীদাহে বলপূর্ব্বক তাহাদের জীবনে কি নৃশংসরূপে আঘাত দেওয়া হইত, শতবর্ষের ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের আর এই সকল কথা বিশেষ করিয়া বলার প্রয়োজন নাই।

সমাজপুরুষেরা নিত্যনৈমিত্তিক আহ্নিক-জপ করিয়াই নিজেদের ধার্ম্মিক মনে করিতেন। অন্ত্যজ জাতি বলিয়া দেশের একতৃতীয়াংশ লোক দারুণ উপেক্ষায় সমাজের বাহিরে অনাদরে পশুর অধম হইয়াছে, অথচ গো-খাদক ম্লেচ্ছের সারাদিন চরণ বন্দনা করিয়া, সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নানান্তে প্রাচীনেরা শুচি হইতেন, নামজাদা ধার্ম্মিক পুরুষের রক্ষিতা পূজা-পার্ব্বণে অন্তঃপুরে বসিয়া সম্মান পাইত, কুলললনাদের মর্ম্মান্তিক দীর্ঘ নিঃশ্বাস সংসারের তলে-তলে দাবানল সৃষ্টি করিত। বাঙ্গালীকে আমরা শতবর্ষ-পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছি, তাহা আশার কথা নহে।

এই অন্ধ তমসাচ্ছন্ন যুগে মরণের বিষাক্ত নিঃশ্বাস-ভরা মুমূর্ষু সমাজজীবন প্রতি মুহূর্তে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। জীবনের আশা ছিল না বলিলেই হয়। এই মরা প্রাণে যে মহাপুরুষ সঞ্জীবনী সুধা ছিটাইয়া বাঙ্গালীকে নবজন্মের দীক্ষা দিলেন, তিনি এ যুগের পূজ্য-দেবতা—গুরুরূপী শ্রীভগবানের বিগ্রহমূর্ত্তি—এ যুগের যুগপুরুষগণের আদিসূত্র—আমরা তাঁহার চরণে বিহিত বিধানে নমস্কার করি।

*

* *

॥ তিন ॥

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের এক নবপর্য্যায় বলিতে হইবে। বাংলার নবজন্ম মহাত্মা রামমোহন রায়ের জন্মকাল হইতেই আরম্ভ হইয়াছে, এ কথা আজ বোধ হয় কোন শিক্ষিত বাঙ্গালী অস্বীকার করিবেন না। এই অসাধারণ প্রতিভাশালী মহাপুরুষের দ্বারাই বাংলার চিন্তাধারা সম্পূর্ণ নূতন পথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনিই জাতীয়তার বেদী প্রতিষ্ঠা করেন, তিনিই মুমূর্ষু জাতির প্রাণে মৃতসঞ্জীবনী ছিটাইয়া নূতন জীবন আনয়ন করেন। যে দিন হিন্দুসমাজ ঝুমুর, কবি, তরজার লড়াই লইয়া আত্মবিস্মৃত, বুলবুলির লড়াই, বারোয়ারী তলায় কুৎসিত আমোদপ্রমোদে ব্যস্ত, স্বদেশ ও স্বজাতির উৎসন্ন যাওয়ার পথ প্রতিদিন প্রশস্ত করিতেছে, সেইদিন মৃত্যুপ্রবাহের পথরোধ করিয়া স্বীয় দর্পে রাজা জাতিকে নবজীবনের মন্ত্রে দীক্ষা দিতে দাঁড়াইলেন, কালধর্ম্মের বাধা মানিলেন না। গতানুগতিক হিন্দু সমাজ যে তাঁহার কত বিরোধিতা করিয়াছে, তাহা আর বলিবার নহে; কিন্তু তিনি বিকারগ্রস্ত হিন্দু-জাতির নূতন স্বাস্থ্য আনিতে একদিনও উদাসীন হন নাই। ধর্ম্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে জাতির বাঁচিবার যত উপায়, সকল কিছুকে নিরাময় করিয়া তিনি একটা নূতন যুগ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

জাতির ভবিষ্যৎ যদি ধর্ম্মজীবনের অটল ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহা হইলে তরুণ কর্ম্মীদের যুগপুরুষদের স্মৃতিপূজা জীবন-সাধনার অপরিত্যজ্য অঙ্গ করিয়া লইতে হইবে। অতীতের প্রতি অন্তরের অকৃত্রিম অনুরাগ ও শ্রদ্ধা আমাদের ধমনীতে-ধমনীতে

শক্তির অনাহত উৎস সঞ্চারিত করিবে। আমরা দিব্য-দৃষ্টির সাহায্যে সিদ্ধ কর্ম্মী-রূপেই, ভবিষ্যৎকে আমাদের সত্যে গড়িয়া তুলিতে পারিব। নবযুগের প্রবর্ত্তক হিরণ্ময় কিরীট মাথায় করিয়া জাতির সম্মুখে ঐ দাঁড়াইয়াছেন, বাঙ্গালী, বার-বার ভূনত হইয়া ইঁহাকে প্রণাম কর।

হিন্দু সমাজ সেদিন নারীবধ ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া রাজাকে সতীদাহনিবারণে বাধা দিয়াছিল, যুগের শিক্ষা জাতির মধ্যে সঞ্চারিত করার উদ্যম ব্যর্থ করার উদ্যোগ করিয়াছিল, নারীজাতির কল্যাণকামনা যাহাতে সার্থক না হয়, তাহার জন্য কটিবন্ধন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। হিন্দু জাতি সেদিন মরণের পথে। রাজা অক্লান্ত কর্ম্মী ছিলেন, তিনি কোন বাধা মানেন নাই। স্বদেশভক্তি ও স্বজাতিপ্রীতির ধ্রুবনক্ষত্র-রূপে সত্য মন্ত্রে জাতিকে দীক্ষা দান করিয়া এ জাতির ত্রাণকর্ত্তারূপে তিনি চিরদিন পূজা পাইবেন।

ভারতে মুসলমানসভ্যতা বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, পারসীক ভাষা না পড়িলে বাঙ্গালী শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিতে পারিত না। বাংলা ভাষার আদর ছিল না। একান্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা আবদ্ধ ছিল। সমাজ-দোষে বাংলার ব্রাহ্মণ তখনও উচ্চ বেদান্তচর্চ্চা ছাড়িয়া পৌরাণিক পূজাদির অনুষ্ঠান ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতেন, আর অতি কুৎসিত অশ্লীল কাব্য রচনা করিয়া সমাজ-কঙ্কালের মুখে বিকৃত হাসি ফুটাইতে ব্যস্ত থাকিতেন। সে বীভৎস বাংলার ইতিহাস যত প্রকাশ না পায়, ততই শ্রেয়ঃ। সে কঙ্কালের কথা যত টানিয়া বাহির করিব, বাঙ্গালীর মুখ তত মসীময় হইয়া যাইবে। এই দুরপনেয় পাপের বোঝা রাজাই অপসারিত করিবার যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান ও ইংরাজী

সভ্যতা ও আদর্শ নিজের জীবনে গ্রাস করিয়া খাঁটি সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তি উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহাকে একদিকে খৃষ্টান মিশনারীদের সহিত যেমন সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল—দুঃখের বিষয়, অপরদিকে তেমনি স্বজাতীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের সহিতও লড়াই দিতে হইয়াছিল। আজ দেশে গীতা, উপনিষৎ, বেদান্তের যে ধারাবাহিক চর্চ্চা চলিয়াছে, হিন্দুধর্ম্মের অধ্যাত্ম-সাধনার যে নিরন্তর অনুশীলন ও আদর বাড়িয়াছে, মনে রাখিও—তাহা দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টায় নহে, ইহা রাজারই আত্মদানে সার্থক হইয়াছে। তাঁর মত অসাধারণ পাণ্ডিত্য সে যুগে কাহারও ছিল না। রাজদরবারে কার্য্য করার জন্য পারস্য ও আরবী ভাষায় তিনি যেমন সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষায়ও তদ্রূপ তাঁর পাণ্ডিত্যের তুলনা ছিল না; অন্যদিকে ইউরোপের সভ্যতাসংহরণের জন্য তাঁহাকে ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য হইতেও হইয়াছিল। তিনি এক বিশ্বজনীন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন; আর ভারতের গৌরব—সে ধর্ম্ম ভারতেরই সনাতন ধর্ম্ম। হিন্দুজাতি তাঁহাকে সে যুগে বিরুদ্ধবাদী বলিয়া গালি দিতেন; কিন্তু আজ তাঁর ধর্ম্মই হিন্দুভারত মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। তিনি হিন্দুধর্ম্মেরই জয় দিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে কথা নিজেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন—"আমি কখনও হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করি নাই; উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম্ম ভারতে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল।" যে জাতি অধঃপাতে যায়, তাহারা বিকৃতি লইয়া থাকিতে চাহে—এ দৃষ্টান্ত আজিও বিরল নহে।

এক শত বৎসর অতীত হইল, প্রতীচ্যের দানে বাংলার তাৎকালীন সঙ্কীর্ণ জীবনে জগতের আলো জ্বালিয়া তুলিবার জন্য, যুগ-

পুরুষ রাজা রামমোহন রায়ের প্রযত্নে লর্ড আমহার্ষ্টের সহায়তায় কলিকাতার বুকে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। এ জাতির জীবনের উৎস যদি গভীর, অতলস্পর্শী না হইত, তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সংঘর্ষে এতদিন সমূলে উৎপাটিত হইয়া, আমরা উপজাতির মত মর্য্যাদাহীন হইতাম। রাজার দূরদৃষ্টি জাতির জীবনের পরিচয় পাইয়াই ইহাকে সমৃদ্ধ করিতে জগতের বাধা উপেক্ষা করিয়াছিল। রক্ষণশীল দলের মৃত্যুবীজ চাপিয়া রাখার যে মুষ্টিবদ্ধ জীবন, তাহা নির্ম্মম অস্ত্রোপচারে নিরাময় স্বাস্থ্যপূর্ণ করিবার ইহাই সুযোগ দিয়াছিল। গোঁড়া হিন্দুগণ রাজার বিরুদ্ধে ছিলেন বলিয়া, রাজা হিন্দু কলেজের ভাবী উন্নতির আশায়, স্বয়ং কার্য্যকরী সভা হইতে অপসৃত হইয়া, শিক্ষার পথ প্রশস্ত রাখিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার উদার হৃদয়েরই পরিচয়।

রাজা হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না, কিন্তু বদ্ধ ধর্ম্মসংস্কার হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। স্বাধীন রাজ্য তিব্বতের মুক্ত বায়ুর স্পর্শে ধন্য হইবার জন্য, ১৬ বৎসর বয়সেই তিনি হিমালয় উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। ফরাসীর গণতন্ত্র রাজ্যের ত্রিবর্ণচিত্রিত সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার জয়ধ্বজা দেখিয়া তিনি কি হর্ষ প্রকাশ কিরয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। পরাধীন জাতির জীবনে, স্বাধীনতার বীজ বপন করিতে তিনি যে জীবনপণে উদ্যত হইয়াছিলেন, এ কথা কে অস্বীকার করিবে?

তাঁর সর্ব্বকর্ম্মে আমরা এইরূপ মুক্তিকামীর অগ্নিমুখী আকাঙ্ক্ষাই নিহিত দেখি। বাংলার ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে যখন তিনি দেখিলেন যে, অব্রাহ্মণের বেদাধিকার নাই, জাতির প্রাণ শূদ্রশক্তি উপেক্ষায়, অসম্মানে হীনতার স্তরে গিয়া লুপ্ত হইতে চলিয়াছে, তখন তিনি

সর্ব্বপ্রথমে জাতির মূলভিত্তি ধর্ম্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁর ধর্ম্ম অহিন্দুর ধর্ম্ম নয়, তাঁর সার্ব্বভৌমিক উদার ধর্ম্মনীতির প্রভাবে খৃষ্টান মিশনারীরা প্রথমে প্রলুব্ধ হইয়াছিল; কিন্তু তিনি অন্ধ হিন্দু জাতির বিভিন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মসাধনার সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তখন তাহারা নিরাশ হইয়া, রাজার কর্ম্মে প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিল। অন্যদিকে রক্ষণশীল হিন্দু জাতির শ্রেষ্ঠ পুরুষগণও এই নূতন ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্যে বড় কম বাধা দেন নাই, কিন্তু সত্যকে কে চাপিয়া রাখিবে? শত বৎসর পূর্ব্বে "ধর্ম্মসভার" প্রচেষ্টা আজ জাতির জীবনে কতটুকু প্রভাব রাখিয়াছে? কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ দেশব্যাপী না হউক, রাজার ধর্ম্মভাব বাঙ্গালীর জীবনে কি অভাবনীয় প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছে, তাহা ভাবিলে কি আমরা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে ঐ বিরাট্‌কায়, উদার, নির্ভীক যুগপুরুষের দিকে সম্ভ্রমে মাথা নত করিব না! রাজা হিন্দু জাতির, হিন্দুসমাজের, হিন্দুর শিক্ষা-দীক্ষা-সাধনার মধ্যে যে অমর প্রেরণা সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, তাহা কালের সঙ্গে গুণান্বিত হইয়া সমগ্র জাতিকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, সে অমর বীর্য্য ধ্বংস পাইবার নহে।

যে জাতি-বন্ধনের সঙ্কীর্ণ প্রাচীরপরিবেষ্টনে, বাংলার সাত কোটী লোকের মধ্যে নিদারুণ ভেদ-পার্থক্যে সর্ব্বক্ষেত্রে নিজেদের আজ বিপন্ন মনে করি, এখনও শত বৎসর হয় নাই, তাহার মূলোচ্ছেদের জন্য জলদগম্ভীর স্বরে তাঁর ধর্ম্মমত প্রচার করিতে গিয়া রাজা বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, হিন্দু কি যবন, সকলে এস, ভ্রাতৃবন্ধনে বদ্ধ হইয়া এক নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করি। যে জাতি, যে বর্ণ, যে সম্প্রদায়ভুক্ত লোক কেন হও না, সকলে এস,

সার্ব্বভৌমিক ভাবে একমাত্র নিরাকার, অগম্য, অনাদ্যনন্ত পরব্রহ্মের পূজা করি।"

এই উদার আহ্বান ধর্ম্মক্ষেত্রে, প্রত্যেক ঈশ্বরদর্শীর কণ্ঠেই আজ ধ্বনি তুলিয়াছে; কিন্তু সেদিন এমনি উদাত্ত কণ্ঠে, জাতিসমন্বয়ের বাণীপ্রচার বড় সহজ ছিল না, ধর্ম্মমতের জন্যই রাজার জীবন প্রতি পদে বিপন্ন হইয়াছিল, তিনি নির্ভীকভাবেই আত্মবিশ্বাসের জয় দিযা বাঙ্গালীকে ধন্য করিয়াছেন।

শুধু ধর্ম্মে নয়, নারীজাতির মুক্তির জন্য তাঁর অসাধারণ পরিশ্রম, প্রচলিত সমাজের সঙ্কীর্ণ বিধান ভাঙ্গিয়া কুললক্ষ্মীদের মুক্ত আলো ও হাওয়ার পরশ দিতে তাঁব প্রাণপাত আয়াস—তুলনাহীন।

প্রাচীনেরা ছেলে ক্ষেপাইয়া রাজার পশ্চাৎ যখন পরিহাসের সুর তুলিয়াছিল, অবোধ বালকেরা গলা ছাড়িয়া পল্লী কাঁপাইয়া গাহিত—

সুরাই মেলের কুল,
বেটার বাড়ী খানাকুল,
বেটা সর্ব্বনাশের মূল,
ওঁ তৎ সৎ বলে' বেটা বানিয়েছে স্কুল,
ও সে জেতের দফা করলে রফা
মজালে তিনকুল,—

তিনি হাসিয়াই সব উড়াইতেন। সতীদাহের পৈশাচিক ব্যবস্থা যাহাতে না উঠে, তাহার জন্যও সংস্কারবিরোধী হিন্দুপ্রধানেরা চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাঠক, একটী চিত্র আঁকিয়া দেখাই, শত বৎসর পূর্ব্বে আমরা নারীজাতির প্রতি কিরূপ সদয় ছিলাম!

প্রজ্বলিত চিতাসজ্জা প্রদক্ষিণ করিয়া নারী যেমনই ঝাঁপাইয়া পড়িল, দহনজ্বালায় 'পরিত্রাহি'-আর্ত্তনাদ শুনিতে না হয়, এই

অভিপ্রায়ে শত ঢাক বিকট রবে বাজিয়া উঠিল, কিন্তু হতভাগিনী ছিট্‌কাইয়া চুল্লী হইতে সরিয়া নিকটস্থিত জঙ্গলে গিয়া আশ্রয় লইল। শবদাহকারীরা চিতানল নির্ব্বাপণকালে দেখিল—অস্থি একটী, তখন তাহারা সন্ধান করিয়া দেখিল, অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় সতী বনের মধ্যে আত্মরক্ষার উদ্যোগ করিতেছে, আর রক্ষা নাই, তাহাকে ধরিয়া নদীবক্ষে হাত-পা বাঁধিয়া ডুবাইয়া দেওয়া হইল। যে জাতির ধর্ম্মবিশ্বাস এমন নৃশংস আচরণে প্রশ্রয় দেয়, সে জাতির জীবন মন্থন করিয়া একটা পরিচ্ছন্ন, উদার, সনাতন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার আয়োজন যিনি করিয়াছেন, যাঁর আত্মদানের ফলে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, সাধনায়, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সমাজে আমরা অতীত কুসংস্কারের দায় হইতে এতখানি মুক্তি পাইয়া নবজীবনগঠনের সুযোগ পাইয়াছি, তাঁহাকে যুগপুরুষ না বলিয়া আর কি বলিব!

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সতীদাহনিবারণ হয়, অতঃপর তিনিই নারী-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অবলাকুলের জীবনে জ্ঞানের বাতি জ্বালিবার প্রথম ও প্রধান পুরোহিত হইয়াছিলেন।

শুধু ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার লইয়াই তাঁর জীবনের আয়ুঃশেষ হয় নাই। রামমোহনের জীবনপ্রবাহ ক্ষীণ তটিনীর মত একমুখী ছিল না, সহস্রধারায় দেশ ও জাতির মুক্তিবিধানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাকে মানুষ বলিলে যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হয় না, তিনি সত্যই অতিমানবতার মূর্ত্ত বিগ্রহ (Superman), মহাবিভূতির দিব্য মূর্ত্তি।

আজিকার দুর্ব্বল জীবন ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া, যেমন জাতির অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবস্থা-ব্যবস্থার দিকে শক্তিনিয়োগে কুণ্ঠিত হয়, রাজার জীবন তেমন ছিল না। তিনি রাষ্ট্র সম্বন্ধে

বলিয়াছেন—“অনেক ব্যক্তির এই প্রকার সংস্কার আছে যে, যিনি পরমার্থ বিষয়ে মনোনিবেশ করেন, তিনি রাজনৈতিক বিষয়ের সহিত কোনরূপ সংশ্রব রাখিতে পারেন না। ধর্ম্মজ্ঞ শুধু ধর্ম্ম লইয়া থাকেন, রাজনীতির সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। আবার যিনি রাজনীতিজ্ঞ, তিনি কেবল রাজনীতির আলোচনাতেই ব্যস্ত থাকিবেন, ধর্ম্মের সহিত তাঁহার কোনও সম্পর্ক নাই। ইহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক ও অনিষ্টকর মত। ধর্ম্ম ঈশ্বরের, রাজনীতি কি শয়তানের ?”

ভারতে পরে যে স্বাধীনতার আরাধনা আরব্ধ হইয়াছিল, ইহাও রাজার দান। তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে যুগে ইংলণ্ডে স্বাধীনতার অগ্নিময় আকাঙ্ক্ষা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আমেরিকায় ফ্রাঙ্কলিন, ওয়াশিংটন স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন, ফরাসীভূমিতে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শস্থাপনের জন্য জয়ডঙ্কা বাজিয়াছে ; ভারতের রাষ্ট্রবিপ্লব নিরসন করিয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংস ব্রিটিশ রাজ্যের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতের প্রাণেও সেদিন যে স্বাধীনতার ধূয়া দেখা দিবে, তাহা আর বিচিত্র কি! এই যুগ-ধর্ম্মের প্রেরণা লইয়াই রাজার অভ্যুত্থান ; তাই তিনি ইংরাজরাজ্যের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার দিন হইতেই ভারতের কল্যাণকামনায় রাষ্ট্রীয় বিধানের সংস্কারসাধনে উদাসীন ছিলেন না। আইনপ্রণয়নে, বিচার-বিভাগেব ব্যবস্থায়, জমিদারের সহিত গভর্ণমেণ্টের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রজাব দুঃখ-নিবারণের উপায়ে, রাজ্যশাসনের সকল প্রকার আয়োজনে রাজা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া অভিমত প্রকাশ করিতেন। ইংবাজরাজ্যের দোষ দেখাইতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই, ভারতের রাষ্ট্রসংস্কার

সাফল্য সম্বন্ধেও তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী আছে। দেশের পরবর্ত্তী রাষ্ট্র-সাধকগণ রাজার এই আদর্শ লইয়াই দীর্ঘযুগ আন্দোলনে ব্যাপৃত ছিলেন। রাজা বলিয়াছিলেন—"এ দেশ সভ্যতা ও জ্ঞানে উন্নত হইয়া ইংলণ্ডের উপনিবেশ সকলের রাজনৈতিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ইংলণ্ডের উপনিবেশ সকলের যেরূপ রাজনৈতিক অধিকার, তাহাদের সহিত ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডীয় গভর্ণমেণ্টের সেরূপ সম্বন্ধ", রাজা আশা করিতেন "ভারতবর্ষ জ্ঞান ও সভ্যতায় উন্নত হইয়া সেইরূপ রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিবে এবং ইংলণ্ডের সহিত উহার সেইরূপ রাজনৈতিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবে। কেনেডার সহিত ইংলণ্ডের যেরূপ রাজনৈতিক সম্বন্ধ, ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সেইরূপ সম্বন্ধ সময়ে নিবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়।" রাজা তৎকালে দেশের যেরূপ অবস্থা দেখিয়াছিলেন এবং বাহ্যতঃ বহুদিন পর্য্যন্ত দেশের যেরূপ অবস্থা স্থিতিশীল ছিল, তখন এই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ব্যতীত রাষ্ট্রবিৎ পণ্ডিতগণ কেহই অধিক আশা রাখিতে পারিতেন না। রাজার পরবর্ত্তী শতবর্ষের অধিক কাল ভারত রাষ্ট্রসাধনায় রাজার আশা ও আকাঙ্ক্ষার গণ্ডী যে পার হইতে পারে নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

কত বলিব, এই শত বৎসরে বাংলা অধ্যাত্মসাধনার যে স্তরে উঠিয়াছে, তাহার ভিত্তিতলে যে সব যুগপুরুষগণের আত্মদান আছে, তাঁহাদের চরিতকীর্ত্তি আলোচনা করিলে এক-একখানি বেদ গড়িয়া উঠে। আমরা বাংলার এই শক্তিসাধনার যুগে, আদ্যাশক্তির এই সব বিগ্রহমূর্ত্তির চরণে পূজার্ঘ্যপ্রদানের জন্য, কেবল উপাসনার মন্ত্র-রূপেই সংক্ষেপে কয়েকটী কথার অবতারণা করিলাম। মুদ্রাযন্ত্রের

স্বাধীনতা রাজার রাজনীতিক আন্দোলনের ফল। তিনি উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সুপ্রীমকোর্টের নিষ্পত্তি-সংক্রান্ত প্রবল আন্দোলন তুলিয়া সে নিষ্পত্তি রহিত করিয়াছিলেন—লাখরাজ-ভূমি-বিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ইংরাজকে বুঝাইয়াছিলেন যে, এরূপ হইলে, যে প্রজামতের উপর ইংরাজরাজ্যের ভিত্তি, সে ভিত্তি টলিবে —চীনের সহিত ভারতের অবাধ বাণিজ্যনীতির তিনিই প্রবর্ত্তন করেন। বহুমুখী জীবনপ্রবাহে বাংলাকে ভাসাইয়া, রাজা ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করেন। হায়, ইহাই মহাযাত্রা, রাজা আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। কিন্তু তাঁর অমর সত্তা পরবর্ত্তী যুগে অমিত বিক্রমে জাতিকে নূতনের দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। বাংলার বিগত শতাব্দীর ইতিহাস ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের বিপুল উদ্যোগপর্ব্ব। নবযুগের কর্ম্মীদের সে অতীত শতাব্দীকে জাগ্রৎ স্মৃতির মধ্যে সসম্মানে রাখিয়া কর্ম্মোদ্যত হইতে হইবে।

*

* *

॥ চার ॥

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজা বেদের সত্যধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজ গড়িয়া যান। কিন্তু ধর্ম্মবাদের সহিত সংগ্রাম কবিতেই তাঁহার সময়ক্ষয় হইয়াছিল। তিনি এই নব ধর্ম্মমতে ও বিশ্বাসে ব্যবহারিক জীবনের ভঙ্গীগুলিকে স্থিরপ্রতিষ্ঠা দিবার অবকাশ পান নাই। সে কর্ম্মভার গ্রহণ করিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

বাংলার বর্ত্তমান যুগগঠনের মূলে, রাজার এই সর্ব্বতোমুখী প্রেরণা বিদ্যমান দেখা যায়। কিন্তু রাজার পর যাঁহারা তাঁর আশীর্ব্বাদ মাথায় বহিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন, তাঁহারা তাঁর সর্ব্ববিধ সংস্কারের প্রেরণা যুগের প্রয়োজন বুঝিয়া অনুসরণ করিতে চাহিলেন। তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করাও সহজ কথা ছিল না। তাই আমরা পরবর্ত্তী যুগে দেখি—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মসংস্কারের দিক্‌টাই অধিক করিয়া ফুটাইবার প্রয়াস করিয়াছেন। রাজার ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের যে বিরোধী ধর্ম্ম নহে, ইহা প্রমাণ করিতে ও খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব হইতে জাতিকে রক্ষা করিতে তিনিও নিঃশেষ হইয়াছেন। রাজা ধর্ম্মবিপ্লবের সূচনা মাত্র করিয়া গিযাছিলেন, মহর্ষি জয়নিশান উড়াইলেন। তিনি বাঙ্গালীকে বেদ ও উপনিষৎ ছাঁকিয়া সনাতন ধর্ম্মের এমন মধুর আস্বাদ দান করিলেন যে, বাঙ্গালী ধর্ম্মজীবনে অমর হইল। খৃষ্টান ধর্ম্ম শিক্ষিত সমাজ হইতে এক প্রকার বিদায় গ্রহণ করিল। একটা জাতি যখন গড়িয়া উঠে, তার ভিত্তিপত্তনে যে কি মহৎ আত্মদানের প্রয়োজন হয়, তাহা বাংলার এই অতীত নিগূঢ় ইতিহাস
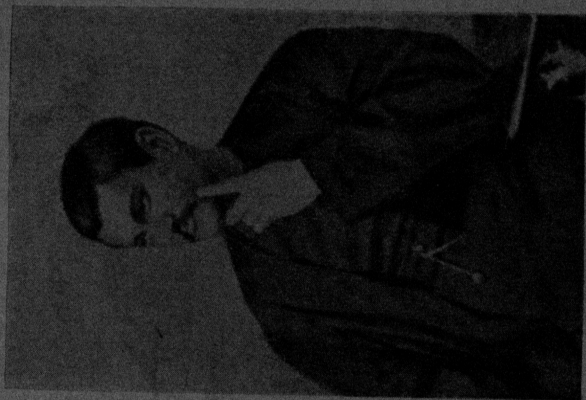
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ১৮১৭-১৯০৫

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ॥ ১৮৩৮-১৮৮৪
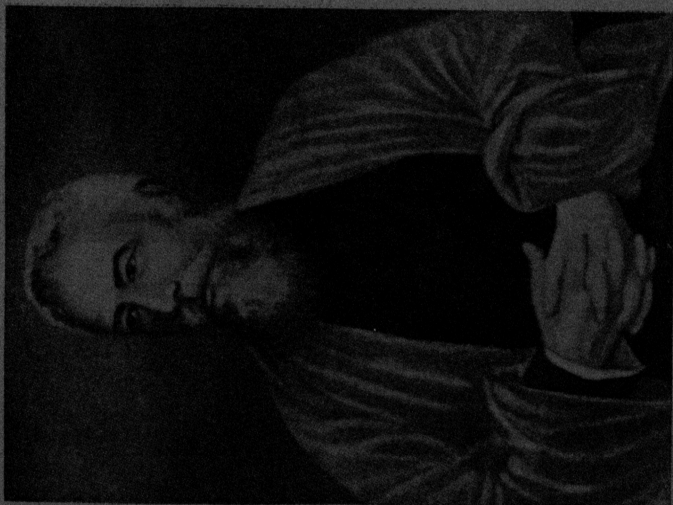
আলোচনা করিলে উপলব্ধ হইবে। আজিকার এই নবজাতিব যে অঙ্কুর দেখা দিয়াছে, তাহা মহর্ষির শোণিতসঞ্চারেই সম্ভবপর হইয়াছে। প্রাকৃত জীবনের বংশধারার ন্যায় অধ্যাত্মজীবনেও শৃঙ্খল সূত্র আছে। রাজার পব মহর্ষিই জাতির অপ্রতিদ্বন্দ্বী পূজাবিগ্রহ।

দেবেন্দ্রনাথ নবযুগের ঋষি-স্রষ্টা। তিনি প্রাচীন ধর্ম্মের বাঁধন কাটিয়া, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ২০জন সহতীর্থের সহিত যুগধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করেন। হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কাব হইতে জাতিকে মুক্তি দিবার জন্য, রামমোহন অপেক্ষা মহর্ষিকেই খৃষ্টান মিশনারীদের সহিত অধিক যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। বামমোহনেব মধ্যে জাতীয়তার দীপ্ত বহ্নি বিপ্লবধূমে আচ্ছন্ন ছিল, মহর্ষি জাতীয় ভাবের দাবানল জ্বালাইয়া তুলিলেন, দেবেন্দ্রনাথের তপোবলেই জাতি সত্য ও আলো দেখিল, অন্ধ-সংস্কারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল।

মহর্ষি ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুজাতির সহিত পাছে পার্থক্য সৃষ্টি করে, তাহার জন্য সতর্ক থাকিতেন। তিনি রামমোহনের অন্তরেচ্ছাটী জীবনময় কবিয়া প্রচাব কবিতেন—"আমবা কিছু নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি না......চিরকাল ধবিয়া যে ধর্ম্ম উন্নত হইয়া চলিয়া আসিতেছে—তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম।" তিনি আরও বলিতেন "হিন্দু প্রথা, হিন্দু রীতি ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে হইবে—হিন্দু সমাজের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া যাহাতে হিন্দু রীতিনীতি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুযায়ী হয়, চেষ্টা করিতে হইবে।"

এই সকল উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শত বৎসর পূর্ব্বে রাজাব জীবনে যে সত্য প্রেরণা জাগ্রৎ হইয়া, তাঁহাকে হিন্দু ধর্ম্মের সহিত বিবোধে প্রবৃত্ত কবিয়াছিল, সে বিরোধের হেতু হিন্দুত্বকে বিনাশ করা নহে, পরন্ত কালপ্রভাবে ধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হইলে, তাহা

দূর করিতে ভগবান্ যেমন স্বয়ং অবতীর্ণ হন, রাজাও তদ্রূপ ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থ বাংলায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। যুগধর্ম্মের বিজয়-শঙ্খনিনাদে হিন্দু জাতির মোহ যে বহুল পরিমাণে অপসারিত হইয়াছে, পরবর্ত্তী যুগের ধারাবাহিক ধর্ম্মপ্রবাহ তাহার নিদর্শন। রামমোহনের পর মহর্ষির আগমন না ঘটিলে, যুগধর্ম্মের ছন্দঃ রক্ষিত হইত কি না, সন্দেহ।

বাংলার পলিমাটিতে বেদান্তের প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণ চিরদিন অনাদৃত হইত—আগম-নিগম-বামাচার বাঙ্গালীর মধ্যে প্রবল ছিল—তাহার উপর গৌড়ীয় ভক্তিতত্ত্ব সোণায় সোহাগা হইয়াছিল—বাংলার শক্তিবাদ রসাশ্রিত ভক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া, বাঙ্গালীর চরিত্রে নারীপ্রকৃতির আরোপ করিয়াছিল। রাজাই সে কুসুম-কোমল জীবনে বজ্রের কাঠিন্যগুণ অনুপ্রবিষ্ট করেন, তাই তিনি বলিতেন—এ জাতি বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম্মই অনুষ্ঠান করিবে। তিনি পৌত্তলিকতা প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মবিধির উপর খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, রক্ষণশীল জাতি সহজে এই যুগপুরুষের উক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই, জাতিকে উৎসন্ন দিতেই তাঁর আবির্ভাব, এইরূপ কলঙ্ক রটাইতেও দেশ পশ্চাৎপদ হয় নাই। স্বজাতির প্রতি তাঁর অসাধারণ মমতা তিনি গতানুগতিক পন্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কার্য্য করিতেন বলিয়া, অনেকের চক্ষেই পড়ে নাই; তিনি কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বলিতেন—"জাতীয়ভাবে সার্ব্বজনীন বা সার্ব্বজনীনভাবে জাতীয় হইতে হইবে"—তাঁর এই জাতীয়তা মহর্ষির জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

যেদিন একজন যুবক তাঁর স্ত্রীকে লইয়া খৃষ্টান মিশনারীদের আশ্রয় লইল, হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মধ্যে ধর্ম্মান্তরগ্রহণের

দুরাকাঙ্ক্ষা জাগিতে আরম্ভ করিল, মহর্ষি সেদিন হিন্দুত্বরক্ষার জন্য কি যে প্রাণপাত শ্রম করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। হিন্দুধর্ম্মের সারবস্তু বেদান্তমন্থনে আবিষ্কার করিয়া, তিনি কয়েকজন ধর্ম্মবন্ধুর সহিত একযোগে কর্ম্মোদ্যত হইলেন, মহর্ষির "হিন্দুহিতৈষী সভা" প্রভৃতি হিন্দুত্বকে রক্ষা করিবারই বিপুল উদ্যোগ।

এই নবধর্ম্মের অমর প্রেরণায় তাঁর সবখানি অনুপ্রাণিত হইলেও, জাতীয় ভাবকে রক্ষা করার অতিমাত্রায় ঝোঁক থাকায়, তিনি ধর্ম্ম ও সমাজের বহুবিধ সংস্কারচিন্তা অন্তরে আশ্রয় দিলেও, সময় ও শক্তির পরিমাপ না বুঝিয়া তাহা সহসা কার্য্যে পরিণত করিতে চাহিতেন না। স্বচ্ছ ধর্ম্মবল আনয়ন করাই যেন তাঁর জীবনের কার্য্য ছিল। বেদ-উপনিষৎ ছাঁকিয়া তিনি উচ্চ অধ্যাত্মতত্ত্ব-গুলিকে সময়োপযোগী জীবনের ব্যবহারে আনিয়াছিলেন—ইহা অল্প সামর্থ্যের পরিচয় নয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের পর, রাজার ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন লুপ্ত হইতে বসিয়াছে, তখন মহর্ষি যদি অটলপদে ইহা না ধরিতেন, তাহা হইলে আজ আর ইহার চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না।

মহর্ষির সহকর্ম্মীরূপে আর এক মহাপুরুষের নাম এখানে উল্লেখ-যোগ্য। তৎকালে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন যাঁহারা, তাঁহারাই হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ ছিলেন, এই যুগপুরুষের জীবন হইতে তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়—ইনি যশস্বী রাজনারায়ণ বসু।

তিনি কলিকাতায় শিক্ষার জন্য আসিয়া, মহর্ষির সহিত আলাপ করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মসমাজের কাজে আত্মদান করেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে রাজার অভ্যুদয় হইতে এই সময়টীকেই বাংলার নবজন্মকাল বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালী অতীতের মোহ কাটাইয়া, ভবিষ্যৎ বৃহৎ জীবনের

জন্য জাতিহিসাবেই এই সময়ে নূতন মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে। বাংলার আধুনিক সর্ব্ববিধ জীবনীশক্তিবিকাশের মূল অন্বেষণ করিলে, এই যুগের দিকে সম্ভ্রমদৃষ্টি আকর্ষিত হয়—দেশের পূজ্য যুগপুরুষগণের এমন একত্র সমাবেশ কোন কালে ঘটে নাই।

সাধু রাজনারায়ণ ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করিয়া ইহার মধ্যে জাতীয়তার যে প্রবল আগুন জ্বালাইয়া তুলিলেন, সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহার তুলনা মিলিল না। ব্রাহ্মমতে তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের বিবাহ দেন, এই কৃষ্ণধন ঘোষের পুত্রই শ্রীঅরবিন্দ। এইজন্য অনেকে রাজ-নারায়ণকে "জাতীয়তার দাদামহাশয়" বলিয়া সম্মান প্রদান করেন।

রাজনারায়ণ জাতীয় গৌরবসম্পাদনী সভা স্থাপন করিয়া ধর্ম্ম-প্রচারের জাতীয়তার সঙ্গে গৌরব প্রচার করেন। তিনি "An old Hindu's hope" নামক যে ইংরাজী পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন—তাহা হইতেই তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি কি উচ্চ ধরণের ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তা' ছাড়া হিন্দুত্বের উপর এমন অসাধারণ মমতা অনেক গোঁড়া হিন্দুর মধ্যেই দেখা যায় না। তাঁর হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে বক্তৃতা শুনিয়া শুধু বাংলা নয়, ভারতের সর্ব্বত্র ধন্য-ধন্য রব উঠিয়াছিল। ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সোম-প্রকাশে লিখিয়াছিলেন, "হিন্দুধর্ম্ম নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছিল—রাজনারায়ণবাবু তাহাকে রক্ষা করিলেন।" ইহা বড় কম গৌরবের কথা নয়। রাজার প্রথম ধর্ম্মপ্রচার-কালে, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম জাতি ও সমাজের মূল শিথিল করার উগ্র বিষ বলিয়া ঘৃণায় অনেকেই মুখ ফিরাইতেন, সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের অতুলনীয় শক্তির স্পর্শে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য-যুগ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল—হিন্দুপ্রধান পরম

গুণগ্রাহী ভূদেববাবু নিজের উপবীত রাজনারায়ণবাবুর কণ্ঠে জড়াইয়া বলিয়াছিলেন—"রাজনারায়ণ, তুমিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, আমরা তোমার তুলনায় কিছুই নয়।"

সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া শেষ বয়সে তিনি স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়াছিলেন। দেওঘরে বাসকালে পাণ্ডারা তাঁহার সাধুতার গুণে বলিতেন—"ও আমাদের দো রা বৈদ্যনাথ!" বাঙ্গালীর জীবনে আজও যে জাতীয়তার গর্ব্ব, হিন্দুত্বের মহিমা আমরা অনুভব করি, সে পরশের মধ্যে রাজনারায়ণের অমর আশীর্ব্বাদ আছে, বাঙ্গালী তাই তাঁকে যুগপুরুষ বলিয়াই চিরদিন পূজা করিবে।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রদীপ্ত সূর্য্য যখন বাঙ্গালীকে প্রখর কিরণে ঘিরিয়া ধরিয়াছে, সেই সময়ে সমাজের ধর্ম্মবিশ্বাসে ঘোরতর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। মহাত্মা রামমোহনের পন্থানুসরণ করিয়া, মহর্ষি বেদের উপর অভ্রান্ত বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক আত্মানুভূতির সাহায্যে ধর্ম্মমত প্রচার করিতেন। সমাজের মধ্যে এতদিন মতবিরোধের কোন কারণ ঘটে নাই, কিন্তু ডফ্ প্রমুখ খৃষ্টান মিশনারীগণের প্রভাবে, ব্রাহ্মদের মধ্যে বেদকেই অভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রধান উপাদান না করিয়া ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তি আত্মপ্রত্যয়ের উপরে নিহিত করার প্রশ্ন উঠিল। মহর্ষির সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া অবশেষে শেষোক্ত ধর্ম্মবিশ্বাসই ব্রাহ্মসমাজে প্রাধান্য পাইল। এই আত্মপ্রত্যয়মূলক ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর দাঁড়াইয়া পরবর্ত্তী কালে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মে নব-নব বিধানপ্রবর্ত্তনে উহাকে নূতন আকার দিতে সুযোগ পাইয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা কোন বিষয়ে শাস্ত্রগ্রন্থের চরম অনুশাসন স্বীকার করে নাই। মুহুর্মুহু তাঁর আঘাতে সমাজের

প্রাণশক্তি প্রমাদ গণিয়াছিল। মহর্ষির নেতৃত্বাধীনতায় যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই পুরাতন সৃষ্টির বুকে এরূপ নির্ম্মম আঘাত দিয়া নূতনের অভ্যুত্থান সম্ভবপর করিয়া তুলিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এতখানি বিপ্লবী-দৃষ্টি লইয়া তাঁহারা মহর্ষির ধর্ম্মে আত্মদান করেন নাই।

যে সত্য রাজার মধ্যে অবতরণ করিয়া জাতির জীবনে সঞ্চারিত হইবার উপক্রম করিতেছিল, তাহা যদি সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িত, ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পূর্ণ হইত না। তাই কেশব-চন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশিষ্ট রূপ দিতে গিয়া ইহার মূল শিথিল করিয়া দিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুর জীবনেই বলবিধান করিল। ছাঁচ ভাঙ্গিল, সত্য প্রেরণা কিন্তু ব্যর্থ হইল না।

কেশবচন্দ্র একখণ্ড উল্কার মত বাংলার জীবনে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নবতন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেও, নব শক্তির উচ্ছ্বসিত তরঙ্গাঘাতে প্রাচীন সমাজের বাঁধ ভাঙ্গিতে দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের নিখুঁত সত্যানুবৃত্তি তাঁর সৃষ্টির পথে পুরাতনের সহিত আপোষ করে নাই, বরং সংগ্রাম করিয়াছে। নিরন্তর প্রবাহে গিরিবক্ষও বিদীর্ণ হয়, সত্য প্রেরণার অজস্র স্রোতোধারায় পরিশেষে তাঁর ঐহিক শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়া-ছিল। কেশবচন্দ্রের অশরীরী আত্মা দেশের বুকে এখনও বুঝি বিদ্যুৎ, ছড়াইতেছেন। সমাজবিপ্লবের কোলাহল আজিও নীরব হয় নাই, জাতিকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া স্বাস্থ্যপূর্ণ স্বচ্ছন্দ জীবন দিতে তাঁহার অমোঘ শক্তির অব্যক্ত প্রেরণা আজিও স্তব্ধ হয় নাই।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের পর, মহর্ষি যখন সুধীজনের কর্ণে নূতনের নির্ভীক আহ্বান ঋক্‌মন্ত্রের মত ঝঙ্কার দিতেছিলেন, তখন এই

তরুণ কর্ম্মী কলিকাতা নগরীর মধ্যে আত্মপ্রতিভার উন্মেষসাধনে তৎপর ছিলেন।

খৃষ্টান মিশনারীদের মত, আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান্ মিশনারিগণের এক দল ছিল। এই দলের প্রতিনিধি ড্যাল সাহেব ও সুবিখ্যাত পাদ্রি লং সাহেবের সহিত সমবেত হইয়া, কেশবচন্দ্র বৃটিশ ইণ্ডিয়া সভা সংগঠন করেন। এই সভার সম্পাদকরূপে নিজ ভবনে সান্ধ্য সভায় ছাত্রদের লইয়া তিনি বক্তৃতা দিতেন। তরুণ ছাত্র-সমাজ কেশবচন্দ্রের সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। তিনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে "Good-will Fraternity" নামে যুবকদের জন্য আর একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভায় মহর্ষি আহূত হইয়া কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতা ও প্রতিভার পরিচয় পান; ইহার পর হইতেই উভয়ের মধ্যে অপূর্ব্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কেশবচন্দ্র ইহার পর বৎসরেই ব্রাহ্মধর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিলেন। মহর্ষি তখন স্থানান্তরে ছিলেন, ব্রাহ্মসমাজে কেশবের মত উৎসাহী কর্ম্মী পাইয়া তিনি বিশেষ পুলকিত হইলেন। তিনি নবধর্ম্মের জয়নিশান কেশবচন্দ্রের হস্তে তুলিয়া দিলেন। কেশব মহর্ষির কুক্ষি হইতে সত্যের বীজ আত্মজীবনে সংস্থত করিয়া স্বয়ং বাঙালীকে নূতন করিয়া গড়িতে উদ্যোগী হইলেন।

তখন কে জানিত, কেশবের শক্তিমন্থনে ব্রাহ্মসমাজ টলটলায়মান হইবে! প্রথম-প্রথম মহর্ষি কেশবের সকল কর্ম্মে উৎসাহ দিতেন, পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন; কিন্তু কেশবের প্রতিভা ও প্রকৃতির মধ্যে জাগরণের উদ্দাম চাঞ্চল্য ও নিত্য নূতন সৃষ্টির দিকে এমন প্রবল আবেগ দেখা দিতে লাগিল যে, শুধু মহর্ষি কেন, সাধু রাজনারায়ণ প্রভৃতি অনেকেই তখন ব্রাহ্মসমাজের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় কেশবের

আচরণে মর্ম্মান্তিক আক্ষেপের সুর তুলিতে আরম্ভ করিলেন। কেশবের মত বীরকর্ম্মীর জীবনভারে ব্রাহ্মসমাজ প্রমাদ গণিল।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, ইহাতেও তাঁর প্রতিভার ঠাঁই হইল না; তিনি সঙ্গত-সভার আয়োজন করিলেন ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে, সমাজের কাজে জীবনের সবখানি ঢালিয়া দিলেন। তিনি সংসার হইতে বিদায় লইয়া, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সমাজের আচার্য্যপদে নিযুক্ত হইলেন ও হৃদয়ের অদম্য আবেগে, বাংলার বাহিরে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হইলেন। সারা ভারত কেশবের শক্তির পরিচয় পাইয়া উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের সে যুগ বড় গৌরবের যুগ।

মধ্যাকাশে সূর্য্য উপনীত হইলে, দশদিক্ প্রখর কিরণে উদ্ভাসিত হয়; কিন্তু পরক্ষণেই সূর্য্যকে অস্তাচলের পথে অবতরণ করিতে হয়। ব্রাহ্মসমাজের সৌভাগ্যসূর্য্য কেশবের প্রতিভায় সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি ধরিয়াই স্তিমিত হইয়া পড়িল। গোল বাধিল ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে, কেশবচন্দ্র যখন দুইটী অসবর্ণ বিবাহের আয়োজন করিলেন। ব্রাহ্মমতে বিবাহ আইনসম্মত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া, যখন তিনি দেখিলেন ব্রাহ্মসমাজ ইহাতে আপত্তি করিবে, তখন সিভিল মতেই ব্রাহ্মবিবাহ প্রচলিত করিলেন। কেশব নূতনের প্রেরণায় এমনই উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, টাউন হলে এই প্রসঙ্গের বক্তৃতায় তিনি বলিতে কুণ্ঠাবোধ করিলেন না, "The term Hindu does not include the Brahmos." মহর্ষির অন্যতম সহকারী, স্বজাতি-বৎসল, দূরদর্শী রাজনারায়ণ কাতর কণ্ঠে বলিলেন—"ব্রাহ্মসমাজের শোচনীয় দিবস সেই দিন, যেদিন কেশব আপনাকে হিন্দু বলিতে অস্বীকার করিল।"

সত্যই এতদিন ব্রাহ্মগণ নিজেদের হিন্দু হইতে স্বতন্ত্র বোধ করিত না। মহর্ষি যদিও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাবে উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন, কেশবের সহিত মিলিত হইয়া নিজ কন্যার নূতন মতে বিবাহ দিয়াছিলেন, পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি গুরুতর সমাজবিপ্লবের পক্ষপাতী ছিলেন না, হিন্দু হইতে ব্রাহ্মসমাজকে বিচ্ছিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন নাই। কেশব বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনাসভায় মহিলাদের অবাধ আসনগ্রহণের ব্যবস্থা ও উপবীতধারী ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মদের আচার্য্য, ইহা মানিতে অস্বীকার করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে একটা আনকোরা নূতন ছাঁচে ঢালিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিরোধের আগুন জ্বলিল। ব্রাহ্মসমাজের মন্দির ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, মহর্ষির বাটীতে উপাসনার ব্যবস্থা হয়। কেশবের দল গিয়া দেখিল—আচার্য্যের আসনে উপবীতধারী ব্রাহ্মেরা বসিয়াছেন, তখনই তিনি স্বতন্ত্র স্থানে প্রার্থনাসভার আয়োজন করিলেন। এ বিরোধ আর মিটিল না। কেশবের অলৌকিক প্রেরণাবলে, তরুণ ব্রাহ্মেরা অভাবনীয় অধ্যাত্মানুভূতিতে উন্মাদ হইয়া উঠিল, তাহারা নগ্নপদে রাজপথে কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেশবের উদ্যোগে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নূতন উপাসনামন্দির নির্ম্মাণ করা হইল, দলে-দলে তরুণ ব্রাহ্মেরা গান ধরিল :

"নর-নারী সাধারণের সমান অধিকার।
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাতিবিচার॥"

জাতি তখন গঠনের মুখে; ঐক্যসাধনার এই মন্ত্র তরুণের চিত্ত আকৃষ্ট করিল। অতীতে হিন্দুসমাজ হইতে জীবনের পথে রাজা ও মহর্ষির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যাঁহারা কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন,

তাঁহাদের মধ্যে সকলেই কেশবের উচ্ছ্বসিত শক্তিতরঙ্গে ঝাঁপ দিলেন না। অন্তর-বাহিরে সমান করিতে গিয়া কেশব নব ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। তাঁর কর্ম্মপ্রেরণায় বুঝি পৃথিবীজয়ের বীজ ছিল। যে হিন্দুসমাজ জাতি-বর্ণের দায় ছাড়িতে প্রস্তুত নহে, তাহাকে মরণের হাতে সঁপিয়া দিয়া তিনি একটী নূতন জাতি-নির্ম্মাণে উদ্যত হইলেন। এই স্পর্দ্ধার মূল যে কি, তাহা যদি কাহারও চক্ষে পড়িত, তাহা হইলে বুঝিতে বাকী থাকিত না—জাতিগঠনের সত্য প্রেরণা মূর্ত্তি লওয়ার পথে বিঘ্নস্বরূপ যাহা, তাহা বর্জ্জন করার নির্ম্মমতা কত স্বাভাবিক।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে, কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে গমন করেন। তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রভাবে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া পর্য্যন্ত কেশবের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া তিনি সমাজের অধ্যাত্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হন। তাঁর "ভারত আশ্রম" এক নূতন আদর্শ—ধর্ম্মপ্রচারকদের একত্র রাখিয়া, প্রার্থনা ও আরাধনার মধ্য দিয়া অধ্যাত্মজীবনগঠনের সে এক বিচিত্র আয়োজন। তাহার পর "সাধনকাননে", সাধকদের অধ্যাত্মজীবনের উন্মেষসাধনের জন্য তিনি প্রাণপণে পরিশ্রম করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে, রাজপ্রতিনিধি-গণকে লইয়া তিনি "সমদর্শী দল" গঠন করেন।

কেশবের শক্তির যেন সীমা ছিল না। কিন্তু কুচবিহারের বিবাহ-ব্যাপার লইয়া, তাঁহার দলের মধ্যেই বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়। তিনি নিজেকে তাঁহার পুরাতন দলের সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া, নববিধান সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। জীবনব্যাপী পরিশ্রমে এই সময়ে তাঁহার শরীরে দারুণ বহুমূত্র রোগ প্রবেশ করে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মানন্দ কেশবের দিন শেষ হয়। সারা জীবনে তিনি বাংলার অধ্যাত্মযুদ্ধে

জয়চ্ছত্র উড়াইতে যে শ্রম ও উৎসাহ দেখাইয়াছেন, তাহা অতুলনীয়।

কিন্তু বিশাল হিন্দুসমাজের চাপ বিদীর্ণ করিয়া কেশবের নব বিধান একটি বিপুল সৃষ্টি গড়িয়া তুলিল না। কেশবের সঙ্গে সে আশাও বুঝি শেষ হইয়াছে। কিন্তু যে সত্যপ্রেরণা কেশবের প্রাণে অবতরণ করিয়া একটী নবজাতির নির্ম্মাণে তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা অমর। ভারতেব এই নবযুগের ইতিহাসে তাহা অমৃতের ন্যায় হিতকারী। বাংলার জাগরণ একদিনের আকস্মিক ঘটনা নহে—বাঙ্গালী তিলে তিলে গড়িয়া উঠিয়াছে।

রাজার জীবনের উপর ভর করিয়া বাংলায় যে সত্যধর্ম্ম অবতরণ করিয়াছিল, যাহার প্রভাবে মহর্ষি প্রমুখ প্রবীণ ব্রাহ্মগণ ঘুরপাক খাইয়া, ইহাকে জাতির জীবনে ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পথ পাইতেছিলেন না, কেশবচন্দ্র সংকর্ষণের মত এই সত্যবারিধিবক্ষ মন্থন করিয়া প্রবলবেগে আছড়াইয়া পড়িলেন—জাতির সনাতন তীর্থ-মন্দিরে।

দক্ষিণেশ্বরের সূত্র কেশবচন্দ্রই জাতির হস্তে তুলিয়া দিয়া যান। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যুগধর্ম্মের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া, একদিন বেল-ঘরিয়ার উদ্যানে গিয়া উপস্থিত হন। ইহাতেই মণিকাঞ্চন-সংযোগ হইল। কেশব যে ধর্ম্মভার বহিতেছিলেন, তাহা ঠাকুরের জীবন-বেদীতে যে দীপ্ত যজ্ঞকুণ্ড জ্বলিতেছিল, তাহাতেই যেন আহুতি দিয়া আপনাকে নিঃশেষ করিলেন। অধ্যাত্মজীবনেতিহাসের পর্য্যায়ে ইহা আমরা নির্ভুল এবং অনিবার্য্য দিব্যনীতি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সাধক বিজয়কৃষ্ণ যাহা নিজমুখে বলিয়াছেন তাহাতে অপ্রত্যয়ের কোন কারণ নাই—“তিনি (কেশব) ঠাকুরকে

জীবন্ত ধর্ম্মমূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন। নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া তিনি যেখানে শয়ন, ভোজন, উপবেশন ও সমাজের কল্যাণ-চিন্তা করিতেন, সেই সকল স্থান ঠাকুরকে স্বয়ং দেখাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে বলিয়াছিলেন··· · তাঁহার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ কবিয়াছিলেন।”

কেশবের নববিধান এই দিন হইতে অমর হইয়াছে। ইহার পর হইতে, কেশবচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ঠাকুরকে প্রণামকালে বলিতেন—“জয় নববিধানের জয়।” ঠাকুরের সহিত কেশবেব পরিচয় আবার একটা নূতন যুগের জন্ম দিয়াছিল। কেশবের মুখে ঠাকুরের মহিমা শুনিয়াই, নরেন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি যুগের মানুষ তাঁহার কাছে সমাগত হন। ঠাকুরের সহিত কেশবের সম্মিলনের পর হইতে কেশবচন্দ্র ভাঙ্গিতে আরম্ভ করেন। কেশব-চন্দ্রের সহিত ঠাকুরের অধ্যাত্মসম্বন্ধের পরিচয় আমরা ঠাকুরের মুখ হইতেও শুনিতে পাই। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের দেহত্যাগ করার কথা শুনিয়া, তিনি তিনদিন শয্যাত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার কথা—“এই কথা শুনে মনে হয়েছিল যে, আমার একটা অঙ্গ ছিঁড়ে গেল।” এই অভেদ পরিচয়ের অধ্যাত্মহেতুর মর্ম্মভেদ করিতে যাঁহারা প্রস্তুত নন, তাঁহাদের কথা আমরা ছাড়িয়া দিই। সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া থাকার জীবন্ত ইতিহাসের সচল নজীব ভিন্ন তাঁহাদের জীবনের অন্য কোন মূল্য নাই। আমরা দেখিতে পাই—বাংলায় ধর্ম্মপ্রবাহের অনাহত ধারা জীবনের সীমা উল্লম্ফনে অতিক্রম করিতে-করিতে কোন্ পথে ছুটিয়াছে! যে অধ্যাত্ম-বেদীর উপর জাতির ভবিষ্যৎ স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইবে, সেই সনাতন নীতিটি আমরা শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিব, যুগপুরুষগণের বিভ্রান্তকারী ঔজ্জ্বল্যে আমরা বিভ্রান্ত হইব না। বাঙ্গালী

সম্প্রদায়বিশেষকে পুষ্ট ও রক্ষা করিতে জন্মে নাই। বাঙ্গালী জন্মিয়াছে,—জাতিরূপে জাগিতে, রক্ষা পাইতে। সে ক্রমবর্দ্ধনশীল গতি অধ্যাত্মানুভূতির উচ্চভূমির উপরেই ক্রমোন্নীত হইবে। তাই আমরা নিঃসংশয়ে কেশবচন্দ্রের জীবন ছানিয়া যুগধর্ম্মের প্রবল প্রবাহটিকে দক্ষিণেশ্বরে খুঁজিয়া পাই; এবং এই গঙ্গোত্রীধারার উৎসমূলে যে মহাদেবতাকে দেখি, তাঁরই চরণতলে জাতি হিসাবে বাঙ্গালী দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। সে অমর দীক্ষা ব্যর্থ হইবার নহে। এইবার এই পুণ্যকাহিনীর অবতারণা করিব।

*

* *

॥ পাঁচ ॥

ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুত্থান জাতীয় জাগরণের একমাত্র কারণ নহে। তবে বিগত কয়েক শতাব্দীর আবর্জ্জনাস্তূপে জাতির ধর্ম্ম ও সমাজশক্তির হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের যত্নে ও অধ্যবসায়ে অসংখ্য প্রকার কুসংস্কার ও অনাচার হইতে জাতি পরিচ্ছন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করার সুযোগ পাইয়াছিল, ইহাতে আর সংশয় নাই। ভূদেব, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ রক্ষণশীল উচ্চ প্রতিভা-শালী হিন্দুর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইত, ব্রাহ্মসমাজের আঘাত যদি জাতিকে সচেতন করিয়া না তুলিত।

স্বদেশী যুগের পশ্চাৎ রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সহিত ব্রাহ্ম-সমাজের সংঘর্ষ জাতিকে রক্ষা করিয়াছে—নতুবা একদিকে অন্ধ গোঁড়ামী অথবা অন্যদিকে পাশ্চাত্তোর শিক্ষা ও সভ্যতার বেড়াজালে হিন্দুজাতি বন্দীই থাকিত, মুক্তির আলো কোনদিন দেখিতে পাইত কিনা, সন্দেহ।

দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের আবর্ত্তনে আত্মবিরোধ যখন চরমে উঠিয়াছে, স্বজাতিবিদ্বেষের হলাহলে· উদীয়মান সংহতিশক্তিগুলি যখন পুনরায় অবসন্ন হইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে, হিন্দুত্বের সকল লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা তপস্যার আগুনে বিশুদ্ধ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ আত্মপ্রকাশ করিলেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে হইতে দক্ষিণেশ্বরের মহিমা বিশেষভাবে প্রকট হইয়া উঠে, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাহা-ছাড়া কেশবচন্দ্রের জীবনসাধনার

সহিত ঠাকুরের অন্তর্মুখী সাধনায় একটা গভীর যোগ ছিল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। এই সকল আত্মানুভূতির কথা খুলিয়া বলা যুক্তিযুক্ত নয়, তবুও এইটুকু বলি যে, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর যখন ব্রাহ্মণীর নিকট শক্তিসাধনায় জীবনের সবখানি ঢালিয়া দিয়াছেন, কেশবকে তখন হইতেই আমরা ব্রাহ্মসমাজের কাজে উদ্বুদ্ধ হইতে দেখি। ঠাকুরের সাধনা সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে, চুম্বকাকর্ষণে লোহার মত এই দুই অপূর্ব্ব জীবনের মিলন বাংলার অধ্যাত্মেতিহাসে এক অলৌকিক রহস্য। কেশবের পশ্চাৎ কি মহাশক্তি অলক্ষ্যে থাকিয়া, তাঁহাকে জাতির ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, তাহা তিনি নিজেই হয়তো বুঝিতেন না। কিন্তু তাঁহার এক-একটী বাণী আজও মানুষের প্রাণে শক্তির নির্ঝর উৎসরিত করে। কেশবের স্মৃতি বাঙ্গালীর মর্ম্মে গাঁথিয়া গিয়াছে।

অতীতের অধ্যাত্মভিত্তির পুনরুদ্ধারে রাজার জীবনপাত হইয়াছিল। মহর্ষি প্রমুখ মহৎপ্রাণ ব্রাহ্মনেতার অক্লান্ত পরিশ্রমে সত্যের অনুভূতি মাত্র জাতীয় জীবনে স্পর্শ দিয়াছিল। ভগবদনুভূতির ভাবরূপ সৃষ্টি করিয়া, ইহজীবনে তাহার অমৃতাস্বাদ কেশবের জীবনে সুরু হইয়াছিল। ঠাকুরের সাধনায় তাহার মূর্ত্ত বিগ্রহ জাতিকে ধন্য করিয়াছে। শতাব্দীর সাধনা দক্ষিণেশ্বরে পরিপূর্ণতার আনন্দে সমৃদ্ধ হইয়াছিল—সাধনার পূর্ণাহুতি এইখানেই সার্থক হইয়াছে—দক্ষিণেশ্বর তাই জাতির সিদ্ধতীর্থ।

ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মান্দোলনের আঘাতে প্রাচীন হিন্দুসমাজে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। পল্লীতে-পল্লীতে হরিসভা, ভিতরে-ভিতরে গোপন তান্ত্রিকতা, সহজিয়া প্রভৃতি সাধনপ্রভাব বাংলায় প্রকট হইয়া উঠে। ঠাকুর এই অসংখ্য সাধনপদ্ধতির সামঞ্জস্যবিধানের

জন্য, কোলাহলময় কলিকাতা নগরীর কর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবনের দূরে থাকিয়া, একে-একে সবগুলিকেই নিজের মধ্যে সংহরণ করিতেছিলেন, তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাসে ইহা সুস্পষ্টভাবেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। সাধনা সম্পূর্ণ করিয়া তিনি যখন ধন্বন্তরির মত সুধাভাণ্ড হস্তে সিদ্ধি বিলাইতে ভক্তদের আকুল কণ্ঠে ডাক দিয়া তাহাদের দেখা পাইলেন না, তখন তিনি নিজেই বেলঘরিয়ার বাগানে গিয়া, কেশব যেখানে ঈশ্বরভক্তের ঝাঁক লইয়া আনন্দমগ্ন, সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে মার্জ্জিতবুদ্ধি, উচ্চশিক্ষিত নব্যবঙ্গ নিরক্ষর ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। "কেশবের লেজ খসিয়াছে", এই কথা শুনিয়া সকলে বিরক্ত হইয়াছিল। কিন্তু কেশব দিব্যদৃষ্টিবলে যখন এই মহাপুরুষের সত্য পরিচয় পাইলেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে প্রত্যয়পত্র পাইয়া, দলে-দলে শিক্ষিত বাঙ্গালী ঠাকুরের চরণতলে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, ঠাকুরের পরিচয় কলিকাতার বিদ্বৎসমাজে ছড়াইয়া পড়ে নাই। কেশবচন্দ্রই ইহার অগ্রদূত। নরেন্দ্র কেশবের মুখ হইতে ঠাকুরের অলৌকিক জীবনকাহিনী শুনিয়া, দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া জীবন বিকাইয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণও কেশবের সঙ্কেত ধরিয়া নবযুগের কেন্দ্রচক্রে আসিয়া অধ্যাত্ম-সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন।

এতদিন ধরিয়া গতানুগতিক জীবনধারার উপর আঘাত দিয়াই জাতির চেতনাকে উর্দ্ধমুখী করার প্রচেষ্টা চলিতেছিল, চিন্তাজগতে তত্ত্বের তরঙ্গসৃষ্টি হইয়াছিল। সাধনা জীবনময় করার অধ্যাত্ম-নির্দ্দেশ ঠাকুরের জীবন দিয়া সিদ্ধ হইল। তরুণ বাংলা কেশবের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু প্রাণঢালা সাধনার পথ খুঁজিয়া

পাইতেছিল না। কল্পতরু ঠাকুর প্রশস্ত রাজপথ দেখাইয়া দিলেন।

যে প্রতিমাপূজা লইয়া সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী হিন্দু আত্মকলহে মানবপ্রকৃতির অবর স্তর হইতে ঈর্ষার আগুন ছড়াইয়া নিজেদেরই মধ্যে দ্বন্দ্ব করিতেছিল, সে সমস্যা প্রত্যক্ষানুভূতির বিদ্যুন্মূর্ত্তি ফুটাইয়া এক নিমেষে সমাধান করিলেন নিরক্ষর ব্রাহ্মণ—আন্তরিক সাধনার ভিতর দিয়া। বাঁচার প্রেরণা চিন্তার জগতেই তরঙ্গ তুলিয়াছিল, বিচার-বিতর্কে কোন্দলের কোলাহল অশান্তির আগুনই জ্বালিতেছিল, এমন সময়ে দক্ষিণেশ্বরে হিন্দুত্বের জাগ্রৎ-বিগ্রহ প্রকটিত হইল—জীবনের উপর ভিত্তি করিয়া। হিন্দুজাতি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। পাশ্চাত্ত্য প্রভাব হইতে আত্মরক্ষার উপায়োদ্ভাবনে যে শক্তি শুধু আবর্ত্তের সৃষ্টি করিতেছিল, সে শক্তি প্রশান্ত-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিন্দুত্বের জয়ধ্বজা উড়াইবার জন্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী তেজে ঘরের বাহির হইল। স্বদেশী যুগের সত্য প্রেরণা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে, দক্ষিণেশ্বরের সাধনা গভীরভাবে পর্য্যালোচনা করিতে হয়।

এই প্রসঙ্গে অনেক কথাই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা লইয়া অধিক আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। তবে এই নবযুগের বাঙ্গালী জাতির বিচিত্র জীবনরহস্যের মূলে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা আমরা কোনমতেই আশ্রয় করিতে পারিব না—যদি দক্ষিণেশ্বরের মর্ম্মরহস্য উদ্ভেদ করিতে অসমর্থ হই।

ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব হ্রাস হইবার উপক্রম-কাল হইতেই দক্ষিণেশ্বরের হোমাগ্নি উচ্চ শিখায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য, বিদ্যাসাগরের উন্নত চরিত্রের আদর্শ,

কেশবচন্দ্রের অন্তরপ্রতিভা, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির অসাধারণ বাগ্মিতা জাতীয় জীবনোন্মেষের ইন্ধন আহরণ করিতেছিল বটে—কিন্তু ছায়ামূর্ত্তির মত ইহা কেবল দর্শকের চিত্তে কৌতূহলসৃষ্টি ছাড়া জীবনে এমন কোন উত্তাপ সঞ্চার করিতে পারে নাই, যাহা জাতিকে সেইদিনের সঙ্কটে রক্ষা করিতে পারে। আদর্শ স্থাপন করিয়া প্রাণ উদ্বুদ্ধ করিলেই বাঁচা যায় না, প্রাণকে তদনুযায়ী গড়ার সাধনা দেওয়া চাই—সে সাধনার সন্ধান ব্রাহ্মসমাজ দিতে গিয়া যে বিধি গড়িলেন, তাহা যুগোপযোগী করার দায়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের ভাব ও সাধনার মিশ্রণে এক অপূর্ব্ব বস্তু গড়িয়া উঠিল। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনামন্দিরে ভীড় বাড়িল; কিন্তু ভারতের প্রাণ দীক্ষা লইল না। কাজেই বলিতে হয়—জাতির মৌলিক প্রাণ প্রবুদ্ধ করার যে সিদ্ধ বীর্য্য, তাহা ব্রাহ্মসমাজের বেদীতলে পাওয়া যায় নাই। তাই দেখি সে যুগের জাতি-প্রতিনিধি নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-সমাজের পরিধিচক্র ভেদ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান পাইয়া এইখানেই মজিলেন, জগৎ ভুলিলেন—মরিয়া নূতন হইলেন। শ্রীবিবেকানন্দ-রূপে তাঁর কণ্ঠে যে সিদ্ধবাণী নির্গত হইল, তাহা প্রাণকে শুধু আশা ও উত্তেজনার নেশায় উদ্বুদ্ধ করিল না, বলির দান করিল; তারপর অসংখ্য প্রাণ উৎসর্গের আগুনে ঝাঁপ দিয়া দেশে যে অগ্নিপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা ধারাবাহিকরূপে সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি।

দক্ষিণেশ্বরেই প্রাণের উৎসর্গ আরম্ভ হইয়াছে। ঈশ্বর-প্রেরণার স্পর্শে প্রাণকে দীক্ষা দিবার এই সনাতন বিধি এভাবে বিগত চারি শত বৎসর বাংলায় আর দেখা দেয় নাই। নবদ্বীপচন্দ্রের

আত্মত্যাগের পর, বাঙ্গালী বৈরাগ্যের মূর্ত্তি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত; কিন্তু ইহা নবজীবনলাভের পথে অনিবার্য্য নীতি, ইহা মনে করিতেও শিহরিয়া উঠিত। আজিও একদল লোক ভারতের সনাতনতত্ত্ব-প্রচারে উন্মুখ, কিন্তু প্রাণের অসংখ্য সংস্কার দূর করিতে হইলে যে ত্যাগ ও তপস্যার প্রয়োজন, তাহার সাধনে অগ্রসব হইতে সম্মত নহেন; বরং ইহা অন্ধ সংস্কার, এই বলিয়া আত্মমাহাত্ম্য রাখিবার জন্য ভাবের ঘরে চুরি করেন। দক্ষিণেশ্বরে আত্মদানের উলঙ্গ সাধনা যে ভাবে সিদ্ধ হইলে সাধারণের চক্ষুঃ এড়াইতে না পারে, এমন ভাবেই সাধিত হইয়াছিল; অথচ ইহার মূলে লোকদেখান ভাব ত থাকেই নাই ও জাতিরক্ষার উদ্দেশ্য লক্ষ্যে রাখিয়াও উহা অনুষ্ঠিত হয় নাই—ভগবৎ-প্রেরণা ধর্ম্মস্থাপন করিবার জন্যই মানবাধারকে আশ্রয় কবিয়া স্বতঃ-স্ফুরিত অদ্ভুত লীলা প্রকটিত করিযাছিল। ইহা মানবকল্পনা-দুষ্ট নয় বলিয়া প্রত্যক্ষ ভাগবত কর্ম্ম-রূপেই জাতির মৌলিক প্রাণে সাড়া তুলিয়াছিল এবং এই অনাহত প্রভাব চিরদিন নিরবচ্ছিন্ন স্রোতে প্রবহমাণ থাকিবে।

ভারতের প্রাণ কেন জাগিবে? ভগবানের উদ্দেশ্য ভিন্ন এ জাতি বাঁচিতে চাহে না। ভগবানই ভারতের ভোগ, ভারতের ঐশ্বর্য্য। হিন্দুজাতি এই অমৃতের অধিকারী হইবার জন্যই জীবন ধারণ করিতে চাহে; ইহা ভিন্ন অন্য আদর্শ জগতের যতই লোভনীয় ও হিতকর হউক, ভারতের প্রাণ তাহা নগণ্য বোধেই ত্যাগ করিয়াছে। এ দেশের মানুষ অপরা প্রকৃতি চাহে নাই, শুধু দেশের স্থুল জড় সম্পদের বৃদ্ধি ও বাহিরের মর্য্যাদা-গৌরব বুঝে নাই, শুধু লৌকিক রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া, আসমুদ্র ধরাতল নিজের শাসনাধীনে আনিয়া আত্মভোগের কামনা রাখে নাই—সে প্রেরণা যদি ভারতের

থাকিত, তাহা হইলে কোটী-কোটী নরনারী আজ ভিক্ষুকের মত পরমুখাপেক্ষী কেন? ভারতের মৃত্তিকাগর্ভে ধাতুদ্রব্যের অভাব ছিল না, আজিও নাই; ভারতের শত কোটী ভুজ চিরদিন দারুণ পক্ষাঘাতে অবশ শক্তিহীন হয় নাই; ভারতের কোষাগারে ধনরত্নের অভাব ছিল না; অস্ত্রাগারও চিরদিনই তার শূন্য নয়। অনৈক্য ও ঔদাসীন্য অধঃপতনের চিহ্ন হইতে পারে, কিন্তু ইহার মূলের সত্যকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। কেন এই অনৈক্য, ঔদাসীন্য, পরশ্রীকাতরতা? ভগবানের কল্যাণময়ী ইচ্ছা ভারতকে কেন পঙ্গু করিল? পাপ কি ভারতের একচেটিয়া বস্তু, বিশ্বাসঘাতকতার বিষে কেবল ভারতই কি জর্জ্জরিত? পৃথিবীব অন্য সকল দেশ কি সত্য ও পুণ্যের জন্মভূমি—দ্বেষ-হিংসার ছুরি কি নৈশ অন্ধকারে আর কোথাও ঝিলিক দিয়া উঠে নাই? কে অস্বীকার করিবে—জগতের অপরাপর দেশের তুলনায়, ভারত অধিক অপরাধী, অধিক পাপাচ্ছন্ন নয়! তবে কেন সে একা নিদারুণ প্রায়শ্চিত্তের ভার বহন করিবে? কল্পনাপ্রিয় জাতি ঈশ্বরেচ্ছাব সূত্র-হারা, বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্ট, অথচ ভাগ্যপরিবর্ত্তনে অসহায়! মীর্জ্জাফর-রাজবল্লভের জাতির ইহা সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত বোধে যাহারা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত বাঁচিবার সান্ত্বনা চায়, তাহাদের আজ ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া দেখা উচিত—সব দেশেই মীর্জ্জাফর আছে, সব দেশেই বিশ্বাস-ঘাতকের ছুরি আত্মঘাতী হওয়ার জন্য উদ্যত হইয়াছে; তবুও সে সব জাতি টিকিয়া আছে, নিজের দেশে তারা পরবাসী বা পরমুখাপেক্ষী নয়, তাদের জাতীয়তার গর্ব্ব মৃত্তিকায় মলিন হয় নাই।

আমাদের দেশেই বুদ্ধ রাজ-সিংহাসন ছাড়িয়া চীর-কৌপীন পরিধান করিয়া ভিখারীর বেশে জাতিকে জগতের বাঁধন টুটাইতে

ডাক দিয়াছিলেন; আমাদের দেশেই সম্রাটের আসনে রসিয়া মহারাজ অশোক ধর্ম্মের জন্য মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন, অস্ত্রাগার রুদ্ধ রাখিয়া ধর্ম্মের বলে পৃথিবী-জয়ের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—আজও ভারতে লক্ষ-লক্ষ সন্ন্যাসী একনিষ্ঠচিত্তে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে জাতিকে টানিয়া লইতে চাহে সেই পথে, যে পথের শেষ না পাইয়া ভারতের চক্ষে ভোগ ও অধিকারের অনির্ব্বাণ আগুন এখনও জ্বলিয়া উঠে নাই। এই এক মহাভিযানে ক্লান্তচরণ ভারতের হিন্দুজাতি যেদিন বিশ্রামের শয়ন গ্রহণ করিয়াছে, সেইদিনই মরণের লৌহশৃঙ্খল তাহার কাণে বিকট শব্দে ঝন্-ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিয়াছে, মৃত্যুর তুষারশীতল আলিঙ্গনে সে শিহরিয়া উঠিয়াছে। বাঁচিবার জন্যই আবার আকাশে উড়িয়াছে গৈরিকের নিশান। কত শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য যুগে-যুগে বাঁচার প্রেরণা জাগাইল—কে তাহার ইয়ত্তা রাখে? বাঁচার উদ্দেশ্য এই মহাবৈরাগ্যের অগ্নিগর্ভেই যে লুকাইয়া আছে! সে উদ্দেশ্যের উদ্ধার না হইলে, এ জাতিকে বাঁচাইবে কে? কি দিয়া? স্বাধীনতার স্বপ্নে ক্ষণিক উন্মাদনা প্রাণরক্ষার অমৃত নহে। যে ভারতের ঐশ্বর্য্যে প্রলুব্ধ জগজ্জাতি গভীর ষড়যন্ত্রে শান্তিহীন, ভারত সে বিপুল ঐশ্বর্য্যে এমন আস্থাহীন হইল কেন—ইহা কি তলাইয়া দেখার বস্তু নয়? ঐতিহাসিক বিজিত ভারতের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া স্তম্ভিত হয়—বিনা বাধায় এত বড় জাতিটা স্বাধীনতা হারাইয়াছিল কেমন করিয়া? কেমন করিয়াই বা তাহারা আপনার ধন পরের হাতে এমন নিঃশব্দে হাসি-মুখে উঠাইয়া দিল? এই দিক্ দিয়া দেখিলে, শুধু মীর্জ্জাফরই তো দেশদ্রোহী নয়, প্রত্যক্ষে-অপ্রত্যক্ষে সমগ্র জাতিই দেশদ্রোহী। বিদেশীর শাসনগ্রন্থি দৃঢ় করিয়া তুলিতে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের

মধ্যে কয়জন ছিলেন, যাঁহারা সাহায্য করেন নাই? কয় জনের প্রাচীন পুরুষেরা এই পথে অন্তরায় হইয়া আত্মপ্রাণবলি দিয়াছেন? যেখানে বিরোধের ইতিহাস দেখ, সেখানে জাতি এই দেশের মমতায় আত্মদানের যজ্ঞশালা গড়ে নাই, স্ব-স্বার্থসংরক্ষণে খণ্ড-খণ্ডভাবে আত্মরক্ষার ব্যর্থ প্রয়াস ভিন্ন উহা অন্য কিছু নহে।

আজ দুঃখের কষাঘাতে প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আবরণে সনাতনজ্ঞানহারা দেশের মনীষিবর্গ ভারতের প্রাণতন্ত্রে যে ব্যথার রাগিণী নিরন্তর ঝঙ্কার তুলিতেছে, তাহা আর কর্ণগোচর করেন না। একান্ত ভারতীয় ভাবের দ্যোতনায় প্রাণ ঢালিয়া কেহ কি এ জাতির মর্ম্মকথা কাণ পাতিয়া শুনিবার ধৈর্য্য রাখিয়াছেন? আসিয়াছে পাশ্চাত্ত্যের মহাপ্লাবন, চুবান খাইয়া আত্মহারা জাতি কেবলই খেয়াল দেখিতেছে, যে মদিরায় প্রতীচ্যের বীরজাতিরা নিমগ্ন, তাহার মোহ আমাদেরও পাগল করিয়াছে। ব্যর্থতা পদে-পদে আসিলে কি হইবে, প্রাণকে উত্তেজিত রাখার উগ্র ঔষধ-গলাধঃকরণে আপত্তি থাকিলে মাংস ফুঁড়িয়া দিবার ব্যবস্থা আছে, রক্তের ক্ষীণ স্রোতঃ যতক্ষণ বহিবে, বিরাম নাই—তোমায় বিজাতীয় স্বপ্নে ভোর হইয়া থাকিতেই হইবে। ভারতের সত্তা বিজাতীয় আদর্শের চারিধারে ঘুরিয়া কেবলই হাহাকার করে, কে তাহার অন্তরের নিবেদনে কর্ণপাত করিবে?

নেশার ঘোরে উন্মার্গ কর্ণ অকস্মাৎ একদিন শুনিল—কোথা হইতে সঙ্গীতের সুরের মত নূতন প্রার্থনা বাতাসে ভাসিয়া আসিল—"এই নে তোর জ্ঞান, এই নে তোর অজ্ঞান; এই নে তোর ধর্ম্ম, এই নে তোর অধর্ম্ম; এই নে তোর ভাল, এই নে তোর মন্দ; এই নে তোর পাপ, এই নে তোর পুণ্য; এই নে তোর যশঃ,
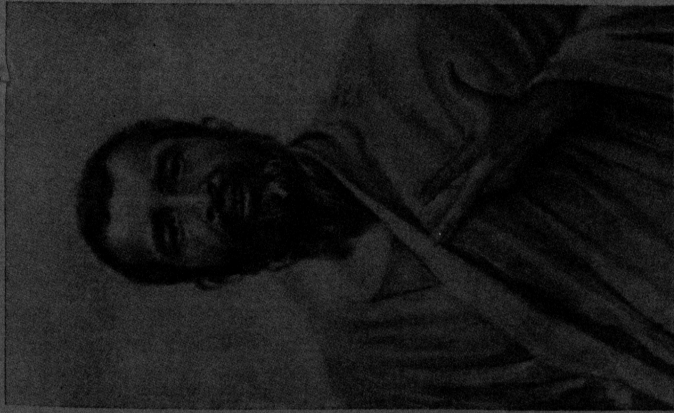
শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ ॥ ১৮৩৩-১৮৮৬
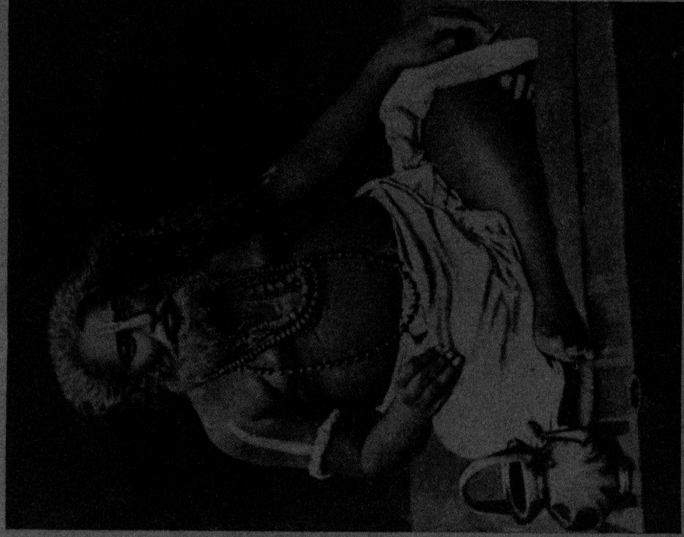
আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ॥ ১৮৪১-১৮৯৯

এই নে তোর অযশঃ -আমায় শ্রীচরণে শুদ্ধা ভক্তি দে—দেখা দে।"

কি মর্ম্মান্তিক মর্ম্মবাণী! বঙ্কিমচন্দ্র শুধু ভাবে দেখিয়াছিলেন—লোকালয়-শূন্য গভীর অরণ্যানী, সে অরণ্যে আর আলোকপ্রবেশের স্থান নাই, মানুষ নাই, আছে শ্বাপদ হিংস্রক পশু, দিনমানের মধ্যাহ্নেও যে বনে প্রবেশ করিতে আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠে—কে সেখানে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে—"আমার মনোবাঞ্ছা কি পূর্ণ হইবে না?" এমন আকুল প্রার্থনা যার কণ্ঠে বাণীরূপে বাঙ্কিব হইতেছিল, তাব আর কিছু বুঝি ছিল না, সব আহুতি দিয়া শুধু প্রাণে এই আর্ত্তনাদটুকু দেবতার চরণে উৎসর্গ করিতে কাতরকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিতেছে—"ওগো প্রভু, আমার মনোবাঞ্ছা কি পূর্ণ হইবে না?" দেবতা এই ডাকার মত ডাক শুনিয়া সাড়া দিলেন—"কি দিবে?" বাকী যা' ছিল, তাহাই অর্ঘ্য-স্বরূপ উদ্যত করিয়া প্রার্থী আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বলিল—"দিবার আর কি আছে? প্রাণ!" দৈববাণী হাসিয়া উত্তর দিল—"প্রাণ তো সবাই দেয়, আর কি আছে!" আর তো কিছু নাই, জাতির প্রাণবলি দিয়াও অভীষ্টপূরণ কি হইবে না? ঠাকুরই জানাইয়া দিলেন "চাই ভক্তি।"

বঙ্কিম লিখিয়া দায়মুক্ত হইলেন। বাঙ্গালী ভক্তির সন্ধানে বাহির হইতে সাহস করিল না—সেখানে প্রাণের চেয়েও বড় বস্তু দিবার আছে। আপনি আচার করিয়া জগৎ শিখাইবার যিনি, তিনিই আসিলেন—বাঙ্গালীকে ভক্তি দিতে। বল দেখি—কি অহেতুকী করুণা!

কে ইহা তলাইয়া বুঝিল! এই বিশুদ্ধ ভক্তির জন্য ছাড়িতে হইবে সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ। সবই যে মিশ্রিত

বস্তু হইয়া জীবনকে বিপন্ন করে, তাই নিঃসঙ্গ হইয়া ভগবান্ রামকৃষ্ণ চাহিয়াছিলেন—ইষ্ট-যুক্তি ও পরাভক্তি। ভারতের সত্য চাওয়ার দীর্ঘপ্রতীক্ষমান শীর্ণ মূর্ত্তি অকস্মাৎ প্রাপ্তির আশায় উজ্জ্বল হইয়া বাঙ্গালীর প্রাণে সাড়া তুলিল—ইহা নব চেতনারই সাড়া।

সে যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত, যৌবনের জোয়ারে বিপন্ন তরুণ বাঙ্গালী কিরূপ নিরাশ হয়, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তপ্ত ঈশ্বর-বাণী সাময়িক ভাবে হৃদয়ে মধুর উত্তেজনার সৃষ্টি করে; কিন্তু চরম সান্ত্বনা দেয় না। ক্ষয়ে, অপচয়ে, ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি আল্‌গা হইয়া যাওয়ায়, বাঙ্গালী উৎসন্নের পথে বস্তুতঃ কোন সাহায্যই পাইতেছিল না। ঠাকুরের মুখেই ভরসার কথা প্রথম কাণে পৌঁছিল, হতাশ-শুষ্ক হৃদয় উৎসাহে-উল্লাসে জাগিয়া উঠিল, ঠাকুর বলিলেন "এখন যৌবনের বন্যা এসেছে। তাই বাঁধ দিতে পারছিস্-না। বান যখন আসে, তখন কি আর বাঁধ-টাঁধ মানে?......... কলিতে মনের পাপ, পাপ নয়......একবার-আধবার কখনও কুভাব এসে পড়ে তো, কেন এল বলে' ভাবা কেন? ......ওসব শৌচ-প্রস্রাবের মত......শৌচপ্রস্রাবের চেষ্টা হয়েছিল বলে' কি মাথায় হাত দিয়ে কেউ ভাবতে বসে?" কেশবের অনুতাপমন্ত্রে, পাপভারে বোঝাই জীবনতরী বানচাল হইতে রক্ষার উপায় পাইত না। এই সময়ে এই আশার কথাটা অমৃতের মত উপাদেয় বোধ হইল। তিনি শুধু ভরসা দিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, ঔষধেরও ব্যবস্থা করিলেন, "ঐ ভাবগুলি অতি সামান্য, তুচ্ছ, হেয় জ্ঞান করবি—মনে আর আনবি না—খুব প্রার্থনা করবি, হরিনাম করবি—তাঁর কথাই ভাববি। ও-ভাবগুলি এল কি গেল, সেদিকে নজর দিবি না—ওগুলা ক্রমে-ক্রমে বাঁধ মানবে।" কি বৈদ্যুতিক সান্ত্বনার বাণী!

যে মহাপাপ শত অনুতাপের আগুনে ছাই হয় নাই, করুণার অমৃতরসে তাহা দ্রব হইয়া গেল। সনাতন হিন্দুধর্ম্মী রক্ষণশীল যাঁহারা, তাঁহাদের প্রয়োজন ফুরাইল; ভাঙ্গা জাতির জীবন নব সংস্কারে সুগঠিত করার সংস্কারক দলেরও কার্য্য শেষ হইল।

জীবনের গ্লানি ক্রমে-ক্রমে দূর করার সুযুক্তি পাইয়া, নব্যবঙ্গ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। স্বভাবের অনিবার্য্য নিয়ম হইতে মুক্তি পাওয়ার কঠোর বিধি যেন সহজ হইয়া আসিল। ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে, এই নিত্য ব্যথার কথাটা এমন করিয়া শুনিতে পাওয়া সে যুগে সম্ভবপর ছিল না—এত ছোট কথা কে আর কহিবে? কিন্তু ঠাকুর খুঁটিনাটী জীবনের ভঙ্গীগুলি ধরিয়া, অধ্যাত্মজীবনগঠনের যে সুনীতি প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা ভবব্যাধি হইতে মুক্তির 'প্যানেসিয়া' হইয়া উঠিল—দক্ষিণেশ্বরে মেলা বসিল—দলে-দলে নারীপুরুষের গমনাগমনে, মহাতীর্থ মুখরিত হইয়া উঠিল।

তখন জীবনের রসে ভাগবত আরাধনার সহজ নীতি দুষ্প্রাপ্য ছিল। অক্ষর, অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বরের আরাধনায় শান্তরসের উদয় হইত, হৃদয়ে তৃপ্তি মিলিত না। তুরীয় আস্বাদের ক্ষীণ আভাসে চক্ষে একবিন্দু অশ্রু দেখা দিয়াই সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইত। ঠাকুর ভগবান্‌কে জীবনময় করিলেন—সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি পঞ্চ-রসের উপাসনাকে নব প্রাণ দিয়া, সাধকের প্রাণে নূতন হিল্লোল তুলিলেন। ঈশ্বরদর্শনের পর, জীবাধার শাস্ত্রানুযায়ী সাধনে ও সর্ব্ব-ধর্ম্মের সমন্বয়ে সিদ্ধ করিতে তিনি দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ নিয়মিত ভাবে সাধনা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে, সাধনার সিদ্ধ নীতিটুকুই তিনি দিয়া গেলেন। জাতির অধ্যাত্মজীবনপথ আজ তাই এমন সুগম হইয়াছে। তিনি ছয় মাস অদ্বৈতভাবে পূর্ণরূপে অবস্থিত

থাকিয়াও, বহুজনহিতের জন্য, লোকশিক্ষার জন্য, জাতির সুমহৎ ভবিষ্যৎ-সৃষ্টির জন্য জীবনের রাজ্যেই ফিরিয়াছিলেন। গিরিশের কর্ণে বকল্‌মার সিদ্ধ মন্ত্র দিয়া, জাতিকে আত্মসমর্পণমন্ত্রে দীক্ষা দিবার অমোঘ বিধান তিনিই প্রবর্ত্তন করিলেন।

কে তখন গীতার আত্মসমর্পণযোগ বুঝিয়াছিল—কে তখন "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" মন্ত্রের মর্ম্মকথা এমন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল? ঠাকুরের সাদা কথাগুলি স্মরণের মাঝে আজিও কি পূত দৃশ্যের অবতারণা করে. তাহা তোমরা অন্তরের দিকে চাহিয়া একবার দেখিবে কি? সেই তোমারই মত মানবের আধার লইয়া, ভক্ত্যুচ্ছ্বসিত, ছল-ছল বিস্ফারিত চক্ষে ইষ্টমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া, অঞ্জলি-অঞ্জলি হৃদয়ের সকল প্রকার বাসনা-কামনা পরিত্যাগ করার বৈরাগ্যপ্রদীপ্ত মূর্ত্তি, আত্মসমর্পণের দিব্যবিগ্রহ—বাঙ্গালী, সে শান্ত, উজ্জ্বল, ভাগবতপুরুষের চরণে অর্ঘ্যস্বরূপ হৃদয় ডালি দিয়া ধন্য হইবে কি?

ভারতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য শুধুই যে পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্মের বোঝা সরাইতে হইল তাহা নহে; এমন মহাত্যাগ আর জগতে হইবে না। ভারতের যে কালান্তবাহী সাধনসংস্কার, তাহাও গ্রাস করিতে হইল—ইহা বোধ হয় কল্পনায়ও কেহ আনিবে না। যে সমাধি অধ্যাত্মরাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পৎ—প্রতি ভূমির আধ্যাত্মিক অপূর্ব্ব দর্শনলাভের সঙ্গে তিনি বেদান্তের সপ্তভূমিতে আরোহণ করিয়া যে নির্ব্বিকল্প সমাধি পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি বহুজনের কল্যাণে ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"সমাধির চেয়ে বড় জিনিষ—ত্যাগ, বিশ্বাস আর মনের বল।" জাতির প্রতি একি কম করুণার কথা! দুর্ব্বল, বিপন্ন জাতির পুনরুদ্ধারের সত্য

প্রয়োজনটী এমন করিয়া অভ্রান্ত অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখাইয়া দিয়াই তিনি নিশ্চেষ্ট হন নাই, অভেদাত্ম শ্রেষ্ঠ শিষ্যের এ পথ আমৃত্যু রুদ্ধ রাখিয়া জাতির মধ্যে তাঁহার বিজয়ীশক্তি সঞ্চার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—আজ বাঙ্গালীর চরিত্রে যেটুকু ত্যাগ, বিশ্বাস ও শক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়, ঠাকুরের অমর দানই যে ইহার মূলতত্ত্ব, তাহা আর কে অস্বীকার করিবে!

ঠাকুরের বহুমুখী সাধনার কথা আলোচনা করার স্পর্দ্ধা আমাদের নাই, আর সে ক্ষেত্রও ইহা নহে—ভক্তের শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবতার চরণে সহজ ভাষায় অর্পণ করার এ-প্রচেষ্টা অস্ফুট বন্দনা-সঙ্গীত ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাপুরুষ বিশুদ্ধ বুদ্ধির মধ্যে শ্রীভগবানের অনুভূতি-স্পর্শলাভের সাধনায় অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়াছিলেন। সে যুগে কুসংস্কারে ও অজ্ঞানের অন্ধকারে, দেশের হৃদয়-মন আচ্ছন্ন হইয়া পড়ায়, সত্য সামগ্রী অবিকৃতভাবে জীবন দিয়া গ্রহণের অধিকার হারাইয়াছিল। শুদ্ধ জ্ঞানালোক প্রজ্জ্বলিত করিতে গিয়া, জাতির অশুদ্ধ আধারে আশ্রিত ভাল-মন্দ সব কিছুরই বিসর্জ্জন অনিবার্য্য হইয়াছিল; তাই, নব-যুগারম্ভে, একটা নেতিমূলক নীতিকেই অধিক প্রশ্রয় দিতে দেখি। হিন্দুর আচরিত সকল অনুষ্ঠানের অন্ধকার দিক্‌টা দেখাইয়া, খৃষ্টান মিশনারীদের মত জাতির প্রাচীন আচারপদ্ধতির উপর বিরাগসৃষ্টির আয়োজন ধর্ম্মসংস্কারকদিগের প্রধান কর্ত্তব্যরূপে বিবেচিত হইত—তখন ইহার প্রয়োজন ছিল। জাতির হৃদয়ে সত্যহীন নির্জ্জীব আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের আড়ম্বর এমনভাবে জাঁকিয়া বসিয়াছিল যে, সেখানে অধ্যাত্মসাধনার সূক্ষ্মানুভূতিটুকু লাভ করার আর পরিসর

ছিল না ; কাজেই পুরাতন সমাজ ও ধর্ম্মসাধনার উপর হইতে আবর্জ্জনাস্তূপ সরাইতে গিয়া, ধর্ম্মের মূল ভিত্তি ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ হইয়াছিল।

সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বরতত্ত্বের সামঞ্জস্যবিধানের ব্যবস্থা না হওয়ায়, হিন্দুধর্ম্মে ভাগবত সাধনার যে উদার সার্ব্বজনীন নীতি আছে, জ্ঞানে-অজ্ঞানে তাহার সূত্র হারাইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। আত্মার উলঙ্গ সত্যটাকে আবিষ্কার করার যুগে এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু ঈশ্বরানুরাগের অনুভূতি পাওয়া মাত্র কেশবের হৃদয়পদ্ম বিকশিত হইল। সে মকরন্দলোভে বিশ্বের যাবতীয় ধর্ম্মানুভূতি মধুকরের মত ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়িয়া আসিতে লাগিল। মৃগনাভি-গন্ধে মত্ত হরিণের মতই কেশব উন্মাদ হইলেন, ধর্ম্মের বিচিত্র আস্বাদে তাঁহার হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিল। কখন তিনি দুর্গার উপাসনায় বিভোর হইলেন, কখন-বা মহম্মদের ধর্ম্মবিশ্বাসের ধ্বজা ধরিয়া, সঙ্কীর্ণ হিন্দুসমাজের প্রাণে আতঙ্ক সৃষ্টি করিলেন ; আবার বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতি মহাপুরুষের প্রভাব-লাভে, ত্যাগবৈরাগ্যের দীপ্ত মূর্ত্তিতে গৈরিক বসন পরিধান করিয়া, স্বীয় পরিবারমণ্ডলীর মধ্যেই করপুটভিক্ষায় অতীত যুগের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। নবদ্বীপ-চন্দ্রের অহেতুক রাগাত্মিকা ভক্তির পরশে তিনি মৃদঙ্গ বাজাইয়া কীর্ত্তন করিলেন, পবিত্র ও সংযমী আচার্য্যগণের চরণ বন্দনা করিয়া অতীত ভারত যে অবতারবাদের দৃঢ় ভিত্তি রচনা করিয়াছিল, তাহার অনুষ্ঠানটুকুও কেশবের জীবনসাধনায় বাদ পড়িল না, যুগধর্ম্মের জন্য তুরীয় ঈশ্বরতত্ত্ব যে ঘনীভূত আকারে রূপায়তনে ধরা দেন, এ রহস্য তাঁহার নিকট অবিদিত রহিল না। ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে কেশবের এইরূপ অত্যদ্ভুত আচরণে, তাঁহার সহতীর্থেরা চমৎকৃত

হইয়াছিলেন ; কিন্তু কেশবের জীবনে যে সময়ে ভারতের ও ভারতের অসংখ্য প্রকার ধর্ম্মসাধনার অনুভূতি আভাসে খেলিয়া যাইতেছিল, ঠাকুর সেই সময়ে এই সকল সাধনার মূল বীজ লইয়া আত্মজীবনে সংহরণ করিতেছিলেন। যুগধর্ম্মের জন্য কেশবকে যে শক্তি আশ্রয় করিয়াছিল, ঠাকুর সে শক্তির মহাবিগ্রহমূর্ত্তি।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বাণী রাসমণির মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কিছু-দিন পরেই, ঠাকুর কালীমন্দিরের পৌরোহিত্য গ্রহণ করেন। সে সময়ে, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে ; এবং এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে অতীতের প্রতি মমতাপরায়ণ হইয়াই গোঁড়া হিন্দুদল খণ্ডভাবে ইহার প্রতিকারসাধনে উদ্যত হইয়াছে ; তখন ঠাকুর এই বিরোধের যে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধান করিলেন, তাহার উপর আর কাহারও কথা বলিবার কিছু থাকিল না। শশধর তর্কচূড়ামণি শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া যে প্রেরণার বেগ সামলাইতে সমর্থ হইতেছিলেন না, ঠাকুরের কণ্ঠে প্রাণভরা 'মা-মা' ডাকে তাহা সিদ্ধ হইল—ইহা মনুষ্যের শক্তিতে সম্ভবপর, তাহা কল্পনাও করা যায় না।

ঠাকুর একনিষ্ঠ পূজায় আত্মদান করিয়া, পাষাণের মধ্যে যেদিন চৈতন্যময়ী মহাশক্তির দর্শন পাইলেন, সেইদিন হইতেই তাঁহার সাধনার আরম্ভ—তাঁহার কথা "ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত লইল, কোথাও যেন আর কিছুই নাই! আর দেখিতেছি কি? এক অসীম, অনন্ত, চেতন জ্যোতিঃসমুদ্র! ...." সাধনার কোটায় এই সব বিচিত্র দর্শনের কথা সে যুগে তাঁর মুখেই প্রথম বাহির হইল। তিনি দেখিলেন ত্রিকোণ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মযোনি, শ্রবণ করিলেন অনাহত বিচিত্র ধ্বনি—গঙ্গাগর্ভ হইতে অপরূপ-

রূপসম্পন্না যুবতী-রূপে মহামায়া চক্ষের সমক্ষেই দেখাইলেন—সন্তান প্রসব করিয়া আবার তাহা লেলিহান রসনাবিস্তারে গ্রাস করিতেছেন। ঠাকুর উন্মাদ হইয়া উঠিলেন, সে রোগ ভবরোগ নয়, চিকিৎসায় আরাম হইবে কেন? পরিশেষে ব্রাহ্মণীবেশে সাধনশক্তি যথানিয়মে ঠাকুরকে সাধনার ক্রম পার করিয়া দিলেন। সে মহাবেদ-রচনার ভাষা নাই। বাঙ্গালী, সাড়ে তিন হাত মানব আধারে কি অসাধারণ তপস্যা জাগ্রৎ বেশে জাতিকে ধর্ম্মসম্পদে সম্রাট্ করিয়াছে, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিও!

ঠাকুর তো বাকী রাখিলেন না কিছু! চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সাধনা শেষ করিলেন, আম-মাংসের আস্বাদ লইয়া ঘৃণার বন্ধন ঘুচাইলেন, ষোড়শী যুবতীকে কোলে লইয়া কাম জয় করিলেন,—বলিব কত? মানবজীবনের যত কিছু জটিল সমস্যা, একে-একে সব সমাধান করিলেন, তারপর রাগানুগা ভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন—পুরুষ হইয়া প্রকৃতির সাধনায়—ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া বক্তব্য দীর্ঘ করিব না। প্রস্তরময়ী মাতৃমূর্ত্তির চরণতলে আত্মবিক্রয় করিয়া তিনি ভারতের শাস্ত্র জীবনে ফলাইলেন, সাধনার চরম করিয়া পরিশেষে বেদান্তের সিদ্ধ মূর্ত্তি তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন—ভবিষ্য জাতির যে অধ্যাত্মভিত্তি তাহা ঠাকুরের করুণায় সিদ্ধ হইল। এ জাতির আর কি সাধনা আছে? সাধনার প্রবৃত্তি অহমিকার নামান্তর! জীবনের ভাব ঐ দক্ষিণেশ্বরের ধূলি-রেণুর উপর নামাইয়া দাও, দেখ তুমি সিদ্ধ কর্ম্মী—তুমি অলস্ত, স্থির বুদ্ধির অধিকারী—ভবিষ্য ভারত সাধনার ঘুরপাকে চুবান খাইবে না।

শুধু হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানই যে ঠাকুর জীবন দিয়া আচরণ করিয়া সিদ্ধ হইলেন, তাহা নহে; ভারতের কঠিন সমস্যা, হিন্দু-

মুসলমানের ধর্ম্মবিরোধ—কেন জানি না, ঠাকুর সুফী গোবিন্দের নিকট মোস্‌লেম মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া আল্লার পবিত্র নামের মর্য্যাদা রাখিলেন, তিনদিন তিনি যথানিয়মে নমাজ পড়িয়াছিলেন, মুসলমানের খাদ্য ভোজন করিয়াছিলেন, ঠাকুর হিন্দুজাতির তবুও তো কোন্‌টিনূর! আজ ভারতে ধর্ম্মের বিরোধ কেন? ধর্ম্মের প্রাচীর দুর্লঙ্ঘ্য করিয়া রাখার প্রয়োজন কি? দক্ষিণেশ্বরের মহিমা এ জাতি যেদিন উপলব্ধি করিতে পারিবে, সেদিন ধর্ম্মের দেউল ভাঙ্গিয়া সমতল হইয়া যাইবে, ভারতে এক জাতি, এক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইবে। দক্ষিণেশ্বরে তাহার সূচনা হইয়াছে, ইহা ফলপ্রসূ করার ভার ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিতেছে।

শিক্ষিত সমাজে গুরুবাদের উপর একটা অকারণ অশ্রদ্ধার ভাব দেখা যায়; অবশ্য গুরুকরণ যাহার-তাহার ভাগ্যে ঘটে না, সংস্কারক্ষয়ের মত ইহা লৌকিক আচার নহে। উচ্চ অধ্যাত্মভূমিতে আরোহণ করিতে হইলে, ইহার অনিবার্য্য প্রয়োজন আছে। এই গুরুশক্তির ঘনীভূত রূপই দিব্য জীবনের ভিত্তি। ঠাকুর এই গুরুবাদের রহস্যোদ্‌ঘাটনের প্রসঙ্গে, পর-মনের (super-mind) সংবাদ দিয়াছেন—যে মনের ক্ষেত্রে পৌঁছিলে জাতি দিব্য হইবে, তাহার সঙ্কেত দিতে গিয়া বলিয়াছেন "গুরুভাবটী শ্রীশ্রীজগন্মাতার শক্তিবিশেষ ও সেই শক্তি সকল মানব মাত্রেই সুপ্ত বা ব্যক্তভাবে নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই, গুরুভক্তিপরায়ণ সাধক শেষে এমন এক অবস্থায় উপনীত হন যে, তখন ঐ শক্তি তাঁহার নিজের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া ধর্ম্মের জটিল নিগূঢ় তত্ত্বসকল তাহাকে বুঝাইয়া দিতে থাকে।

"শেষে মনই গুরু হয়, গুরুর কাজ করে—মানুষ-গুরু মন্ত্র দেন কাণে আর জগদ্‌-গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে। কিন্তু সে মন আর এ মনে

অনেক প্রভেদ। সে সময়ে মন শুদ্ধসত্ত্ব ও পবিত্র হইয়া, ঈশ্বরের উর্দ্ধশক্তিপ্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ হয়, আর এ সময়ে মন ঈশ্বর হইতে বিমুখ হইয়া ভোগসুখ ও কামক্রোধাদিতেই মাতিয়া থাকিতে চায়।" সোজা কথায়, মানুষকে সে মনের কোটায় উঠাইয়া দিবার এমন সঙ্কেত আর কোথাও দেখা গেল না।

ঠাকুর ভবিষ্য জাতির সাধনপন্থার অব্যর্থ নির্দ্দেশ দিয়াছেন, কিন্তু সে পথে চলিবে কে? আমাদের কি মোহভঙ্গ হইয়াছে? জড়জীবনের ভোগে ক্লান্ত হইয়া আমরা মানস ভোগের যাদুঘরে বন্দী হইয়াছি— তিনি নিজের জীবনে যে ভঙ্গী দেখাইয়াছেন, এক যুগ যদি সে ভঙ্গীর সাধনা করে, এবং ঠাকুরের সিদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে, তবেই এদেশ বাঁচিবে, মুক্তির সন্ধান পাইবে। তিনি বলিয়াছেন— "বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্যরক্ষার বিধি যেদিন হইতে নষ্ট হইয়াছে, ভারতের অধঃপতনের আরম্ভ তখন হইতেই সুরু হইয়াছে।" এই কথার মধ্যে, সাধনতৎপর নারীপুরুষের মধ্যে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যবিধানের যে অটল সঙ্কেত দিয়াছেন, তাহা কি আমরা পালন করিব না? ভবিষ্য জাতিকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য, একটা যুগ ঠাকুরের অনুসরণ করিয়া, ভবিষ্যতের প্রাণে অমৃতপ্রবাহ ঢালিয়া দিতে কি আমরা উদ্যত হইব না? আজ আর বাঙ্গালীর সাধনযুগ নাই, ঠাকুরের অমর-সিদ্ধির উত্তরাধিকারী হইয়া আমাদের কণ্ঠে আকুল প্রশ্ন উঠুক— 'ততঃ কিম্'—তাহা হইলেই নবযুগের অমোঘ নির্দ্দেশ আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইবে।

ঠাকুরের সন্ন্যাস, সেও জাতির ভবিষ্যৎনির্ম্মাণের মহাশিক্ষা। জাতির কণ্ঠে এক ঋক্‌ই উচ্চারিত হউক—"চিদাভাস ব্রহ্মস্বরূপ আমি, দারা, পুত্র, সম্পদ্, লোক-মান, সুন্দর শরীরাদিলাভের সমস্ত

বাসনা অগ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক ত্যাগ করিতেছি,—স্বাহা !"

আর এই নির্ব্বিকার চিত্ত লইয়া, ভারতের ঈশ্বরকোটী নারী-পুরুষ উঠ তোমরা, জাগ তোমরা, বহুজনহিতায় তোমাদের পবিত্র জীবনের আহুতিতে নূতন ভারত গড়িয়া উঠুক—বাংলার স্থল, জল আর ব্যোম সুগম্ভীর নিনাদে প্রতিধ্বনি তুলুক—"হরি ওঁ, হরি ওঁ।"

॥ ছয় ॥

একটা আলোকপিণ্ডের মত তারাবাজি আকাশের দিকে ছুটিতে-ছুটিতে সহসা ফুটিয়া বিকীর্ণ আলোক ছড়াইয়া দেয়, রামমোহনের যুগ ঠিক এইরূপ একটা অখণ্ড, কূটস্থ সত্য, কালে শতধা বিভক্ত হইয়া জাতির বিগলিত ধর্ম্মে নূতন শক্তির সঞ্চার করে। কেশবের যুগে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণেশ্বরে ইহার পরিণত মূর্ত্তি দেখা যায়। আর আজ এই বহুমুখী সত্যপ্রেরণাসমূহের সঞ্চারে, অধ্যাত্ম-সম্পদে বাঙ্গালী অন্যান্য প্রদেশের অপেক্ষা সমধিক সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত হইয়াছে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত কেশবের অধ্যাত্ম-পরিচয়ের ফলে, দুইজন মহাপুরুষের আত্মপ্রকাশের পথ মুক্ত হয়—একজন গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যজন বীরকেশরী স্বামী বিবেকানন্দ। বিজয়কৃষ্ণ ধর্ম্মপিপাসায় ব্যাকুল হইয়া সারা ভারতে পরিভ্রমণ করেন। তিনি একসময়ে কেশবের "ভারত আশ্রমের" প্রধান কর্ণধার ছিলেন এবং বিবেকানন্দ সমাজের একজন পরম উৎসাহী ও কীর্ত্তনের দলে গায়ক-প্রধান বলিয়া খ্যাতি পাইয়াছিলেন। ঠাকুরের সংশ্রবে আসিয়া কেশবচন্দ্রের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের পৌরাণিক বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিলে, এই দুইজনই ধীরে-ধীরে ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া বিশাল হিন্দুধর্ম্মের শক্তি বৃদ্ধি করেন। আমরা সর্ব্বাগ্রে গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের স্মৃতি-কীর্ত্তন করিব।

বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যের বংশে অবতীর্ণ হন। বাল্যকাল হইতেই তাঁর সরল ঈশ্বরবিশ্বাস পূর্ব্বপুরুষগণের

ধমনীধারার মধ্য দিয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়াছিল। তিনি বাল্য-কালে গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরকে খেলার সঙ্গী করিবার জন্ম আহ্বান করিতেন। এই পরম আস্তিক্যবুদ্ধি তাঁহার জন্মগত সম্পদ্ ছিল। তা'ছাড়া তিনি বাল্যকাল হইতেই অলৌকিক দর্শন ও শ্রবণ করিবার শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। শান্তিপুরের মহামারীতে তাঁহার সহ-পাঠীদের মধ্যে কেহ-কেহ কালগ্রাসে পতিত হয়। তাহাদের অদর্শনে তিনি শোকার্ত্ত হইয়া পড়েন। কথিত আছে—তিনি মৃত বালকদের কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিতেন। তাঁহার পরিণত বয়সে অসংখ্য অলৌকিক ঘটনার কথা শুনিয়া আমরা তাই বিস্ময়ান্বিত হই না।

বিজয়কৃষ্ণ বংশপ্রথানুগত বাল্যকাল হইতেই নৈষ্ঠিক ভক্তি-সাধনার অনুশীলন করিতেন; কিন্তু সংস্কৃতচর্চ্চা করিবার কালে তিনি বেদান্তে 'অহং ব্রহ্ম' অনুভূতি পাইয়া নৈষ্ঠিক সাধনা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু বেদান্তের এই অহং-বুদ্ধি তাঁহার স্বভাবে খাপ খাইল না। তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু তিনি যে পারিপার্শ্বিকতার ভিতর থাকিতেন, সেখানে ব্রাহ্ম-সমাজের বিরুদ্ধে এমন কুৎসিত অপবাদের প্রচার হইত, যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ না হইয়া আর থাকা যায় না। প্রত্যুত বিধাতার অব্যর্থ বিধানে অবশেষে ঘটনাচক্রে তিনি বগুড়ায় কিশোরী-লাল রায়ের ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব বুঝিলেন, এবং তৎপরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কণ্ঠে ঈশ্বর-বিষয়ক মধুর উপদেশে তাঁহার হৃদয় দ্রব হইল। তিনি ব্রাহ্ম হইলেন।

বিজয়কৃষ্ণ যাহা প্রত্যয় করিতেন, তাহাতেই প্রাণ ঢালিয়া দিতেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের সাম্যবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি ব্রাহ্মণের উপবীত

রাখা কপটতা মনে করিলেন। এ বিষয়ে মহর্ষির নিকট জিজ্ঞাসা করায়, তিনি সদুত্তর পাইলেন না, মহর্ষি তখনও উপবীত পরিত্যাগ করেন নাই, সমাজের আচার্য্যেরা সকলেই প্রায় উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ অন্তরে সান্ত্বনা না পাইয়া, স্বয়ং উপবীত ছাড়িয়া দিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজে এই উপবীত লইয়া প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করিলেন। কেশবচন্দ্র অনুকূলে থাকায়, আন্দোলন প্রবল মূর্ত্তি ধরিল; কিন্তু উপবীত ত্যাগ করায়, বিজয়কৃষ্ণের উপর শান্তিপুরে অত্যাচার যথেষ্ট হইল। তিনি যাহা সত্য বলিয়া ধরিতেন, তাহার রক্ষায় প্রাণ দিতেও কাতর হইতেন না, শান্তিপুরে নানা উপদ্রবের মধ্যে থাকিয়া সেই স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া ছাড়িলেন। বিজয়কৃষ্ণের প্রচণ্ড তেজঃ ও উৎসাহে ব্রাহ্মসমাজ প্রবল হইয়া উঠিল। কেশবের পশ্চাৎ বিজয়কৃষ্ণ না থাকিলে, সে যুগে বিবিধ অন্তরায় উপেক্ষা করিয়া, ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ এতখানি বিস্তৃত হইত কিনা, সন্দেহ।

আদি সমাজের সহিত বিরোধ করিয়া, কেশব ভারতীয় ব্রাহ্ম-সমাজ-প্রতিষ্ঠান্তে ব্রাহ্মবিবাহপদ্ধতি প্রণয়ন করেন। কেশব বেদীতে বসিয়া, সে বিধি রাজবিধি নয়, পরন্তু ভাগবত বিধি, এইরূপ ঘোষণা করেন। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরেই, কুচবিহারের রাজার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া, সে বিধি নিজেই যখন ভাঙ্গিলেন, তখন বিজয়কৃষ্ণ কেশবের বিরুদ্ধে সিংহবিক্রমে প্রতিবাদের সুর তুলিলেন।

কেশবচন্দ্রের প্রতিপত্তিবৃদ্ধির সঙ্গে, বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম্মকে যেরূপে বুঝিয়াছিলেন, তাহার অনেক ব্যত্যয় হইতেছিল, কেশবকে অবতারবোধে পূজা প্রভৃতি বহুবিধ পৌরাণিক অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন

হইয়াছিল। বিজয়কৃষ্ণ এই সকলের বিরোধী ছিলেন, সুযোগ পাইয়া কেশবকে চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন, "আমি ব্যক্তিগত বিদ্বেষের জন্য ইহা করিতেছি না, ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য রক্ষা করা প্রত্যেক ব্রাহ্মধর্ম্মীর কর্ত্তব্য—ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যের অপলাপ হইতেছে, ইহার প্রতিকাব চাই।"

এই বিরোধের ফলে, নবগঠিত নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ ভাঙ্গিয়া দ্বিখণ্ড হইয়া যায়। বিজয়কৃষ্ণ সাধারণ সমাজ গড়িয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করেন।

ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে এইরূপ দলাদলির আবর্ত্তনে, তাঁহার হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি মোচড় খাইয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলে। এই সময়ে তাঁহাকে সদ্‌গুরুদর্শনের আশায় আমরা দৌড়াদৌড়ি করিতে দেখি।

তিনি প্রভুপাদ অদ্বৈতাচার্য্যের বংশরত্ন, কাজেই ব্রাহ্ম হইলেও, খাঁটী বৈষ্ণব সাধুরা তাঁহাকে যোগ্য সম্মান দেখাইতেন। তিনি বরং ব্রাহ্ম হইয়াছেন বলিয়া, হিন্দু হইতে নিজেকে পৃথক্ করিয়া রাখিতে যত্নপর হইতেন। কোন হিন্দুসাধু পাত্র করিয়া তাঁহাকে আহার্য্য প্রদান করিলে, তিনি বিনীত বচনে বলিতেন—"আপনারা জানেন না, আমি ব্রাহ্ম, হিন্দুসমাজের বাহিরে গিয়াছি।" তাঁর এইরূপ আন্তরিক কুণ্ঠা দেখিয়া সাধুরা তাঁহাকে অধিকতর সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন।

তৎকালে কালনার ভগবান্‌দাস বাবাজী ও নবদ্বীপের চৈতন্যদাস বাবাজীর নাম বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। বিজয়কৃষ্ণ ইঁহাদের নিকট যাতায়াত করিতেন। চৈতন্যদাস বাবাজী বিজয়-কৃষ্ণের উক্ত প্রকার বিনয়বচন শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন "আপনার

কণ্ঠে তুলসীর মালা, মাথায় বিপুল জটাভার লক্ষ্য করিতেছি, কে বলিল আপনি ব্রাহ্ম!" গোস্বামী মহাশয়ের পরবর্ত্তী জীবনে এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল।

ব্রাহ্ম সমাজে যে আশায় তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে আশা-ভঙ্গে তিনি কাতর হইয়া পড়েন, তাঁর প্রকৃত সত্যস্বরূপ সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়, তিনি আত্মদর্শনের জন্য ভারতের তীর্থে-তীর্থে ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে গয়া-তীর্থে, আকাশগঙ্গা পাহাড়ে, মানস সরোবরের পরমহংসের নিকট দীক্ষা লইয়া, পরম শান্তি লাভ করেন।

সাধক বিজয়কৃষ্ণের জীবন অলৌকিক রহস্যময়, সে সকল কথার এখানে অবতারণা করিয়া লাভ নাই, জাতীয় জীবনে বিজয়কৃষ্ণ যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন, তাহাই আমরা বুঝিতে চাই। পুরীধামে অবস্থানকালে, দুষ্টলোকে মহাপ্রসাদের নামে তাঁহাকে বিষ প্রদান করে, তিনি তাহা বুঝিয়াই গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন—জীবনের এই একটী স্থূল ঘটনা ধরিয়াই, তাঁর জীবনভোর সাধনার মর্ম্মতত্ত্বের আমরা সন্ধান পাই।

বিজয়কৃষ্ণ দীক্ষান্তে পুনরায় পরিত্যক্ত উপবীত গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইয়াছিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি পূর্ব্বে যে ভাবপ্রচারে ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেন, এই সময়ে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে গুরুবাদের বিরুদ্ধে তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন, স্বয়ং সেই গুরুবাদ প্রচার করিলেন ব্রাহ্মদের যোগদীক্ষা দিয়া—সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের গোঁড়া ভক্তগণ এ অত্যাচার সহিলেন না, বিজয়কে সমাজ হইতে ছাড়াইয়া দিলেন। গোস্বামী মহাশয় সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া, বিশাল হিন্দু সমাজে আত্মদান

স্বামী বিবেকানন্দ ॥ ১৮৬৩-১৯০২
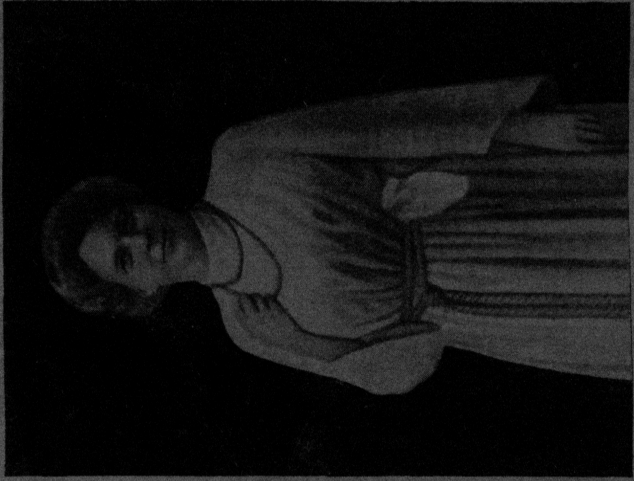
সিষ্টার নিবেদিতা ॥ ১৮৬৭-১৯১১

করিলেন। তাঁর এই অমর আত্মদানে হিন্দু ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অনুষ্ঠানে নূতন প্রাণ পাইল, শান্তিপুরের ধূলোটে গোস্বামীজির দিব্য উন্মাদের যে লক্ষণ প্রকাশ পাইল, তাহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া হিন্দুসমাজ আবার তাঁহাকে বুকে করিয়া গ্রহণ করিল। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিলেন। নীলকণ্ঠের মত, যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব হিন্দুসমাজে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছিল, সে উগ্র বিষ কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক বিজয়কৃষ্ণ উপেক্ষিত বৈষ্ণব ও তন্ত্রসাধনার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া বাঙ্গালী জাতির সুপ্ত অধ্যাত্মগৌরব পুনঃ জাগরিত করিলেন। কালের আবর্ত্তনে, ধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হইলে সে গ্লানি দূর করার নীতি—দূরে-দূরে থাকিয়া আত্মরক্ষা করা নয়, পরন্তু কালীয়-হ্রদে ঝাঁপ দিয়াই সে বিষধর সর্পের দর্প চূর্ণ করা। বিজয়কৃষ্ণের জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের আচরণ ও তৎপরে ভারতের পরম সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষা লইয়া সনাতন ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধিমানসে আত্মদান—এইরূপ চমৎকার নীতিরই জলন্ত নিদর্শন।

বাঙ্গালীর সাধনতত্ত্ব শাস্ত্রনিবদ্ধ নয়, প্রত্যক্ষ জীবন লইয়া ইহার বিগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে, বিজয়কৃষ্ণ এইরূপ জীবন্ত সাধন-তত্ত্বের একটি পরিপূর্ণ বিগ্রহ। যেমন কুরুক্ষেত্রের মত মহাসঙ্কট কেবল যে জাতিবিরোধহেতু ঘটিয়াছিল তাহা নহে, উহার পশ্চাৎ যে সূক্ষ্ম কারণ, তাহা ভাগবত-ধর্ম্মকে জাগ্রৎ করিয়া ধরা, তদ্রূপ বাংলায় চৈতন্যযুগ হইতে যে মহাকুরুক্ষেত্র চলিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া এই ভাগবত-চরিত্রকেই রূপে-রসে ফলাইয়া ধরার প্রয়াস চলিয়া আসিয়াছে। এই প্রয়াসের ক্ষেত্রে যাঁহাদের সিদ্ধচরিত্র ফুটিয়া উঠে, তাঁহাদেরই আমরা যুগপুরুষ বলিয়া পূজা করি, শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণের জীবনে এই যুগরহস্য প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

প্রথম জীবনে তিনি অদ্বয় তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করিতে গিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্বকে অবধারণ করিয়াছেন, তারপর তাঁর সিদ্ধ যোগদীক্ষায় আত্মায়-পরমাত্মায় যোগস্থাপনের সঙ্কেত ফুটিয়া উঠে, তারপর তাঁর জীবনে লীলারস উথলিয়া উঠে, ইহাই ভাগবৎ-তত্ত্ব। বাঙ্গালী শুধু ব্রহ্মকে চাহে নাই, পরমাত্মাকে চাহে নাই, চাহিয়াছে ভগবানকে—সাধনার ইহাই চরম সিদ্ধি। বিজয়কৃষ্ণ বাঙ্গালীকে সে পথের সন্ধান দিয়াছেন, পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান-গরল গলাধঃকরণ করিয়া বাঙ্গালীকে বিশুদ্ধ বুদ্ধি দান করিয়াছেন। এইজন্য মৃত্যুশয্যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বিজয়কৃষ্ণকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন: "জ্ঞান কেবল কথার কথা, প্রেমভক্তিই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায়। তাহা তো আর চেষ্টাসাধ্য নয়। তাঁরই দয়ায় হয়। 'পুরুষকার' অর্থশূন্য কথা। তাঁর চরণে নির্ভরই সার।" বাংলায় নানাদিক্ দিয়া যে যুগধর্ম্মের সাহায্যে, ভগবানে আত্মোৎসর্গ করিয়া এ জাতি ধন্য হইবে, তাহার ব্যবস্থা দিতেই যুগ-পুরুষগণের আবির্ভাব। বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে তাই শ্রীঅরবিন্দের বাণী "The truth of the future which Bijoy Goswami hid within himself, has not been revealed." গোস্বামীর নিজ মুখেই এই কথার সূত্র বাহির হইয়াছিল "আমার এমন কতগুলি কার্য্য আছে, যাহা এই স্থূল দেহ বর্ত্তমান থাকিতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। যথাসময়ে এই কার্য্য আরব্ধ হইবে।"

*

* *

॥ সাত ॥

জাগরণের লক্ষণপ্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে পুরাতনের সহিত সংঘর্ষ অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশেষ ঘটনা—এই কাল ব্রাহ্মসমাজের যুগ বলা যাইতে পারে। রামমোহনের যুগ প্রকৃতই সংঘর্ষের যুগ। এই যুগে সত্যশক্তির স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠার সম্ভাবনা ছিল না। কেশবচন্দ্র নির্ম্মাণের খনিত্র হস্তে জাতিকে নূতন ছাঁচে ঢালাই করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নির্ম্মাণের আদর্শ নিখুঁত ভারতীয় না হওয়ায়, তাহা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ পর্য্যন্ত প্রতিক্রিয়ার আবর্ত্তে ঘুরপাক খাইয়া, যে বিষ জাতির বৈশিষ্ট্যলোপের জন্য সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া ভবিষ্য জাতির কর্ম্মপন্থা নিরাপদ্ করিলেন। সত্যদৃষ্টির অমোঘ বীর্য্য দক্ষিণেশ্বর হইতেই জাতিজীবনে সঞ্চারিত হইল। তাই নরেন্দ্রের জীবন গোস্বামীর মত প্রতিক্রিয়ার ঘূর্ণিপাকে মথিত হয় নাই—ঋজুগতিতে হিন্দুশক্তির বৈশিষ্ট্য ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়া জাতিকে অমৃতত্বের পথ দেখাইয়া দিল।

ব্রাহ্মযুগ নবযুগের স্বর্ণময়ী উষা। যুগপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথ উভয়েই এই তরুণ আলোকে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের ভিতর দিয়া ভবিষ্য ভারতের জন্য যে বিদ্যুৎ-শক্তির প্রকাশ হইতেছিল, তাহা প্রথমে উভয়েরই চক্ষুঃ ঝলসিয়া দিয়াছিল; কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে প্রতীচ্যের ধর্ম্ম, সমাজ, আচার, অনুষ্ঠান নূতন ঢঙে ঢালাই করিতে গিয়া কেশবচন্দ্র একটা খিচুড়ী পাকাইয়া তুলিয়াছিলেন। যুগধর্ম্মের জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, তাহা আজও বলা

যায় না। অন্ততঃ সে যুগে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ দেশের কাছে বৈদেশিক আদর্শ বলিয়া ঠেকিতেছিল। গোঁড়া হিন্দুদের পুরাতনকে আঁকড়িয়া ধরার আসক্তিমূলক যে প্রতিক্রিয়া-শক্তি, সে শক্তি এই নূতন প্রবাহের মুখে বাঁধ তুলিতে পারে নাই, কিন্তু এই সংঘর্ষের ফলে হিন্দুসত্তার জাগরণ ঘটিল, এবং বিচিত্র বিধানে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের পর হইতেই শনৈঃ-শনৈঃ সনাতন হিন্দুশক্তি মাথা তুলিতে আরম্ভ করিল।

শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তরুণের মনে হিন্দুর প্রাচীন আচার-আচরণের উপর শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিল। বৈদেশিক অলকট-ব্লাভাটস্কির থিওসফী হিন্দুত্বেরই মহত্ত্ব প্রচার করিয়া, হিন্দুজাতিকে অন্তর্ম্মুখী করার দিকে কিছু সাহায্য করিল। তার উপর সিদ্ধ জীবন লইয়া, প্রেমভক্তির মূর্ত্ত দেবতারূপে বিজয়কৃষ্ণ যখন উদাত্ত কণ্ঠে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাগবত-তত্ত্ব ও গুরুবাদের ভিতর দিয়া, বাঙ্গালীর বিশেষত্ব ফুটাইয়া তুলিলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজ কাণা হইয়া গেল। যাহা ভাঙ্গিতে অর্দ্ধ শতাব্দী লাগিয়াছিল, তাহা নূতন আকারে সমধিক শক্তি ও বীর্য্যসম্পন্ন হইয়া ফুটিতে আরম্ভ করিল। তারপর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মিশ্রিত জীবনের রসায়নে, বাঙ্গালীর জীবনে সাধনার রসোৎস উথলিয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গে সাহিত্যে বঙ্কিম, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির গীতার যুক্তিযুক্ত জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মযোগের সামঞ্জস্য আনয়ন করার চেষ্টা বাঙ্গালীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল, বাংলার হিন্দু ব্রাহ্মসমাজের সাধু প্রয়াস পরিপাক করিয়া বাংলার বৈশিষ্ট্যকেই মাথায় করিয়া ধরিল। বাংলার এই হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরুত্থান এই বিংশ শতাব্দী ধরিয়া চলিতেছে। নরেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের ভিতর দিয়া যে নবশক্তির স্পর্শ পাইতেছিলেন,

তাহা আত্মজীবনের সিদ্ধ জাতীয়তার ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া খাঁটি ভারতীয় ভাবটাকেই ধরিতেছিলেন। কেশবের মুখে যখন প্রাচীন সিদ্ধ পুরুষগণের অনুভূতি-স্পর্শ অগ্নিময়ী ভাষায় নির্গত হইত, নরেন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি তখন হিন্দু দেবদেবীর ভিতরেও যে সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহার সূত্র যেন খুঁজিয়া পাইত, কিন্তু কিছুই স্পষ্ট হইয়া উঠিত না, এই অবস্থায় ঠাকুরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়।

নরেন্দ্রনাথের চরিত্রে তিনটী বড় গুণ ছিল, আচার্য্যের চরণে আন্তরিক আনুগত্যস্বীকারে কুণ্ঠাহীনতা, দ্বিতীয় সূক্ষ্ম অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, তৃতীয় জীবনের সবখানি দিয়া ভাবানুভূতির শক্তি। ঠাকুরের সহিত তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার-কালে তিনি ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ তাঁর মর্ম্মভেদী দৃষ্টির সাহায্যে কতকটা নির্ণয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন ও যে অমৃতময় অনুভূতির মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিলে, জাতীয় জীবনে আত্মশক্তির বিকাশে বিদ্যুৎশক্তির সঞ্চার করিতে পারা যায়, সেই অমৃতের সন্ধানে তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ পুরুষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—নরেন্দ্র একদিন তাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া আকুল কণ্ঠে ভগবানের সন্ধান চাহিয়াছিলেন, উত্তরে পরিতৃপ্ত না হইয়া, আত্মীয়ের কথায় দক্ষিণেশ্বরের উন্মাদ সাধুর উদ্দেশ্যে তথায় গিয়া উপস্থিত হন। যে অনুভূতির স্পর্শাভাবে তাঁর জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, বিধাতার আশীর্ব্বাদে তিনি সে পরশমণির সন্ধান পাইলেন। স্বামীজী নিজেকে ঠাকুরের চরণে সম্পূর্ণরূপে বিকাইয়া দিলেন। জাতির অধ্যাত্মেতিহাসে ইহা একটী স্মরণীয় দিন।

সে যুগের শিক্ষিতসমাজের প্রতিভূস্বরূপ তরুণ নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরের নিরক্ষর ব্রাহ্মণের চরণে আত্মদান করায়, শিক্ষিত

বাঙ্গালী জাতির নব দীক্ষা হইল। পরবর্ত্তী যুগে ধর্ম্ম আর আবর্ত্ত রহিল না, শান্ত জাহ্নবীধারার মত ছন্দোময় জীবনে অধ্যাত্মসাধনার অমর প্রভাব-সঞ্চারে বাঙ্গালী জাতিকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিল। স্বামীজী প্রদীপ্ত বহ্নির মত, সাতকোটী বাঙ্গালীর পুরোভাগে দাঁড়াইয়া যে আলো দেখাইলেন, তাহাতে সহস্র বৎসরের অন্ধচক্ষুঃ সহসা উন্মীলিত হইল, সে নব জীবনের উল্লাসে বাংলার নবযুগ কি বিচিত্র মূর্ত্তিতে বিশ্বের চক্ষে চমক লাগাইয়াছিল, তাহা না বলিলেও চলে।

স্বামীজির সম্বন্ধে তরুণ বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে চিন্তার তরঙ্গ আজও থামে নাই, সে সকল স্বাধীন চিন্তাস্রোতে নূতন কিছু দিবার নাই। তাঁর অমর কণ্ঠ অনাহতধ্বনি তুলিয়া বাঙ্গালী জাতিকে আজও সজীব রাখিয়াছে, তাঁর সরল বীর্য্যময় সাহিত্যের অনুশীলনে তরুণ জাতি আত্মগঠনের যথেষ্ট খোরাক এখনও পাইতেছে, স্বামীজির স্মৃতি আমাদের নিকট আজও মূর্ত্তিমান্, অতএব ইহার সম্বন্ধে আমাদের অধিক কিছু বলিবার নাই।

স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন—প্রত্যেক আত্মাই ঈশ্বর, জীবের ধর্ম্ম এই দিব্য জীবনকে জাগ্রৎ করিয়া তোলা। তাঁর সংশয়াত্মক চিত্ত ঠাকুরের চরণে সহজে বিকায় নাই। জ্ঞানের সীমা হারাইয়া তিনি যখন বিপন্ন, তখন ঠাকুর অশেষ করুণায় সন্তানকে কোলে টানিয়া দেখাইলেন—জীবে-চৈতন্যে ভেদ নাই; ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্, পৌরুষেয়-অপৌরুষেয় প্রভৃতি কথার প্যাঁচে আমরা মজিয়াছি—পঞ্চবটীর মূলে, ভাবমুখে কালী-ব্রহ্মের মিলনতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া নরেন্দ্রের মধ্যে স্বীয় সঞ্চিত তপঃশক্তি ঢালিয়া দিলেন। স্বামীজী বলেন: "From the time in which he made me over to the Mother, he

retained his vigour of health for only six months, the rest of the time he suffered."

ঠাকুরের প্রয়োজন শেষ হইয়াছিল। তিনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রয়াণ করিলেন। ঠাকুরের প্রদত্ত বীর্য্য ও তপস্যা জীবনময় করিবার জন্য, নরেন্দ্রনাথকে বিশেষ সাধনা করিতে হইয়াছিল। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে প্রব্রজ্যা-বেশে ভ্রমণ করিয়া ভারতের সত্যকে তিনি মর্ম্ম দিয়া উপলব্ধি করিলেন, তারপর পাশ্চাত্ত্যের ধর্ম্মবেদীতে দাঁড়াইয়া সেই মহাসত্য প্রকাশ করিলেন, বিশ্ব চমকিত হইয়া গেল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি মাত্র পাঁচটী বৎসর জাতির প্রাণে তাঁর অমর বীর্য্যপ্রদানের অবকাশ পাইয়াছিলেন—১৯০২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালী জাতিকে অধ্যাত্মসাধনার সিদ্ধপথে উঠাইয়া তাঁর নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেন। তার পর হইতেই বাংলার—শুধু ধর্ম্মজীবনে নয়, জাতির রাষ্ট্রে, সমাজে, শিক্ষায় সর্ব্বক্ষেত্রে নূতনের বান ডাকিয়াছে। স্বামীজির অন্তর্দ্ধানের পর বাঙ্গালী এক নিমিষের জন্য চক্ষুঃ মুদিয়া বসিবার অবকাশ পায় নাই। শক্তির তরঙ্গ আসিয়া তন্দ্রাতুর জাতিকে চির জাগরিত রাখিয়াছে।

*

*   *

॥ আট ॥

উনবিংশ শতকের ধর্ম্মসিন্ধু মন্থন করিয়া যে অমৃত উত্থিত হইল, স্বামীজী স্বহস্তে তাহা জাতিকে বিলাইয়া গিয়াছেন। ভীরু বাঙ্গালী তাই আজ মরণভীতি পায়ে চাপিয়া নবযুগের অগ্নিহোতৃ-রূপে গর্ব্বোন্নত শিরে অন্তরে-বাহিরে মুক্তির সন্ধানে ছুটিয়াছে। স্বামীজির তিরোধানের পরেই আর একজন যুগপুরুষ বিদ্যুৎ-বিকাশের মত বাংলার কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া জাতিকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁর অমোঘ বীর্য্য নিখুঁৎ পরিপূর্ণতার শক্তিতে দীপ্তিময়। জাতীয় জাগরণের মূলে এই যুগপুরুষের আত্মদান ভবিষ্যতের আশা ও আদর্শ সুস্পষ্টীকৃত করিয়াছে—ইনিই শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।

বাঙ্গালী জাতির জাগরণ-সংবাদ পাইয়াই এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ স্বীয় অদৃষ্টের মোড় ফিরাইয়া, নবোত্থিত উত্তেজনাচঞ্চল জাতির জীবনগতির নিয়ামক হইলেন। তাঁহার নিপুণ নেতৃত্বের কৌশলে অজ্ঞাতসারেই দেখিতে-দেখিতে এই বিশাল জাতির কর্মজীবন অধ্যাত্ম-প্রভাবময় হইয়া পড়িল। রাষ্ট্র-সাধনার উত্তেজনাময় কর্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া তিনি নিঃশ্বাসে-নিঃশ্বাসে জাতিকে অধ্যাত্মশক্তি আহরণ করাইলেন, স্বামীজির নিছক অধ্যাত্ম-জাতীয়তার উপর কঠোর রাষ্ট্রনীতির সংমিশ্রণ ঘটাইলেন, ধর্ম্মের সহিত বস্তুতন্ত্র জাতীয়তায় অনিবার্য্য রাষ্ট্রসাধনা সংযুক্ত হওয়ায়, বর্ত্তমান জাতীয় জীবন সমধিক সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হইল, জীবনে শক্তির জোয়ার বহিল, জীবননীতির প্রতি ভঙ্গীতে ধর্ম্মের দ্যোতনা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, তরুণ বাঙ্গালী ধর্ম্মের আস্বাদ অনুভব করিয়া নিশ্চিন্ত রহিল না, ধর্ম্মকে জীবনময় করিয়া লইবার পথ পাইল।

নব জাগ্রৎ জীবনের উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যপ্রকাশের যুগ কালে একটু স্থির হইয়া আসিলে, নবযুগের ঋষি শ্রীঅরবিন্দ দিব্য জাতীয়তার উৎসমূল মুক্ত করিয়া দিলেন, সে মন্দাকিনী-ধারায় বাঙ্গালী স্নিগ্ধ হইল, উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের প্রশমনে জাতি অন্তর্মুখী হইল। বাংলায় সে অমর জাতীয়তা আজও কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই, তাঁর নিক্ষিপ্ত বীর্য্য অব্যর্থ ফল প্রসব করিবে, বাংলায় সে যুগ আসিবে—বাঙ্গালী তাহারই অপেক্ষায় দিন গণিতেছে।

শ্রীঅরবিন্দ জলদগর্জ্জনে বলিলেন: "The religion of India is nothing if it is not lived." তিনি শুনাইলেন—বিশ্বের জন্য ভাবতের মুক্তি, ঐক্য ও মহত্ত্বের প্রয়োজন হইয়াছে। জাতিকে আত্মস্বার্থের বাঁধন হইতে মুক্তি দিয়া তিনি ভূমার লক্ষ্যে ছুটাইলেন।

জাতি জাগিবে নিজেদের জন্য নয়, বিশ্বের জন্য। হিন্দুধর্ম্ম প্রবুদ্ধ হইল, হিন্দুত্বের জন্যই নয়। শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন: "In this Hinduism we find the basis of the future world-religion." তিনি অনাহত বীণাধ্বনি কবিয়া গাহিলেন: "Our aim will therefore, be to help in building up India for the sake of humanity—this is the spirit of Nationalism which we profess and follow."

জাতীয়তা-সাধনার ক্ষেত্রে বৃহতের সন্ধান পাইয়া বাংলার অধ্যাত্মস্রোতঃ এই দিকে মোড ফিরিয়া দাঁড়াইল। সেই যে জাতি নবপ্রেরণা-বলে সঞ্জীবনীশক্তির সন্ধান পাইয়াছে—আজও তাহার হ্রাস হয় নাই; বুঝি এ অমর জাতীয়তা পূর্ণ সার্থকতা না পাইয়া আর মোড় ফিরিবে না। আজ শ্রীঅরবিন্দ নাই, তাঁর অমর শক্তি

জাতিকে ছুটাইতেছে, ছেদহীন গতি লক্ষ্যে না পৌছিয়া ইহা আর রুদ্ধ হইবার নয়।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যক্ষভাবে বাংলার জাতীয় জীবনের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া ভারতের এক প্রান্তে পণ্ডিচেরীতে নীরবে আত্মসাধনায় সমাহিত হইলেন।

শ্রীঅরবিন্দের দিগ্দর্শন ছিল: 'Religion in India always preceeds national awakenings.' শতাব্দীর যুগগুরুমণ্ডলীর সাধনার ফলশ্রুতি হইল—বাংলা ও তথা ভারতে স্বদেশ ও জাতীয় চেতনার উদ্বোধন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রামমোহনের জন্মকালে এ জাতির ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতার কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জাতীয় চেতনা যে সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে ঘনীভূত হইয়া উঠে, তাহা হইতেছে স্বাদেশিকতা। এই স্বাদেশিক মানসিকতার সঞ্চার ও উদ্দীপ্তির অনুধ্যান আমরা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে করিব।

নয় ॥

স্বদেশী যুগে বাঙ্গালী জাতি যে এতখানি মাথা তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার মূলে ব্রাহ্মসমাজ ও দক্ষিণেশ্বরের শক্তি ব্যতীত আর একটী বিপুল শক্তি কার্য্য করিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ প্রত্যক্ষ-ভাবে দেশের শিক্ষিত সমাজকে নৈতিক বলে ও জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতেছিল, অন্যদিকে ঠাকুর রামকৃষ্ণের অসাধারণ তপস্যা ও অভাবনীয় ঈশ্বরানুভূতি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে উন্মার্গ তরুণ জাতিকে স্বধর্ম্মপরায়ণ করিয়া ভারতের সনাতন ধর্ম্মে দীক্ষা দিবার আয়োজন করিতেছিল; কিন্তু ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র নীরবে বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতিকে যে ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছিলেন, তাহা এই হিসাবে জাতীয় জাগরণের অন্যতম প্রত্যক্ষ কারণ-স্বরূপ। ব্রাহ্মসমাজ ও দক্ষিণেশ্বরের প্রভাবের তুলনায়, ইহা সমতুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেন-না, ব্রাহ্ম-সমাজ ধর্ম্মসাধনার ভিত্তি নির্ম্মাণ করিয়া একটী অখণ্ড জাতিগঠনের সঙ্কল্প করিয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়ের নিগূঢ় অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করার জন্য, ভবিষ্যতে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গ বাংলার স্থানে-স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। কেবল বাংলা দেশেই এই নূতন সমাজগঠনের আয়োজন চলে নাই, সুদূর বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপ প্রার্থনা-সমাজ ও পঞ্চনদে দেবসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং এইগুলির মধ্য দিয়া শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ধর্ম্মভাবের সঙ্গে জাতীয় ভাব জাগাইয়া অখণ্ড ভারতজাতি-গঠনের প্রয়াস চলিয়াছিল। কিন্তু যে দেশ ও জাতির

উন্নতির জন্য এই সকল অনুষ্ঠান, সেই দেশ ও জাতির সত্য পরিচয় কেহ রাখিতেন না ; ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক জ্ঞানই ইঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। জাতিকে নবপ্রাণ দিবার জন্য যে সাহিত্য, তাহার উন্মেষ তখনও হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মপ্রচারমানসে বেদ ও উপনিষদের অনুবাদ মাত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন। পুরাতন হিন্দু-সমাজের সহিত এই নবোত্থিত ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ উপলক্ষ্য করিয়া ভাষার সাহায্যে কেবল কথা-কাটাকাটিই চলিতেছিল। যাঁহারা নিরপেক্ষ ছিলেন, তাঁহারা দেশের অবস্থা জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক, কৌতুকচ্ছলে, কখন কুরুচিপূর্ণ ব্যঙ্গোক্তিদ্বারা প্রচারোদ্দেশ্যে কুসাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছিলেন। যদিও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্য সুপাঠ্য হইয়াছিল, কিন্তু ইহা আমূল সংস্কৃত ভাষা হইতে অনূদিত বলিয়া ছাত্রগণের পাঠ্যরূপেই ব্যবহৃত হইত, ব্যাপক বাংলা-সমাজে তেমন স্থান করিতে পারে নাই। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে বর্ত্তমান বাংলা ভাষার আদিগুরু বলিলে অন্যায় বলা হয় না ; কেন-না, তিনিই সর্ব্বপ্রথমে "প্রভাকর" নামক সংবাদপত্র বাহির করিয়া ব্যাপক বঙ্গসাহিত্যানুশীলনের সুযোগ করিয়া দেন। তাঁর কাগজে পদ্যময় লেখাই বাহির হইত। ঈশ্বরচন্দ্রের উৎসাহে ও আনুকুল্যে সে যুগে একদল লেখকের আবির্ভাব হয় ; রঙ্গলাল, মনোমোহন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ঈশ্বরচন্দ্রকেই সাহিত্য-গুরু-পদে বরণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র "প্রভাকর"কে মাসিকে পরিণত করিয়া, তরুণ সাহিত্যিকগণের লেখা বাংলা দেশে প্রচলিত করিতে লাগিলেন। বঙ্গ-সাহিত্যের ইহা নবযুগ। "প্রভাকর" পড়িবার জন্য লোকের আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শুনা যায়, কলিকাতা সহরে মোড়ে-মোড়ে দাঁড়াইয়া কাগজ-বিক্রেতৃগণ

ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতা আবৃত্তি করিত এবং রাশি-রাশি কাগজ বিক্রীত হইয়া যাইত।

পরাধীনতার বেদনা স্বাভাবিক। এই বেদনার অভিব্যক্তি নানা কারণযোগে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হওয়ার ব্যথা অনুভবের মধ্যে জাগিয়া উঠার সঙ্গে-সঙ্গে তার প্রতিকারের স্পৃহাও স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর মনে পলাশীর স্মৃতি মুছিবার নয়। সেদিন সে যে সাধ করিয়া গলায় ফাঁস তুলিয়া লইয়াছে। কি লজ্জার কথা! ব্যথার চেয়ে এই লজ্জা নাকি বাঙ্গালীর জীবনে প্রথমে বড় ধিক্কার তোলে। কবি রঙ্গলালের "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?"—এ গানে অবশ্য ধিক্কারের সুর যতখানি, বেদনার অনুভূতিও তার চেয়ে কম নহে। ইহার পর কবি হেমচন্দ্র যখন লিখিলেন:

"চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান;
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান—
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

তখন তাঁর মনেও আত্মধিক্কারের ভাব বিশেষরূপে ফুটিয়াছিল। যে পরাধীন, তুলনায় সে কত হীন। সেই হীনের হীন আমরা—ছিঃ, আমাদের জীবনে প্রয়োজন কি? তাই 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?' তাই পায়ের বেড়ী, দাসত্বের শৃঙ্খল খুলিয়া ফেলার সাধ জাগে! এমন সাধ বুকে ভরিয়াই বাংলার স্বাধীনতা-চেষ্টার সূত্রপাত। ব্যথাটা অনেকটা মনের, প্রাণেরই তীব্র জ্বালা, মর্ম্মের সাক্ষাৎ পীড়নানুভূতি তখনও জন্মে নাই। এই ভাব লইয়াই স্বাদেশিকতার আরম্ভ।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে "দুর্গেশনন্দিনী" নামক এক নূতন ধরণের উপন্যাস বাহির করিলেন। সাহিত্যজগতের রুচি পরিবর্ত্তিত হইল। যে জাতি উপন্যাস পড়িবার জন্য "গোলেবকালি", "কামিনীকুমার", "বিজয়বসন্ত" প্রভৃতি কুরুচিপূর্ণ আদিরসাত্মক গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিরক্ত হইয়াছিল, তাহারা দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইল। এমন মার্জ্জিত ভাষা, এমন উজ্জ্বল চরিত্র-চিত্রাঙ্কন, একাধারে ভূগোল ও ইতিহাসের সমন্বয়ে অপূর্ব্ব দেশচিত্র বাঙ্গালী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তার পর যখন তাঁর "কপালকুণ্ডলা" বাহির হইল, তখন বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বাঙ্গালীর প্রাণে নূতন সাড়া পড়িল, ভাষাশিল্পে ও রচনাচাতুর্য্যে বাঙ্গালীর চিত্তে উহা নূতন সৃষ্টি সূচনা করিল। তার পর ১৮৭২ সালে তিনি "বঙ্গদর্শন" নামক মাসিক সাহিত্য প্রকাশ করিলেন। বঙ্কিমের লেখা পড়িয়া বাঙ্গালী জাতি দেশের পরিচয় পাইল, স্বজাতি-প্রীতির মাহাত্ম্য বুঝিল, মানব-চরিত্রের মর্ম্মকথা উপলব্ধি করিল। কেশবের জ্বালাময়ী বাণী শুনিয়া যেমন মানুষ মজিয়াছিল, ঠাকুর রামকৃষ্ণের অমৃত-শীতল কণ্ঠের উপদেশ শ্রবণ করিয়া একদল মানুষ যেমন নবজীবন পাইয়াছিল, জাতীয় জীবনের আদর্শগুলি বঙ্কিমচন্দ্রও স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে এমন করিয়া আঁকিলেন, যাহা সহস্র-সহস্র তরুণ বাঙ্গালীকে গভীর চিন্তাশীল করিয়া তুলিল। বঙ্কিমচন্দ্রই সাহিত্যের মধ্য দিয়া সর্ব্বপ্রথমে এই আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতিকে জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলেন, দেশকে মূর্ত্ত করিয়া বাঙ্গালীকে সন্তানব্রতী হইতে উদ্বুদ্ধ করেন। বঙ্কিম ধর্ম্মগুরু ছিলেন না, তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে দেশের আচার্য্যপদ দাবী করেন নাই। তিনি ছিলেন ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের বেতনভোগী ডেপুটী—

শেষে কর্ম্মপটুতায় ও যোগ্যতাগুণে ডেপুটীশ্রেণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার পারদর্শিতার পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহাকে 'রায়-বাহাদুর' ও 'সি. আই. ই.' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন, কিন্তু তাঁর প্রাণ দেশাত্মময় ছিল। দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ তাঁর চক্ষে উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়াছিল। সাহিত্যের মধ্য দিয়া, একটা অধঃপতিত জাতির জীবনে অনাহত আশা ও উৎসাহের আগুন তিনি প্রজ্জ্বলিত করিয়া গিয়াছেন। যতদিন বাংলা ভাষা থাকিবে, বাঙ্গালী জাতি তাঁর অমর গ্রন্থ আশ্রয় করিয়া নবভাবে উদ্বুদ্ধ হইবে, সন্তানব্রতী হইয়া দেশজননীর সেবা করিবে। বঙ্কিমের প্রতিভা তাই বাংলার অন্যান্য ধর্ম্মগুরুগণের অপেক্ষা তুলনায় কোন অংশে হীন নয়। বঙ্কিম নবজাতিগঠনের সিদ্ধমন্ত্রদাতা ঋষি। তিনিই বাঙ্গালীকে দেশ ও জাতির অন্তরঙ্গ পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়াই বাঙ্গালী মৃন্ময়ী মাতৃমূর্ত্তির চিন্ময়ী-রূপ দেখিয়া ধন্য হইয়াছে।

এই যুগমন্ত্রের ঋষির কণ্ঠে যেদিন ঝঙ্কার উঠিল : "বন্দেমাতরম্" —সেদিন কেহ বুঝে নাই যে, ইহা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত কাশ্মীর হইতে কুমারিকা আসমুদ্রহিমাচল অখণ্ড ভারতে নূতন জাতিসৃষ্টির সিদ্ধমন্ত্র হইবে, সমগ্র জাতির কণ্ঠে সাগরগর্জ্জনের মত এই মন্ত্র একদিন উচ্চারিত হইয়া জগৎকে চমৎকৃত করিবে।

এই "বন্দেমাতরম্" গান তিনি রচনা করেন স্বদেশীযুগের প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে। তখনও "আনন্দমঠ" উপন্যাসখানি রচনার পরিকল্পনা তাঁর মনে জাগে নাই। একটা অন্তর্ম্মুখ প্রেরণাময় অবস্থায় তিনি যখন গানটি রচনা করিয়া তাহাতে সুর সংযোগ করিতেছিলেন, তখন "বঙ্গদর্শনের" কার্য্যাধ্যক্ষ তাঁহাকে গানের

পরিবর্তে উপন্যাসই রচনা করিতে বলিয়া বলেন—গানে "বঙ্গদর্শনের" ক্ষুধা মিটিবে না। শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—"যদি পঁচিশ বৎসর বাঁচিয়া থাক, তবে এ গানের মর্ম্ম তখন বুঝিবে।" পঞ্চবিংশ বৎসর পরে বাঙ্গালী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মন্ত্রেই দীক্ষা লইয়া স্বদেশ-প্রেমে মাতিয়া উঠিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রেব ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে-অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছিল। সেই মন্ত্রেই স্বদেশীযুগের প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া বাঙ্গালী রক্তমোক্ষণ করিয়াছে। বরিশালেব রাজপথে পুলিসের লাঠি চলিয়াছে, তবুও বাঙ্গালী মন্ত্র ত্যাগ করে নাই। সুরেন্দ্রনাথ এই মন্ত্রযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ছিলেন—সে সকল কথা পরে বলিব। বঙ্কিমচন্দ্র মন্ত্রের সঙ্গে মন্ত্র-দেবতার ধ্যান করিতেও শিখাইলেন। স্বদেশীযুগের স্মৃতি-কথার সহিত এই পবিত্র মন্ত্র ও ধ্যানস্তোত্রের দুই-এক ছত্র গ্রন্থের গৌরববৃদ্ধিই করিবে।

বঙ্কিম গাহিলেন—"বন্দেমাতরম্"।

সে মা—"সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং"—ইহা কাব্য নয়, মায়ের জাগ্রৎ মূর্ত্তি—"শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিতযামিনীং ফুল্ল-কুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীং"—কে না দেখিয়াছে মায়ের এই মাধুর্য্যময়ী অপরূপপ্রতিমাখানিকে? শরতের প্রফুল্ল রজনীতে প্রাবৃটের বর্ষণ বুকে করিয়া, নদ-নদী-মেখলা, মালতী-মল্লিকার মাল্য গলায় দুলাইয়া মায়ের হাসি-হাসি মুখখানি দেখি যে নিত্য—কিন্তু কেহ তো এমন করিয়া পরিচয় করাইয়া দেয় নাই—এই আমার মৃন্ময়ী জননী জন্ম-ভূমি, যাঁর ক্রোড়দেশে "সপ্তকোটী কণ্ঠ কলকলনিনাদ-করালে"! কেহ তো এতদিন বুঝায় নাই—এই মায়ের প্রতিমাই আমার বিদ্যা, আমার ধর্ম্ম, আমার হৃদয়, আমার মর্ম্ম, এই মায়ের জন্যই আমার প্রাণ!

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ॥ ১৮৬১-১৯৪১
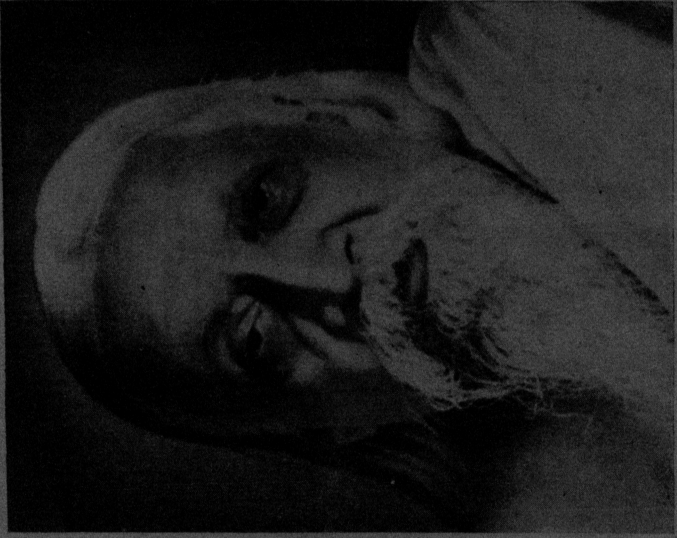
শ্রীঅরবিন্দ ॥ ১৮৭২-১৯৫০

আর বলিব না, কমলাকান্তের মুখ দিয়া ঋষি বঙ্কিম যে বাণী বাঙ্গালীকে শুনাইয়াছেন, তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়াই উপস্থিত ক্ষান্ত হইব।

মন্ত্রের ধ্যানমূর্ত্তি সঙ্গীতের ঝঙ্কারে শুনাইয়াই তিনি স্থির হইলেন না, আঁকিয়া দেখাইলেন, মাটি কুঁদিয়া যেন ভাস্করের নিপুণ হস্তে গড়িয়া তুলিলেন জননীমূর্ত্তি—কালের ঘূর্ণাবর্ত্তে ভেলায় চড়িয়া কমলাকান্ত দেখিলেন—"সুবর্ণমণ্ডিতা সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা!··· এই আমার জননী জন্মভূমি, এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী অনন্ত-রত্নভূষিতা"—কিন্তু কৈ? মা যে নগ্নিকা, দীনা, কাঙালিনী! কমলাকান্ত তাহার উত্তর দিয়াছেন—"এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা," মায়ের ধ্যানমূর্ত্তি "রত্নমণ্ডিত দশভুজ দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা অস্ত্র সুশোভিত। পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত।" কিন্তু তিনি ধ্যানে এ রূপ দর্শন করিয়াই তৃপ্তি চাহেন নাই, একদিন মায়ের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিবার আশায় ও বিশ্বাসে বলিলেন—"একদিন দেখিব দিগ্‌ভুজা, নানা-প্রহরণধারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী, বামে বাণী, সঙ্গে বলশালী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ"—কালস্রোতঃ উদ্ভিন্ন করিয়া কমলাকান্ত এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা উদ্ধার করিতে বাঙ্গালীকে উদ্বুদ্ধ করিলেন। কেবল কথায় নহে, উপায় নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"এবার সুসন্তান হইব। সৎপথে চলিব। তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি, দেবানুগৃহীতে, এবার আপনা ভুলিব, ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব, অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়াসক্তি ত্যাগ করিব।"

ইহার উপর আর কিছু বলিবার নাই। দেশ-জননীর সেবায় উৎসর্গীকৃত সন্তানব্রতীদের চরিত্রগঠনের ব্যবস্থাপত্র দিয়া ১৮৭৪

খৃষ্টাব্দে মহাঋষি ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন—দ্বাদশ বর্ষ মধ্যেই সপ্তকোটি কণ্ঠে গর্জ্জন উঠিল—"বন্দেমাতরম্"—কিন্তু মন্ত্রসিদ্ধির জন্য যে ত্যাগ ও তপস্যার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহার অনুষ্ঠান অন্যত্র আরব্ধ হইয়াছিল। বাংলার জাগরণ বিধাতার অমোঘ বিধান বলিয়াই আমরা ইহার একটি ধারাবাহিক সুসম্বদ্ধ ছন্দঃ দেখিতে পাই, ক্রমশঃ তাহা বলিতেছি।

*

* *

॥ দশ ॥

"জাতীয়তার" দাদামহাশয় ৺রাজনারায়ণ বসুই নাকি শুনা যায় সর্ব্বপ্রথমে স্বাধীনতার প্রেরণাটীকে গোপন অন্তরে পোষণ করিয়া, একটা ষড়যন্ত্র-সমিতির সূত্রপাত করেন। ব্যাপারটী ঠাকুরগোষ্ঠীর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, সে যুগে এ-দিক্ দিয়া কাজটী বাহিরে আর বড় আগায় নাই। 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে' গোছের কতকটা সখের প্রেরণা ইঁহাদের ভাবের মধ্যে খেলিয়া তখনকার মত শেষ হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর রক্তধারার মধ্যে এই আবাহন রহিয়া যাইবে, ইহা আশ্চর্য্য নয়। রাজনারায়ণবাবু হিন্দু-মেলা প্রভৃতির মধ্য দিয়াও প্রকাশ্য ক্ষেত্রে জাতীয় ভাবের প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রমুখ সাহিত্যমণ্ডলের মহারথ-গণ সম্বন্ধেও অনুরূপ একটা ধারণা বিদ্যমান থাকাটাও আশ্চর্য্যের কিছু নয়। তবে এতৎসম্বন্ধে বিশ্বাস্য প্রমাণ কিছু পাওয়া না গেলেও, একটা কথা হয়ত সত্য হইতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্র 'ফ্রী মেসন' (Free Mason) নামক সঙ্ঘ-পন্থার সহিত পরিচিত ছিলেন—এই ভাবের প্রভাব তাঁর "আনন্দমঠের" পটকল্পনায় হয়ত কিছু সাহায্য করিয়া থাকিতে পারে। কথাটার সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে সঠিক যাচাই কিছু হয় নাই, তবে বিষয়টি গবেষণাসাপেক্ষ নিশ্চয়ই।

কতকটা হিন্দুমেলার স্মৃতি ধরিয়াই মনে হয় অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন কালে, শ্রীমতী সরলা দেবী "বীরাষ্টমী" ব্রতোৎসবের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রে তিলকের 'গণপতি' ও 'শিবাজী' উৎসবও এই ধরণের। ৺সখারাম গণেশ দেউস্কর

মহাশয় সম্ভবতঃ ১৯০২ সালে মারাঠার বীরপূজা বাংলাদেশে প্রবর্ত্তিত করিয়া, মারাঠী ও বাঙ্গালীর মধ্যে একজাতীয়তাসূত্রে সখ্যসম্বন্ধ দৃঢ়তর করেন। তদবধি মহাসমারোহে কয়েকবার কলিকাতায় 'শিবাজী' উৎসবের সাম্বাৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। রবিবাবুর সুবিখ্যাত কবিতা "শিবাজী" এই উৎসবোপলক্ষ্যেই বিরচিত হয়—স্বদেশীয় বীরের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে বড় করুণ-সুন্দর কবিহৃদয়ের সেই তর্পণাঞ্জলি। জাতীয়তার মনীষী বিপিনচন্দ্রও সেদিন সোৎসাহে এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

এইকালে জাপান হইতে মনীষী ওকাকুরা আসেন। জাতীয়তার উদ্বোধনকল্পে তাঁহার আগমনে যথেষ্ট আশা ও উৎসাহের সংযোগ হয়। ওকাকুরার স্বাধীনতার বাণী ইঁহাদের প্রাণে যে উদ্দীপনা ও তেজঃ সঞ্চার করে, তাহা ধূমায়মান স্বাদেশিকতার বহ্নিকে জাগাইয়া জাতীয় শিল্পকলা ও গূঢ় রাষ্ট্রীয়চর্চ্চার নূতন ভঙ্গীকেই অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। কলা-গুরু অবনীন্দ্রনাথের কলা-প্রতিভা তখন ভারতীয় শিল্প-সাধনায় নবযুগের জন্মদানে ব্যস্ত ছিল। ওকাকুরা এশিয়ার যুগপ্রেরণাকে সার্থক করিতে, জাপানের সঙ্গে প্রাচ্য সভ্যতার কোহিনূর ভারতবর্ষের অভ্যুত্থান কত প্রয়োজনীয়, তাহা অনুভব করিয়াছিলেন ও সেই অনুভূতির সঞ্চার ইঁহাদের মধ্যে করিতেন। জাপানের আদর্শে ভারতের রাষ্ট্র-জাগরণ স্বপ্ন হইতে বাস্তবে নামে, ইহা তাঁহার অন্তরের কামনা ছিল ও ইহার জন্য সকল রকম পরামর্শ দিতে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। স্বদেশীযুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গালী এরূপ কত স্বপ্নের রঙ্গীণ নেশায় বিভোর ছিল, তার ঠিকানা নাই। শুনা যায়, একবার লর্ড কার্জ্জনের জীবননাশের পর্য্যন্ত কল্পনা কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা হইয়াছিল। ইহাও স্বদেশীযুগের

আগে। রাম না জন্মিতে রামায়ণের ন্যায়, আরও যে সব ভাব ও প্রস্তুতি ফল্গুপ্রবাহের মত ভিতরে-ভিতরে বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার সকল তথ্য হয়ত এখন আর খুঁজিয়া বলা চলে না। বারীন্দ্রকুমার শ্রীঅরবিন্দের "ভবানীমন্দিরের" ছক প্রচার করিয়া ইতি-পূর্ব্বেই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিম্বদন্তী শুনা যায়, একটা ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রকাশ ছিল যে, ১৯০৫ সালে বাংলায় নূতন শক্তি অবতরণ করিবে, কিন্তু প্রকৃত কাজ আরম্ভ হইবে ১৯০৭ সালের পরে। মধ্যপ্রদেশের একজন প্রসিদ্ধ নেতা সেন্সাস গণিয়া দেখিয়াছিলেন—যেন একটা বিশেষ সালে, বিশেষ লগ্নে জন্মিয়াছেন এক ঝাঁক তরুণ, যাঁহাদের ভাগ্য-কোষ্ঠী জানাইয়া দেয় যে, তাঁরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিবেন। এমন সব কথার প্রচার ভাবোপজীবী মনের পক্ষে একটা নূতন ধরণের নেশার খোরাক যোগায়, সন্দেহ নাই। কিন্তু আসল কর্ম্মী একদল খনিত্র হস্তে যথার্থই ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে নামিয়া গিয়াছিল—স্বাধীনতার প্রেরণা ইহাদের কাছে আর শুধু মনের সখ ছিল না, স্বপ্নকে কার্য্যে পরিণত করিতে প্রাণ-ঢালা বিশ্বাস ও একাগ্রতা লইয়া ইহারা নামিয়াছিল—বাংলায় ভোরের আলো দেখা দিবার পূর্ব্বে এরূপ অসমসাহসী তরুণ তীর্থ-যাত্রী-দল মুক্তির সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের সাধনায় আন্তরিকতা ছিল। সে প্রসঙ্গ আমরা স্থানান্তরে অবতারণা করিব। স্বদেশীযুগের পূর্ব্বস্রোতঃ ইঁহারাই একদিক্ দিয়া খাত কাটিয়া বুকে করিয়া বহাইতেছিলেন, তাই এক্ষেত্রে তাহার উল্লেখ অনিবার্য্য হইয়া পড়িল।

সিষ্টার নিবেদিতা এ যুগে একটি প্রেরণা-মূর্ত্তি ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের এই প্রেরণাময়ী মানস-কন্যা বিদ্যুল্লতিকার ন্যায়

কলিকাতায় তরুণমহলে উদ্দীপনাময় ভাব-জীবনের গঠন করিয়া তুলিতেছিলেন, স্বদেশীযুগের ভাবোদ্বোধনে তাঁহার জীবনদান অনেকখানি। এই নীরব-কর্ম্মময়ী গুরুনিবেদিতা বীরসাধিকা স্বয়ং ভারত-ধ্যানে ভাববিভোরা ও সেই জাতীয়তার বিমল ভাবই অনুক্ষণ যুবকহৃদয়ে সংক্রামিত করিতেন। কলিকাতায় "ডন-সোসাইটী" (Dawn Society) বলিয়া সে জাতীয়তানুশীলনের চিন্তাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার উদ্যোক্তৃগণ নিবেদিতার জ্বালাময়ী উৎসাহ-প্রেরণার আধার হইয়াছিলেন। পরে ইঁহারা সমিতি হইতে উক্ত "Dawn" নামেই ইংরাজী মাসিক পত্র প্রচার করিয়াছিলেন।

সিষ্টার নিবেদিতা নির্ভীক চিত্তে "বীর্য্যময়ী স্বাদেশিকতা"ই প্রচার করিতেন। টাউন হলে তাঁর অনলময়ী ভাষায় "Aggressive Hinduism" সম্বন্ধে বক্তৃতা যুবক-প্রাণে অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনার বিদ্যুত্তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছিল। মন্ত্রমুগ্ধবৎ তরুণ শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে ঝঙ্কারে-ঝঙ্কারে এই কথাই অনুবিদ্ধ হইয়াছিল—"No more words—words—words. Let us have deeds—deeds deeds"—"আর শুধু কথা—কথা—কথা নয়; এবার চাই কাজ—কাজ—কাজ"—বাংলার তরুণ তাঁর এ অগ্নিময়ী চাওয়া অচিরে সফল করিয়াছিল।

শুধু যুবকদলে আদর্শ দেওয়া নয়, সিষ্টার নিবেদিতা চিন্ময়ী অগ্নিশিখার ন্যায় ঘরে-ঘরে গিয়া স্বাধীনতা ও স্বদেশপ্রেমের আগুন জ্বালাইতেন—রাজা, মহারাজা প্রভৃতি ভারতের অভিজাতবর্গের কাহারও কাছে তাঁহার স্বাধীনতার বাণীপ্রচারে কুণ্ঠা ছিল না। কুমারী সিংহবীর্য্য স্বামীজির মতই খাপখোলা তলোয়ার—কখনও তিনি আপন হৃদয়-ভাব গোপন করিতে জানিতেন না। তাঁরই

সুপরিচিত বন্ধু "এম্পায়ার"-সম্পাদক মিঃ এ. জে. এফ. ব্লেয়ার সাহেব তাঁর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"Ten years ago she was full of the revolutionary ideas which have since obtained so lurid an advertisement all over Asia. And she was far too honest to keep them to herself and as her influence over young Bengal was greater than most people have ever suspected, she probably did more to create an atmosphere of unrest than all the newspapers in the world."—ইহা তাঁহার অসাধারণ, স্বাধীন বিদ্যুৎ-প্রেরণারই প্রতি অকপট শ্রদ্ধাঞ্জলি; বাস্তবিক সিষ্টার নিবেদিতা ভারতে একটা "living nationalism"-এরই বনীয়াদ-প্রতিষ্ঠাব্রতের অন্যতমা বীজ-ধারিণী তপঃসাধিকা—যোগ্য গুরুর যোগ্যা শিষ্যা!

আর একজন প্রতিভামূর্ত্তি বীরসাধকের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। তিনি আকুমার দেশ-ব্রতী ৺ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। স্বদেশী যুগের ভাব-ভিত্তিনির্ম্মাণে ইনি অব্যবহিত পূর্ব্বেই পশ্চিম প্রবাস হইতে বাংলায় ফিরিয়া আসেন ও পরে জাতীয়তার বাউল, সিদ্ধ প্রচারক হইয়াছিলেন। উপাধ্যায় তাঁর বাল্যজীবনে যেভাবে স্বাদেশিকতার অনুপ্রেরণায় বিভোর হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে "স্বরাজে" গল্পচ্ছলে লিখিয়াছিলেন—"যখন আমার বয়স চৌদ্দ-পনের, তখন সুরেন বাঁড়ুয্যে একটা নূতন আন্দোলন আরম্ভ করেন। কালী বাঁড়ুয্যে, আনন্দমোহন বসুও ঐ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। লেকচারে-লেকচারে দেশ মাতিয়া উঠিল। আমার ত খাওয়া-দাওয়া নাই—শ্যামের বাঁশী শুনিয়া যেমন গোপীগণ উন্মত্ত, আমিও তদ্বৎ। আমার পিতামহী বলিতেন—

নেকচায়েই দেশটাকে খেলে।.........বিদ্যাসাগরের কলেজে এফ্‌. এ. কেলাসে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। পড়া খুব ভাল হয়—কলেজ খুব জম্‌জমাট—আমার মন কেমন উধাও। সুরেন বাঁড়ুয্যে আমাদের প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন—'তোমাদের মধ্যে ম্যাটসিনি-গ্যারিবল্ডি কে হবে?' আমরা উৎসাহে হাততালি দিয়া বলিতাম—'সকলে—সকলে (all—all)।' মনে-মনে স্থির করিলাম—বিবাহ করিব না—বি. এ. এম. এ. পাস করিব না—প্রাণপণ করিয়া ভারত উদ্ধার করিব।" প্রাণের আবেগে তিনি সত্যই দুইবার গোয়ালিয়রে যুদ্ধ-বিদ্যাশিখিবার জন্য পলাইয়া গিয়াছিলেন। সে যুগের সুরেন্দ্রনাথ তরুণ হৃদয়ে দেশোদ্ধারের জন্ম এমনি অগ্নিময়ী আবেগকল্পনার সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিতেন—ব্রহ্মবান্ধবের মত যোগ্য পাত্রে তাহা ব্যর্থ হয় নাই।

এই মুক্তি-প্রেরণায় ব্রহ্মবান্ধব চিরদিন উন্মাদ ছিলেন। যৌবন-বয়সে ইহা তাঁহার অন্তরে দিব্য মুক্তির সংবাদরূপে যেদিন ফুটিল, সেদিন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আপন মর্ম্ম-বাণী তিনি প্রাণ খুলিয়াই দেশকে শুনাইয়া গেলেন—আজিকার বাঙ্গালী, আর একবার অবহিত হইয়া সেই রুদ্র ভৈরবের নিজের মুখেই তাহা শ্রবণ কর—"আমার ঘর নাই—পুত্র-কলত্র কেহই নাই। আমি দেশে-দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। শেষে শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া মনে করিয়াছিলাম যে, নর্ম্মদাতীরে এক আশ্রম প্রস্তুত করিয়া সেই নিভৃত স্থানে ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিব। কিন্তু প্রাণে-প্রাণে একি কথা শুনিলাম! কত চেষ্টা করিলাম—কথাটি ভুলিয়া যাইতে, কিন্তু যত ভুলিতে যাই, ততই ঐ কথাটি প্রাণে-প্রাণে বাজিয়া উঠিতে লাগিল। কথাটি কি? ভারত আবার স্বাধীন হইবে—এখন নির্জ্জন ধ্যানধারণার সময় নয়—সংসারের রণ-রঙ্গে মাতিতে হইবে। নির্জ্জন দেশ হইতে সজনে

আসিলাম। আসিয়া দেখি যে আমারি মত দু'চারিজন ভবঘুরে লোক ঐ দৈব-বাণী শুনিয়াছে। বিস্ময়ের কথা—এত বড়-বড় লোক থাকিতে আমার ন্যায় ধন-জনবিহীন গরীবেরাই কেন এই খেয়ালে মজিল! জানি না ভগবানের কি উদ্দেশ্য!"

তিনি আরও বলিয়াছেন—"আমি চন্দ্র-দিবাকরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, আমি ঐ মুক্তির সমাচার প্রাণে-প্রাণে শুনিয়াছি। মলয়পবনস্পর্শে যেমন শীতার্ত্ত তরুর প্রাণে নব-রাগের সঞ্চার হয়—প্রিয়জনসমাগমে যেমন বিরহীর প্রাণে আনন্দ-লহরী উথলিয়া উঠে—রণভেরী শুনিলে যেমন বীর-হৃদয় তালে-তালে নাচিয়া উঠে—ঐ স্বাধীনতার সংবাদ শুনিয়া আমারও প্রাণে তেমনি কি এক নূতন সাড়া পড়িয়া গেল। আমি নর্ম্মদার আশ্রম ছাড়িয়াছি বটে; কিন্তু আমার হৃদয়ে আর একটি আশ্রমের নূতন ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি দেখিতেছি—স্থানে-স্থানে স্বরাজ-গড় নির্ম্মিত হইয়াছে। সেখানে বিজাতির সঙ্গে আমাদেব কোন সম্পর্ক থাকিবে না। সেই সকল গড যজ্ঞীয় হোমধূমে পূত হইবে—বিজয়সিংহনাদে ধ্বনিত হইবে—শস্যশ্যামলতায় পূর্ণশ্রী হইবে।

শুনেছি মুক্তির সংবাদ। আমার জপ-তপ, বাঁধন-ছাঁধন সব ঘুচিয়া গিয়াছে—আকুল পাগল-পারা উধাও হইয়া বেড়াইতেছি। আর গোলাম-গড়ে থাকিতে চাই না। ঐ স্বরাজ-গড গড়িতে —স্বরাজ-তন্ত্রের প্রজা হইতে আমার প্রাণ সদাই আনচান।"

স্বদেশী যুগের পূর্ব্বেই ভাবুক ও মনস্বী বিপিনচন্দ্র তাঁর "New India" পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার ছত্রে-ছত্রে মামুলী ভিক্ষা-তন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাপূর্ব্বক বিপিনবাবু নূতন রাষ্ট্রচিন্তার ধারাপ্রবর্ত্তনে প্রয়াসী হন।

সার ভ্যালেন্টাইন চিরোল তাঁর "ভারতের অশান্তি" বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থে মহামতি তিলককে "Father of Indian unrest" বলিয়া যোগ্য মর্য্যাদায় ভূষিত করেন। তাঁহারই মতানুসারে, বাঙ্গালীদের মধ্যে তিলকের দুইটি প্রধান শিষ্য যুটিয়াছিলেন—বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ। ইঁহারা উভয়ে নাকি তিলকের মহিমময় প্রভাবে দীক্ষিত হইয়া "ভারত ভারতবাসীর জন্য" এই ভয়ঙ্কর মতের প্রচার করিতে লাগিয়াছিলেন! সে যাহা হউক, বিপিনচন্দ্র "নিউ ইণ্ডিয়ার" ভিতর দিয়া নবভাবের বীজটিকে আপন মৌলিক প্রতিভার আলোকে বেশ যোগ্যতার সহিত পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। এই বীজ অদূর ভবিষ্যতের যুগ-প্রবর্ত্তনে যথেষ্ট কাজ করিয়াছিল।

"নিউ ইণ্ডিয়ার" মূলমন্ত্র ছিল—নূতন স্বাজাত্য-বোধ ও আত্মনিষ্ঠা। ভারতে শুধু হিন্দুও নহে, শুধু মুসলমানও নহে, আবার ইংরাজও নয়, এই ত্রিগুণাত্মক সভ্যতাসমন্বিত যে নবজাতি গড়িতেছে, তাহাকে নব স্বাদেশিকতার অনুভূতি লইয়াই দাঁড়াইতে হইবে ও ভিক্ষার পরিবর্ত্তে আত্মত্যাগ ও স্বাবলম্বননীতি অনুসরণ করিয়া সকল অধিকার আয়ত্ত করিতে হইবে। ১৯০২ সালে তিনি যেন আসন্ন ভবিষ্যতের পদক্ষেপ শুনিতে পাইয়াই পূর্ব্বরাগ গাহিতেছিলেন—

"Heaven helps those who help themselves—an old saying this ; but it will soon be put to a new test in this country. We have too long looked for help from the outside, to work out our problems. We have always been begging and begging and begging. The Congress here and its British Committee in London are both

begging institutions. We have given a new name to begging : we call it agitation. But agitation in England by the British citizens, who have real political power in their hands, who control election, who control the constitution of the National Legislature, upon whose pleasure, ministers of the Crown have to wait for the continuance of their official life – agitation by such a people is essentially different from our agitation. They can demand, and if not satisfied, they can constitutionally enforce their demand. But we, we can only pray and petition, beg and cry and at the utmost fret and fume, and here ends all……Agitation is not in any sense, a test of true patriotism. That test is self-help and self-sacrifice ; and the time, perhaps, is coming faster than we had thought, when Indian patriotism will be put to this test. Will it be able to stand it? Time will show."

কাল সে উত্তর অচিরেই দিবার জন্য তাঁহাকে ও তাঁহার জাতিকে এই ভাবেই প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিল। বিপিনচন্দ্র সেদিন এমনি স্পষ্টদর্শী ও অগ্রগামী নব চিন্তার উন্মেষ করিয়াছিলেন। বোম্বাই কর্পোরেশনের শার্দ্দুল মিঃ মেহেতা প্রমুখ তদানীন্তন কংগ্রেসনেতৃগণের রাজভক্তিবাদের বহর দেখিয়া, তিনি এই নূতন বিশ্বাসের আলোকে কংগ্রেসের আদর্শ ও পন্থা ঢালিয়া সাজার আবশ্যকতাও অনুমান করিয়াছিলেন ও আশঙ্কা করিয়াছিলেন, বুঝি-বা এই ভাবে চিন্তা-

বিরোধ পাকিয়া চলিলে, অচিরে ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে রাজভক্ত ও জাতীয়পন্থী বলিয়া দুইটী স্বতন্ত্র দলের সৃষ্টি হইয়া পড়ে। পুরাতন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর ক্রমে তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতে থাকে। "Benevolent despotism" বলিয়া যে বর্ত্তমান ভারতীয় ইংরাজশাসন-তন্ত্রের বিশেষত্ব, উহার শান্তিদায়ী ছায়াতলে ভারতের জাতীয় জীবনের যে সম্যক্ বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না— বিপিনচন্দ্র, তিলক প্রভৃতি নবভাবের ভাবুকগণ ইহা খুব জলন্তভাবে অনুভব করিতেন ও স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিতেন। ইঁহাদের স্পষ্টবাদিতা ও তেজস্বিতা কংগ্রেসের জন্মদাতা ধুরন্ধরগণ বড় পছন্দ করিতেন না। ক্রমে বিবাদ স্ফুটতর হইতেছিল। বঙ্গভঙ্গের পর, নরমপন্থা ও চরমপন্থা বলিয়া এই দলাদলি অতি স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে।

শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশে বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন—"There is only one force and for that force, I am not necessary. Neither myself nor another nor Bipin Chandra Pal, nor all these workers, who have gone to prison. None of them is necessary. Let them be thrown as so much waste substance, the country will not suffer. God is doing everything."

স্বদেশী যুগের উৎপত্তি ও ইহার বিস্তৃতির মূল অন্বেষণ করিলে, বিধাতার অলক্ষ্য হস্ত কি নিপুণ কৌশলে কার্য্য করিয়াছে, তাহা দেখিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। যাঁহারা এই নবযুগের আনয়নের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা এক প্রকার অজ্ঞাতসারেই ঐরূপ কোন এক মহাশক্তির পরিচালনায় যন্ত্রের মত কার্য্য করিয়াছেন;

মানুষের বুদ্ধি যেখানে শ্রেয়োবিধানে উদ্যত, এই অনিবার্য্য শক্তির সঙ্কেতে তাহার বিপরীত ঘটনা সংঘটিত হইয়া দেশের কল্যাণ সাধিত হইয়াছে।

স্বদেশী যুগের মেরুদণ্ড, দেশ-নেতা সুরেন্দ্রনাথ—একদিন বাংলার "মুকুটহীন রাজা" ছিলেন, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই নব-যুগের ইতিহাস সুরেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। শিব-হীন যজ্ঞ যেমন নিষ্ফল, সুরেন্দ্র-বিহীন স্বদেশী যুগ তেমনিই অর্থহীন; এইজন্য স্বদেশী যুগের পরিচয় লইতে হইলে সুরেন্দ্রনাথের পুণ্যময় জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এমনকি স্বদেশী যুগের পূর্ব্ব হইতে এই মহাপুরুষের অক্লান্ত শ্রম, তাঁর নিজস্ব ও তাঁর দলের অতুলনীয় অবদান স্বদেশী যুগের প্রধান উপকরণ বলিয়া বুঝিতে হয় ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে উহার মর্য্যাদা-মহিমা স্মরণ করিতে হয়। সুরেন্দ্রনাথই বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের আদি গুরু ও উদ্বোধক—এ কথা কোনদিনই ভুলিবার নয়।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি বাংলার কৃতী সন্তান রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্তের সহিত এক সঙ্গে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সিলেটের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। তখন তিনি জানিতেন না যে, দেশযজ্ঞে তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে আত্মদান করিতে হইবে, জাতীয় মুক্তিপথে তাঁহাকেই পুরোভাগে দাঁড়াইতে হইবে। ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতিসাধন ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা; তাই শীঘ্রই ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিয়া তিনি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার পথ পরিষ্কার করিলেন। কিন্তু বিধাতা এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া তাঁর ভাগ্যচক্র বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া দিলেন। সুরেন্দ্রনাথের উপরিতন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন মিঃ পোষ্টফোর্ড। ইনি পরীক্ষায়

অকৃতকার্য্য হইলেন। সেদিন ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয় হইলেও, এই ঘটনার সূত্র ধরিয়া সুরেন্দ্রনাথের সৌভাগ্যসূচনা দেখা দিল। কিন্তু তিনি সেদিন ইহা কল্পনা করিতেও পারেন নাই।

ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, তাঁর পদোন্নতি এবং বেতনবৃদ্ধি হইল। সিলেটের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন সদরল্যাণ্ড সাহেব। তিনি স্বভাবতঃ একজন দেশীয় ব্যক্তির এতখানি সৌভাগ্য ভাল চক্ষে দেখিলেন না, মিঃ পোষ্টফোর্ডের দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিবার সুযোগ করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাহাতে রাজী না হওয়ায় মিঃ সদরল্যাণ্ডকে এই বিষয়ে নিবৃত্ত হইতে হইল। কিন্তু তিনি সুরেন্দ্রনাথের প্রতি এই ঘটনা হইতে বিরূপ হইলেন।

সুযোগও ঘটিল। যুধিষ্ঠির নামে এক ব্যক্তি আসামী ফেরার বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ কাগজ সহি করিয়া দিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সে ব্যক্তি ফেরারী আসামী ছিল না, বহুদিন তাহার মকদ্দমা স্থগিত থাকায় কৈফিয়ৎ দিবার ভয়ে অধস্তন কর্ম্মচারীরা এইরূপ করিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের ইহা জানা ছিল না; একগাদা কাগজের মধ্যে তিনি ইহা লক্ষ্য করেন নাই। যাহা হউক, এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া তিনি পদচ্যুত হইলেন। বিচারপ্রার্থী হইয়া তিনি বিলাত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিলেন, কিন্তু কোন প্রতিকার হইল না। সুরেন্দ্রনাথের উন্নতিপথে অকস্মাৎ এইরূপ গুরুতর বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায়, তাঁর বন্ধুবর্গ তাঁহাকে ভাগ্যহীন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। অনেকে অনেক উপদেশ দিলেন। কেহ-কেহ বলিলেন—নাম ভাঁড়াইয়া অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে যাইতে পারিলে, তাঁর মত প্রতিভাশালী ব্যক্তি সুবিধা করিয়া লইতে পারিবেন। তিনি কারও কথা শুনিলেন না—স্বীয় অদৃষ্টকে বরণ করিয়া, স্থিরচিত্তে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

মেট্রোপলিটন কলেজে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন। বেতন হইল দুইশত টাকা। সিভিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথ সেদিন অপমানে-লাঞ্ছনায় মর্ম্মাহত হইয়া ময়ূরপুচ্ছের মোহ ছাড়িয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিলে, সেইদিন তাঁর একার বেদনা দেশের বুকেও বাজিয়াছিল। রাজদরবারে তাঁর স্থান হইল না বটে, কিন্তু দেশের হৃদয়ে তাঁর জন্য আসন পাতা ছিল—সে আসন বড় পুণ্যময়, বড় গৌরবের। দেশ এই স্বাদেশিকতার পূজারী, বজ্রকণ্ঠ রাষ্ট্রনেতাকে গুরু বলিয়াই স্বীকার ও স্বদেশী-যজ্ঞের অগ্রণী পৌরোহিত্য-ভার তাঁহারই স্কন্ধে ন্যাস্ত করিয়াছিল।

কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতা সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রে বিশেষ গুণ ছিল। তিনি যখন দেখিলেন—ন্যায়বিচার লাভ করা সম্ভবপর নয়, তখন নিশ্চিন্ত হইয়া দেশের প্রতি কর্ত্তব্যসাধনে প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। তিনি জানিতেন—জাতির ভবিষ্যৎ ছাত্রদের চরিত্রগঠনেই উজ্জ্বল হইতে পারে। এই কর্ত্তব্য তিনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অতিশয় উৎসাহ ও আনন্দ সহকারেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং তিনি স্যার রমেশচন্দ্র দত্ত ও বি. এল. গুপ্তের মত উচ্চ রাজকর্ম্মচারী হইলে, এমনভাবে জীবনকে সার্থক করিতে পারিতেন না। তাই তিনি তাঁর চাকুরী যাওয়া রূপ দুর্দ্দিনের কথা স্মরণ করিয়া ভবিষ্যতে বলিতেন—"Out of death cometh light, a higher life and a nobler resurrection. So it was in my case."

সুরেন্দ্রনাথ প্রজ্জ্বলিত আগুনের মত দেশের বুকে ছড়াইয়া পড়িলেন, ছাত্রদের জীবনে দেশ-প্রীতির বীজ রোপন করিলেন, ইটালীর ঋষি ম্যাজ্জিনীর জীবন আলোচনা করিয়া ছাত্রদের বুঝাইলেন—বিপ্লবের পথে না গিয়া বিচ্ছিন্ন ভারতকে ঐক্যসূত্রে

বাঁধিয়া তুলিতে হইবে, একটা জাতির দাবী কোন শক্তিমান্ জাতি উপেক্ষা করিতে পারিবে না। ব্যক্তিগত জীবনের ব্যথা তিনি জাতির প্রাণে সঞ্চার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বয়ং দেশাত্মবোধে তন্ময় হইয়া পড়িলেন। তিনি ছাত্রদের সম্মুখে ম্যাজ্জিনীর কথা যখন বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করিতেন, তখন সত্যই যেন অগ্নিবৃষ্টি হইত। এখনও তাঁর বাণী অনেকের কর্ণে ঝঙ্কার তুলে—

"Child of humanity, raise thy brow to the sun of God, and rend open the heavens. It moves, faith and action ! The future is ours."

তিনি ভারতের কর্ম্ম সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বিধাতার হস্তে যন্ত্রের মত চালিত হইয়াছিলেন. ম্যাজ্জিনীর দেশপ্রীতি যুবকদের শিরায়-শিরায় সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি কেবল দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিবার জন্য প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, ম্যাজ্জিনীর জীবন-নীতি সর্ব্বতোভাবে আপনার জীবনেও ফলাইয়া তুলিয়াছিলেন। ম্যাজ্জিনী বলিতেন—

"What then are we to do ?
— to preach, to combat, to act."

সুরেন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনের পথে এই নীতি অক্ষরে-অক্ষরে সার্থক হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের অকৃত্রিম বন্ধু ও সহকর্ম্মী মনস্বী মহাপ্রাণ আনন্দমোহন।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু ও সহকর্ম্মী মনস্বী মহাপ্রাণ আনন্দ-মোহনকে পাইয়া "কলিকাতা ছাত্রসভা" "Calcutta Students Association" প্রতিষ্ঠা করেন। এই তরুণ ছাত্রমণ্ডলীকে আশ্রয় করিয়া ইঁহাদের উভয়ের বিশিষ্ট রাষ্ট্রকর্ম্মের সূত্রপাত।

বিপিনচন্দ্র পাল ॥ ১৮৫৮-১৯৩২

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১৮৪৮-১৯২৫
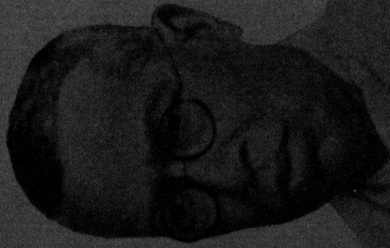
সুরেন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র চাকুরীবৃত্তি হইতে মুক্তি পাইয়া আপনার অন্তর্য্যামীকে সাক্ষী রাখিয়াই দেশব্রতে দীক্ষা লইয়াছিলেন, ভারতের উন্নতি ও মুক্তিকামনা ভিন্ন অন্য কামনা তাঁহার ছিল না; তাই দেশজননীর বিজয়াশীর্ব্বাদ মাথায় বহিয়া তিনি জয়ের পর জয় লাভ করিয়াছিলেন।

ছাত্রদের সংসর্গ জীবনসাধনার অনিবার্য্য ভঙ্গী। তাই সুরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটন্ হইতে ফ্রী চার্জ্জে অধ্যাপনা করিতে-করিতেই আপনার মত করিয়া সাধনক্ষেত্র গড়িয়া তুলিলেন। দেশ-সাধনার স্মরণবেদী—সুরেন্দ্রনাথেব রিপন কলেজ; এইখানে তিনি জীবনের সব কিছু ঢালিয়া পরিতৃপ্তি পাইতেন।

অধ্যাপনা করিতে-করিতেই, তিনি খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ভারতকে অখণ্ড দেশাত্মবোধে জাগাইয়া তুলিবার সঙ্কল্প করেন। সে সময়ে বাংলাব ভূস্বত্বাধিকারিগণের" ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" নামে এক সভা ছিল। প্রাতঃস্মরণীয় কৃষ্ণদাস পাল ইহার সম্পাদক ছিলেন। দেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর অভাব-অভিযোগ রাজ-দরবারে জ্ঞাপন করা ছাড়া প্রতিকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার সাধ্য এই সভার হইত না। তাই সুরেন্দ্রনাথ বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ লইয়া ভারত-সভা গড়িয়া তুলিলেন। ইহার সম্পাদক হইলেন—স্বর্গত আনন্দমোহন বসু। সভার উদ্দেশ্য ছিল (১) দেশের জনমতকে প্রবল মূর্ত্তি দেওয়া, (২) রাষ্ট্রগত স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে, ভারতের বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মীর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা, (৩) হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিলন প্রতিষ্ঠা করা, (৪) দেশের বর্ত্তমান আন্দোলনে চাষী, মজুর, সর্ব্বসাধারণের যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

সুরেন্দ্রনাথ শুধু প্রচারব্রতী ছিলেন না ; সঙ্কল্প সিদ্ধ করার জন্য তিনি কার্য্যতঃ কিরূপ ভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন, স্বদেশী যুগে রাজশক্তির সহিত প্রতি পদে প্রতিপক্ষতা করার মধ্যে তাহা পরিস্ফুট ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।

এই সভা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাগ্যদেবতা প্রসন্ন থাকিলে, কর্ম্মসিদ্ধির সুযোগ অনায়াসলভ্য হয়। এই সময়ে ভারতমন্ত্রী মারকুইস্ অফ সেলিস্‌বেরী সিভিল সার্ভিস বিল পাস করেন। উহাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়ঃক্রমকাল ২১ হইতে ২৯ বৎসর নির্দ্ধারিত করা হয়। ভারতীয়দের পক্ষে ইহা অসাধ্য এবং ইহা যে ইংরাজ জাতির স্বার্থদৃষ্টিবশতঃ প্রণয়ন করা হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া ভারত-সভা তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এক বিরাট্ প্রতিবাদ-সভা আহ্বান করা হয়। এতদিন বাঙ্গালী জাতি রাজশক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন নির্ভয়ে প্রতিবাদ করার সাহস করে নাই ; কিন্তু ভারত-সভার নেতৃত্বে সভায় লোকে লোকারণ্য হইল। স্বর্গত নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর এই সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন। এই সভায় কেশবচন্দ্র উপস্থিত থাকিয়া প্রতিবাদে যোগদান করেন। সুরেন্দ্রনাথ সাফল্যের সূচনা দেখিয়া আশান্বিত হইলেন এবং কেবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন না, বিলাতে ডেপুটেশন পাঠাইলেন। তাঁর কর্ম্মে জনসাধারণের আস্থা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ডেপুটেশনের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র পত্র-দ্বারা রাণী স্বর্ণময়ীর নিকট ইহার জন্য অনুরোধ করেন এবং লালমোহন ঘোষ ডেপুটেশন বহিয়া বিলাতে যাত্রা করেন। এই আন্দোলনের ফলে 'Statutory Civil Service" বিল পাস হইয়া যায়।

সুরেন্দ্রনাথ এই আন্দোলন কেবল বাংলায় সীমাবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ভ্রমণ করিয়া জাগরণের বার্ত্তা বহন করেন। তাঁর বিশ্বাসের বাণী সমগ্র ভারতবর্ষকে নূতন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

পর-পর এক-একটী ঘটনা ধরিয়া তিনি বাংলার স্তিমিত প্রাণ-শক্তিকে রাষ্ট্রীয়শক্তির অধিকারে জাগাইয়া তুলিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে, কাবুল-যুদ্ধের সময়ে লর্ড লিটন ভার্ণাকুলার প্রেস আইন পাস করেন। ইহার বিরুদ্ধেও তুমুল অন্দোলন হয়, এবং এই আইনও রাজকর্ত্তৃপক্ষ প্রত্যাহৃত করিয়া লন।

সুরেন্দ্রনাথের প্রচারব্রত কেবল বক্তৃতা দিয়াই নিরস্ত থাকে নাই। তখন কৃষ্ণদাস পালের "হিন্দু প্যাট্রিয়ট" একমাত্র ইংরাজী কাগজ ছিল। সুরেন্দ্রনাথের স্বাধীন অভিমত-প্রচারের জন্য তাঁর নিজস্ব একখানি কাগজের প্রয়োজন হয় এবং সেই সময়ে বেচারাম চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক পরিচালিত একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক বাহির হয়। তাহার অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। ১৬০০৲ টাকায় সেই প্রেস খরিদ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ নিজের অভিমত স্বাধীন ভাবেই ব্যক্ত করিতে থাকেন। "বেঙ্গলীর" গ্রাহকসংখ্যা অসম্ভব রকম বাড়িয়া গেল। দেশে রাষ্ট্রসাধনার শক্ত বেদী গড়িয়া উঠিল।

সুরেন্দ্রনাথের প্রতিপত্তি ও গৌরব তখন স্বয়ং বিধাতা বাড়াইয়া দিয়াছেন। কি ঘটনা হইতে কি যেন হইয়া যায়, দেশের নারী-পুরুষের কণ্ঠে সুরেন্দ্রনাথের নাম উচ্চারিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ, জষ্টিস্ নরিস শালগ্রাম শিলা সনাক্ত করিবার জন্য উহা যখন আদালতে আনিবার আদেশ জারী করিলেন, তখন হিন্দুগণ ইহা অতিশয় অবিচার ও হিন্দু দেবতার প্রতি অসম্মান প্রকাশ

ভাবিয়া অন্তরে ব্যথা অনুভব করিল। সুরেন্দ্রনাথ দেশবাসীর মর্ম্মকথা নির্ভীক ভাবেই লিখিলেন। তাহার ফলে, আদালতের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করার অভিযোগে তাঁর দুই মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইল। ভারতে দেশ-হিতকর্ম্মে ইহার পূর্ব্বে আর কেহ কারাবরণ করেন নাই; কাজেই ইহা লইয়া তরুণ বাঙ্গালী জাতির মধ্যে উত্তেজনার আগুন ছড়াইয়া পড়িল। স্বর্গত আশুতোষ পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথের কারাবরণ ঘটনায় পুলিসের সহিত ছাত্রদের যে সংঘর্ষ হয়, তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন।

ইহার পর হইতেই, মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের মত তাঁর যশঃ ও দেশপ্রেমের বিমল সৌরভ সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইল। ইহা ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের কথা। এই সময়ে আবার কুখ্যাত ইলবার্ট বিল লইয়া তুমুল আন্দোলন হয়। এই সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ ভারতের সর্ব্বত্র রাষ্ট্রক্ষেত্রে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য প্রচার-কার্য্যে বাহির হন। তাঁর আশা ও উৎসাহের বাণী শুনিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ উদ্বুদ্ধ ও সংহতিবদ্ধ হইয়াছিল। ভারতের হিতকামী লর্ড রিপন ইংরাজদের অপ্রিয়ভাজন হইয়া যখন বিলাত যাত্রা করেন, তখন সমগ্র ভারতে তাঁহাকে যেরূপ একযোগে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা হইতেই রাজকর্ম্মচারীরা বুঝিয়াছিলেন যে, ভারত-বাসী সত্যই একতাবদ্ধ হইয়া জাতীয় মুক্তির জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। একজন ইংরাজ বলিয়াছিলেন:

"The dry bones in the open valley had become instinct with life."

ইহা যে সুরেন্দ্রনাথের অমানুষিক শক্তির পরিচয়—কে তাহা অস্বীকার করিবে!

ভারত-সভা আশ্রয় করিয়া তিনি সমগ্র ভারতে যে একতাবদ্ধ রাষ্ট্রীয় জীবন গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা কংগ্রেস-মহাসভার দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসের আদৃরা করিয়া কলিকাতায় বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধি লইয়া এক সভাব আয়োজন করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসেব ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুবেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের এক-নিষ্ঠ সেবক ছিলেন। অখণ্ড ভারত রাষ্ট্রগঠনের ব্রত তাঁর পূর্ণ হইয়াছে।

দেশের প্রাণ যত জাগিতেছে, ঘটনার পর ঘটনা সে প্রাণের আগুনে ইন্ধন যোগাইযাছে। সুরেন্দ্রনাথ কোন ঘটনাই উপেক্ষা করেন নাই। রাজস্ব-বৃদ্ধিব জন্য মদ্যব্যবসায়ীদের মদ চোলাই করিযা সস্তায় বিক্রয় করার সুবিধা দেওয়া হয়। দেশেব দরিদ্র শ্রমজীবিদেব সে যে কি দুরবস্থা গিয়াছে, তাহা আর বলিবার নহে। পথে-ঘাটে সর্ব্বত্র নিরক্ষর চাষীবা সর্ব্বদা মাতাল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করেন। গ্রামে-গ্রামে ঘুরিয়া, তিনি মদ্যপান-নিবারণের জন্য দেশের সঙ্কীর্ত্তন-দল বাহির করিয়া ধর্ম্মভাবে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন,—চৈতন্য, রামমোহন, কেশব প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনচরিত উল্লেখ করিয়া উপদেশ দিবার ব্যবস্থা করেন।

দেশের প্রাণ ঘটনার পর ঘটনায় জাগিয়া উঠিতেছিল। ইহা অধিকতর অগ্নিময় হইল পুণার প্লেগ-বিল পাস হওয়ায়। জনসঙ্ঘ উত্তেজিত হওয়ার ফলে, প্লেগ-কমিটীর প্রেসিডেন্ট মিঃ র‍্যাণ্ড ও লেফটেনেন্ট আইরষ্ট হত হইলেন। এইরূপ দুর্ঘটনা ইতিপূর্ব্বে কেহ কল্পনা করিতেও পারিত না; রাজকর্ত্তৃপক্ষগণ বিচলিত হইয়া দাক্ষিণাত্যের

সর্দ্দার নাটু ভ্রাতৃদ্বয়কে বন্দী করিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিবাদের ঢেউ উঠিল। সেই অশান্তির আগুন আর নিভিল না। প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, পীড়ননীতি দিন-দিন বাড়িতেই চলিল। তাহার উপর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জন ভারতের ভাগ্যবিধাতা হইলেন। তাঁর কণ্ঠে প্রথম-প্রথম আশা ও সান্ত্বনার বাণী বাহির হইয়াছিল। তিনি হৃদয়ের সহিত যখন বলিতেন: "I love India, its people, its history, its Government, the complexities of its civilisation and life", তখন ভারতবাসীর প্রাণে তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা উছলিয়া উঠিত। লর্ড কার্জ্জন ভারতবাসীর আস্থা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু অকস্মাৎ ভারত-সভার ডেপুটেশন গ্রহণের সময়ে দুইজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের ভারতীয় পরিচ্ছদ দেখিয়া, বিশেষ তাঁহারা পাম-সু পরিধান করিয়াছিলেন, ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের জুতা পরিত্যাগ কবিয়া নগ্নপদে আসিতে বলিলেন—এই ঘটনা লইয়া নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। তার পর লর্ড কার্জ্জন ইউনিভার্সিটি বিল পাস করিবার জন্য যে আইনের খস্‌ড়া করিলেন, তাহাতে এই প্রস্তাবগুলি ছিল:

(1) The abolition of the second-grade Colleges. (2) The abolition of the Law Colleges. (3) The fixing of a minimum rate of the College fees by the Syndicate.

এই আইন কার্য্যে পরিণত হইলে দরিদ্র দেশবাসীর পক্ষে উচ্চ-শিক্ষা লাভ যে অসম্ভব হইবে, তাহা আর কারও বুঝিতে বাকী রহিল না। দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং ইহার ফল একেবারেই নিষ্ফল হয় নাই।

সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ভারতের প্রাণে যে রাষ্ট্রচেতনাব আগুন ছড়াইয়াছিলেন, তাহাই লর্ড কার্জ্জনের স্বেচ্ছাচাবে দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ভিত্তি দেশযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত সুবেন্দ্রনাথ স্বহস্তেই রচনা করিয়াছিলেন। তাই তাঁব কণ্ঠে যখন স্বদেশমন্ত্র উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, তখন সর্ব্বাগ্রে তাঁব ভক্ত শিষ্যমণ্ডলীই পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সুবেন্দ্রনাথ আকাশে গৃহ বচনা কবেন নাই। ম্যাজ্জিনীব বাণী: 'Preach, combat and act" তিনি জীবনমন্ত্র কবিয়াছিলেন, ভারতেব রাষ্ট্রজীবনে সে মন্ত্রের অব্যর্থ বীর্য্য জাতিকে রাস্ট্রসাধনায় অনেকখানি আগাইয়া দিয়াছে।

॥ এগার ॥

বাংলার স্বদেশী যুগ! যে সাধনার বীজমন্ত্র দিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র—যে সনাতন জাতীয়তার বেদীমূলে অধ্যাত্মভিত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন যুগগুরুপরম্পরাক্রমে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ—উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও সিষ্টার নিবেদিতা যে মহাভাবের দিব্যমর্ম্ম-কোষ পরতে-পরতে উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইলেন, মুক্তির সিদ্ধ প্রেরণা নিঃশ্বাসে-নিঃশ্বাসে সঞ্চার করিলেন—যার বীণার ছন্দে-ছন্দে হৃদয় বাঁধিয়া জাতির হৃদয় দোলাইলেন কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, পিককণ্ঠ কান্তকবি, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, আরও কত-কত বাণীর পূজারী—যার ব্যথার মর্ম্মচিত্র আঁকিলেন, ভাবের ভাষ্য ও বার্ত্তা প্রচার করিলেন পাঁচকড়ি, বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর, কাব্যবিশারদ, কৃষ্ণকুমার, মনোরঞ্জন, সখারাম, মতিলাল, রামেন্দ্রসুন্দর—যার ব্যবস্থা দিলেন আনন্দমোহন, সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, আবুহোসেন, আবদার রসুল—কর্ম্ম সাধিলেন অশ্বিনীকুমার, পুলিনবিহারী, সতীশচন্দ্র—যার চরণে ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার উজাড় করিয়া অর্ঘ্য লুটাইলেন সুবোধচন্দ্র, ব্রজেন্দ্র-কিশোর, সূর্য্যকান্ত, যতীন্দ্রনাথ—যার লাঞ্ছনার মর্ম্মদাহে আগুনের বিরাট্ হোমকুণ্ড জ্বালিয়া তাহাতে আহুতি দিলেন বারীন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রনাথ ও অগ্নিকুমারগণ, অত্যাচার সহিলেন সুশীলকুমার ও ভূপেন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত কত বীর-সন্তান, মরিয়া অমর হইলেন ক্ষুদিরাম, কানাইলাল ও বাঘা যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতি—মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপ্রাণ—পরেও যে মহাযজ্ঞ ফুরায় নাই, নব পর্য্যায়ে নব শক্তি-পরীক্ষার অভিযানে মহাত্মার নেতৃত্বে কাতারে-কাতারে—

সেনা-বাহিনী চলিয়াছে—চিত্তরঞ্জন, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি যেখানে আজ নবাহুতির হোতা ও নব-নব কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা—মহামানবের মুক্তি লক্ষ্যে যে অমর যুগস্রোতঃ যুগশক্তির মহাক্ষণে সহসা নামিয়া, ঘটনার পর ঘটনার তরঙ্গোচ্ছ্বাসে কূল হইতে অকূলে আছড়াইয়া, অতলে বা প্রকাশ্যে, সাময়িক সাফল্যে ও ব্যর্থতায় অনিরুদ্ধ বেগেই চিরদিন চলিবে—যাবৎ না কৃষ্ণকালীর মহামিলনে ভারতে দেবরাজ্য, মর্ত্ত্যে আবার আনন্দ-কানন, নব বৃন্দাবনের রচনা সার্থক হয়—সেই যুগের উদ্বোধন, মহান্দোলনের সূচনা—মানুষের দম্ভ ও অহমিকা সেখানে যন্ত্র, ঘটনা উপলক্ষ্য মাত্র; ভাগবত প্রেরণাস্পর্শে বাঙ্গালী জাতি সেদিন মহাকালের ভেরী শুনিয়া জাগিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব জাগরণের কাহিনী। উপরের আদেশে, সেদিন বাঙ্গালীর আত্মবিস্মৃতি টুটিল, সুপ্তজাতির মোহনিদ্রাভঙ্গে চারিদিকে প্রাণের চঞ্চল সাড়া পড়িয়া গেল—ভগবানের অব্যর্থ আশিস্ নিষ্ঠুর রাজকীয় বিধানরূপে, তার আত্ম-চৈতন্যে তীব্র কষাঘাত করিয়া, উহা উদ্বুদ্ধ ও প্রেরণাময় করিয়া তুলিল। পরাধীনতার ব্যথা জাতির অঙ্গে-অঙ্গে মোচড় দিয়া সেইদিনই বড় নিদারুণ কণ্টকপীড়নের মত বিঁধিল—রুষ্ট, দলিত ভুজঙ্গিনীর মত সমস্ত জাতিটা ক্ষোভে, রোষে, ব্যথায়, লজ্জায়, অপমানে, প্রতিহিংসায় ও অভিমানের দহনজ্বালায় ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের মত ব্যাকুল ও উদ্বেল হইয়া উঠিল। আত্মবিস্মৃত মহাজাতি সেই অসীম মহঝাটিকার মধ্যে তুফানে সাঁতার দিয়া চলিবার শক্তির পরিচয় লাভ করিল। লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গ-ঘটনা এই আত্মশক্তি-বোধ ফুটাইবার দৈব সুযোগ আনিয়াছিল। মরা গাঙ্গে জোয়ার নামিয়াছিল—বাঙ্গালী সেই সুযোগে শুভক্ষণে পুণ্যস্রোতে তরী ভাসাইয়া দিল। এই সময়ে

হঠাৎ কাহার মুখে উচ্চারিত হইল—"বন্দেমাতরম্"—আর সারা বাংলা এক মুহূর্ত্তে এক সঙ্গে সপ্তকোটী কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিয়া উঠিল—"বন্দেমাতরম্"—সিদ্ধমন্ত্রে বাঙ্গালী মাতৃপ্রেমের দীক্ষা লইল।

বাংলায় স্বদেশী যুগের জাগরণের পশ্চাৎ যে অসংখ্য প্রকার অনুষ্ঠান ও আয়োজন চলিতেছিল, তাহার প্রত্যেকটীর বিবরণ দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে; তবে যে প্রাণশক্তি জাতিকে দেশাত্মবোধে সচেতন করিয়া একটা অখণ্ড ঐক্যপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস করিতেছিল, সেই শক্তির স্বরূপটীকে না বুঝিলে স্বদেশী আন্দোলনের মর্ম্মোপলব্ধি সম্ভবপর নহে। জাতীয়তার সাধনায়, বিভিন্ন মতবাদের বিবর্ত্তনে, একই পথের যাত্রীদের মধ্যে যে বিরোধের হলাহল সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার ফলেই এত বড় জাগরণ একপ্রকার ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইয়াছিল বলিতে হইবে। দেশের প্রাণশক্তির আসল রূপটা বড় কেহ গ্রাহ্য করে নাই, শক্তির স্পর্শ পাইয়াই দেশ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে এবং আশু মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় শক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করার অবকাশ পায় নাই; কাজেই এই বিরাট্ শক্তির অন্ধলীলা ছাড়া তখন আর গত্যন্তর ছিল না। কেবল বাংলা নয়, এই শক্তি যেখানে আশ্রয় পাইয়াছে, সেখানেই ধ্বংসের আগুন জ্বালিয়াছে; ইহার সৃষ্টিশক্তির যে অমোঘ বীর্য্য, তাহা উপযুক্ত ক্ষেত্রাভাবে সেদিন যথার্থরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই।

ইহার জন্য অপরাধী কেহ নহে; যথানিয়মেই ইহা সার্থক হওয়ার পথে শনৈঃ-শনৈঃ অগ্রসর হইয়াছে। তবে আধার যথারীতি বিশুদ্ধ হইলে, ভাগবত ইচ্ছার বিশুদ্ধ মূর্ত্তি দ্রুত প্রকাশিত হওয়ার সম্ভব হয়। এই হেতু ঘটনারাজির পশ্চাৎ অলক্ষ্যে যে শক্তি লীলায়িত, দেশকর্ম্মীদের সেই দিকে গভীর দৃষ্টি না থাকিলে, শক্তির

ইচ্ছামত নিজেকে আত্মদান না করিয়া, নিজের মত করিয়া শক্তিকে কাজে লাগাইবার প্রচেষ্টা সহজেই জাগিয়া উঠে এবং এইখানেই আমরা অতীতে মৃত্যুবাণ বুকে ধরিয়া আত্মঘাতী হইয়াছি—অন্তর্দৃষ্টি আজও বন্ধ থাকিলে, ভবিষ্যতেও আমরা ব্যর্থ হইতে পারি।

আমরা প্রথমেই দেখি—একটা মিশ্রিত ধর্ম্মভাবের অভ্যুত্থান; তারপর দক্ষিণেশ্বরে সনাতন ধর্ম্মজীবনের প্রত্যক্ষ নিদর্শন—যাহা সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার পরই জাতিচেতনার স্ফুরণ আরব্ধ হয়। যে ভাব বা ধর্ম্মবিশ্বাস, অনাবিল আত্মদানে জাগ্রৎ জীবন লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিল না। এই অমর বীর্য্যকে বস্তুতন্ত্র করার জন্যই বাংলার জাতীয় সাধনার আরম্ভ। এই জাতীয়তাও মিশ্রিত আদর্শ লইয়া দেশের প্রাণকে দীক্ষা দিয়াছে। যে দৃষ্টি জড়ে চেতনার মূর্ত্তি দেখিয়া সাধ্য বস্তুতে আপনাকে লয় করিতে পারে, সে দৃষ্টি সেদিন আচ্ছন্ন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃবন্দনা নূতন চক্ষুঃ খুলিয়া দেয়, বাঙ্গালী মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী বলিয়া পূজা করিতে শিখে; কিন্তু তখনও ইহা ভাবুকতার ক্ষেত্র হইতে বাস্তব মূর্ত্তিতে জীবনের সহিত যুক্তি পায় নাই—তাই ভাসা-ভাসা ভাবেই প্রাণশক্তি ছড়াইয়া পড়িতেছিল। বাংলায় একদল কাপালিক জাতীয়তাকে প্রাণময় করার জন্য, জ্ঞানে-অজ্ঞানে বক্ষোরক্তপাতেও কুণ্ঠিত হয় নাই; কিন্তু প্রাণ দিয়া যে বস্তু মিলে না, তাহা আরও অধিক দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় শক্তিকে আশ্রয় করিয়া মানুষের বুদ্ধি যে কসরৎ দেখাইয়াছে, স্বদেশী যুগ তাহারই অনুরূপ চিত্র। নানা ছন্দে, নানা ভাবে, আদর্শে, বিচিত্র মতবাদের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বাংলার কর্ম্মক্ষেত্রে স্বদেশী যুগ তাই একটা প্রবল ঝটিকাবর্ত্ত। সত্যই ইহা বিপ্লবময়। এই মহানলে হবিঃভাণ্ড

লইয়া যে সকল মহাপ্রাণ ইন্ধন দিয়াছিলেন, আমরা তাঁদের জীবন-প্রেরণার সামান্য আভাস দিয়া যুগের অবিকল চিত্রগুলি পাঠককে আঁকিয়া দেখাইব।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের মূলে, লোকমান্য তিলকের অকাতর আত্মদান বাঙ্গালীর অন্তরে চিরজাগুরূক থাকিবে। ইনি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে অধ্যয়ন শেষ করিয়া শিক্ষাপ্রচার ব্রত গ্রহণ করেন, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে একটী নূতন ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও সঙ্গে-সঙ্গে "কেশরী" ও "মারহাট্টা" সংবাদপত্র বাহির করিয়া দাক্ষিণাত্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এই ইংরাজী বিদ্যালয়ই ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে পুণার বিখ্যাত ফারগুসন্ কলেজে পরিণত হয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সহকর্ম্মীদের সহিত মতবিরোধ হওয়ায়, তিনি কলেজের অধ্যাপনা হইতে বিরত হইয়া, রাষ্ট্রক্ষেত্রে অবতরণ করেন। বাংলায় সুরেন্দ্রনাথের ন্যায়, পুণায় বাল গঙ্গাধর তিলক অসাধারণ ত্যাগ ও সহিষ্ণুতা সহকারে দেখিতে-দেখিতে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রজীবনে একটী নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়া তুলিলেন।

সুদূর পুণা হইতে লোকমান্য তিলকের বিচিত্র জীবন-ঘটনার এক-একটী সংবাদ বাঙ্গালীর প্রাণে বিপুল উৎসাহ সৃষ্টি করিত, তিলকের নাম বাঙ্গালীর ঘরে-ঘরে প্রচারিত হইয়াছিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ফারগুসন কলেজ হইতে বিদায় লইয়া আসিবামাত্র বিবাহ-সন্মতি আইনের বিরুদ্ধে তিনি তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। পুণার "সার্ব্বজনীন-সভা" তখন মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের হস্তের যন্ত্রস্বরূপ ছিল। তিলকের প্রতিভার প্রখরতা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না; তাঁর প্রকৃতি চরমপন্থী তিলকের বিরোধী হইয়া উঠিল। কিন্তু

এই সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে তিলক যে ভাবে প্রতিবাদ সুরু করিলেন, তাহাতে পুণার জনমত তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিল। মহাদেব রাণাডে তিলকের সমকক্ষতা করিতে অসমর্থ হইয়া এক প্রকার প্রকাশ্য কর্ম্মক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন। এই সময়ে মহাদেব রাণাডের শিষ্যমণ্ডলী—ডাক্তার ভাণ্ডারকার, জস্‌টিস্ তেলাঙ, মিঃ এ. কে. নালকার, স্যার চন্দ্রাভারকর সকলেই একযোগে তিলকের প্রতিপত্তি খর্ব্ব করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। পরিশেষে, মিঃ গোখলে পর্য্যন্ত তিলকের ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারনীতির প্রতিপক্ষতা আরম্ভ করেন। কিন্তু তিলকের অদম্য ইচ্ছাশক্তির সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারিতেন না। তিনি যাহা সত্য বলিয়া একবার অবধারণ করিতেন, তাহা সিদ্ধ করার জন্য পৃথিবীর কোন বাধা মানিতেন না। এই সদ্‌গুণ থাকার জন্য মহামতি তিলককে পদে-পদে নির্য্যাতিত হইতে হইয়াছে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক বেশে সারা ভারত ভ্রমণকালে তিলকের সহিত সাক্ষাৎকার করেন। এইরূপ কথিত আছে যে, তিলকের কর্মপ্রেরণার মূলে নবজাতীয়তার নূতন বীর্য্য স্বামীজীই প্রদান করেন; ইহার পর হইতেই তিলকের কর্ম্মপ্রণালী ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। তিনি সর্ব্বপ্রথমে কংগ্রেস যাহাতে বিদ্বৎসমাজের বক্তৃতামঞ্চ হইতে দেশের প্রাণবেদীরূপে গড়িয়া উঠে, তাহার প্রয়াস করেন-কংগ্রেসের পাশ্চাত্ত্য ভঙ্গী বিসর্জ্জন দিয়া ইহাতে ভারতীয় ভাবের যজ্ঞক্ষেত্ররূপে যাহাতে সর্ব্ব শ্রেণীর লোক মাতৃপূজার সমান অধিকার পায়, তাহার ব্যবস্থা করেন। তিনি ভারতের রাষ্ট্রনীতি ধর্ম্মসম্পর্ক-বিহীন একান্ত বাহিরের বস্তু নহে, ইহা বলিয়া রাষ্ট্রকে ধর্ম্মসাধনার অঙ্গ-রূপেই জাতির নিকট ধরিতে চেষ্টা করেন।

তিলক পরাধীন জাতির মুক্তির জন্য যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা জাতিকে ধীরে-ধীরে গড়িয়া তোলা ও বৈধী রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ভিতর দিয়া অধিকতর অধিকার অর্জ্জন করিয়া স্বায়ত্তশাসনের পথে জাতিকে আগাইয়া দেওয়া। শেষ জীবনে, ছয় বৎসর কারাদণ্ডের পর, তিনি ফিরিয়া আসিয়া যখন দেখিলেন—একদল লোক তাঁহার চরিত্র মসীবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তাঁহাকে জগতের চক্ষে একেবারে একজন ভীষণ হত্যাকারী দস্যু-রূপে দাঁড করাইয়াছে, তখন তিনি ইহার প্রতিবাদ করিয়া যে চিঠি ভারতগবর্ণমেণ্টকে লিখেন, তাহা হইতেই তাঁর মনোভাব ব্যক্ত হয়: "I may state once for all that we are trying in India as the Irish Home-rulers have been doing in Ireland, for a reform of the system of administration and not for the overthrow of Government." তিলকের চরিত্র বিপ্লববিরোধী ছিল, কিন্তু ঘটনার পর ঘটনা এমনভাবে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল—একদিক্ হইতে তাঁর বিপদ্ বরণ করার দুর্জ্জয় সাহস ও লক্ষ্য স্থির রাখিয়া পদে-পদে অসাধারণ ত্যাগের পরিচয় পাইয়া দেশের প্রাণ যেমন উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল—অন্যদিক্ হইতে তেমনি জাতীয় জীবনে উৎসাহদানের এই প্রবল উৎসমূলকে নির্ম্মূল করার জন্য অতি হীন ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। মিঃ ভ্যালেণ্টাইন চিরোলের পুস্তকখানি এই উদ্দেশ্য লইয়াই লিখিত হয়।

তিলক দেখিয়াছিলেন—এতখানি বিপুল প্রাণ লইয়া যে জাতি কিছুতেই মোহনিদ্রা ছাড়িতে চাহে না, তাহাদের সমাজ ও ধর্ম্মজীবনে এখনও যেটুকু সাড়া মিলে, তাহা ধরিয়াই জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুযোগও সঙ্গে-সঙ্গে মিলিল।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে, বোম্বাই প্রদেশে হিন্দু-মুসলমানে গুরুতর দাঙ্গা হইল। তিনি এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া, গো-হত্যা-নিবারণী সভার প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই সময়ে ভারত-গভর্ণমেণ্ট মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া বাদ্যযন্ত্রাদি বাজাইয়া হিন্দুদের শোভাযাত্রা নিষেধ করিয়া দেন। পুণার "সার্ব্বজনীক সভা" সেই সময়ে মিঃ গোবিন্দ রাণাডে প্রমুখ তদীয় শিষ্যমণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছিল। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে তাঁহারা কিছু করিতে ইতস্ততঃ করিলেন। তিলক প্রজাবৃন্দের স্বাধীনতায় এইরূপ অকারণ হস্তক্ষেপ নীরবে সহিলেন না, তিনি চতুর্দ্দিকে সভাসমিতি করিয়া ইহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ করিলেন, তাঁহার নির্ভীকতা ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ দেখিয়া "সার্ব্বজনীক সভা" একপ্রকার তাঁহারই করতলগত হইল।

লোকমান্য তিলক হিন্দুজাতির মধ্যে সংহতিশক্তি স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জাতীয় বিদ্যালয় ও ব্যাপক ভাবে ব্যায়ামচর্চ্চার ব্যবস্থা করেন। হিন্দুসমাজে বিস্তৃতভাবে গণেশ-পূজার ব্যবস্থা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল, তিনি এই উৎসবে জাতীয়তার বীর্য্য প্রদান করিয়া ইহার নূতন আকার প্রদান করিলেন। গণপতি-উৎসবে উদীয়মান জাতি সমষ্টিবদ্ধ হইয়া, দেশের কথা, জাতির দুঃখদুর্দ্দশার কথা, ভবিষ্যতের আশার কথা লইয়া আলোচনা করিবার সুযোগ পাইল। গণেশপূজার উৎসব জাতীয় উৎসবে পরিণত হইল।

মহারাষ্ট্রে জাতির স্বাধীনতা অধিক দিন অপহৃত হয় নাই; দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও মহারাষ্ট্র স্বাধীনতার আস্বাদ ভোগ করিয়াছে। ছত্রপতি শিবাজী ও বাজীরাও বালাজীর বীরত্বের কথা মহারাষ্ট্র

ভুলিতে পারে নাই। মহামতি তিলকের উদ্বুদ্ধতায়, পুণার চিৎপাবন ব্রাহ্মণসমাজে জীবনের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ইঁহাদেরই বংশ-পুরুষগণ পেশোয়াকে যন্ত্রবৎ চালিত করিত, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা ভারতের ক্ষত্রিয়জাতির মতই অস্ত্র ধারণ করিয়া দিল্লীর দুর্গদ্বারে বিজয়ী মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল। এই জন্মগত স্পর্দ্ধা জাগাইবার জন্য তিলক শিবাজী উৎসরের আয়োজন করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে, মহারাষ্ট্রের সুপ্তস্মৃতি জাগাইয়া তিনি রায়গড়ে নিজের বাটীতে শিবাজী উৎসব আরম্ভ করেন। বলা বাহুল্য, এই শিবাজী উৎসবের উত্তেজনা সুদূর মহারাষ্ট্র হইতে বাংলায় আসিয়া বাঙ্গালীকে যে কি ভাবে মাতাইয়াছিল, তাহা স্বদেশী যুগে বাংলাদেশের সর্ব্বত্র এই উৎসবের বহুল আয়োজন দেখিয়াই অনুমান করা যায়।

জাতির প্রাণ জাগিলেও তাহা সুসংহত করা সহজ নয়, বাংলার মত পুণায় উচ্ছৃঙ্খল শক্তি দেখা দিল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে দারুণ দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল, লোকজন অন্নমুষ্টির জন্য পথে-পথে হাহাকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু গবর্ণমেন্টের খাজনা বন্ধ হইবার নহে। তিলক ঘোষণা করিলেন—এই দুঃসময়ে গভর্ণমেণ্ট খাজনা আদায় বন্ধ করুন। কিন্তু রায়তের দ্বারে-দ্বারে খাজনা-আদায়কারীরা গিয়া হানা দিল। অসন্তোষের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অনাহারক্লিষ্ট নাগরিকের মর্ম্মব্যথা রুদ্রমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইল। তাহারা ভিক্টোরিয়ার প্রস্তরমূর্ত্তি বিবর্ণ করিয়া দিল, উন্মাদের ন্যায় ইংরাজের গীর্জ্জায় আগুন ধরাইয়া দিল। তিলকের বিরুদ্ধপন্থী যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের প্রতিও অত্যাচার হইল। অবস্থা আরও গুরুতর হইল—ইহার উপর মহামারী প্লেগের আবির্ভাবে। গবর্ণমেণ্ট এই মহাসংক্রামক ব্যাধি যাহাতে ব্যাপক

শিশিরকুমার ঘোষ ॥ ১৮৪২-১৯১১
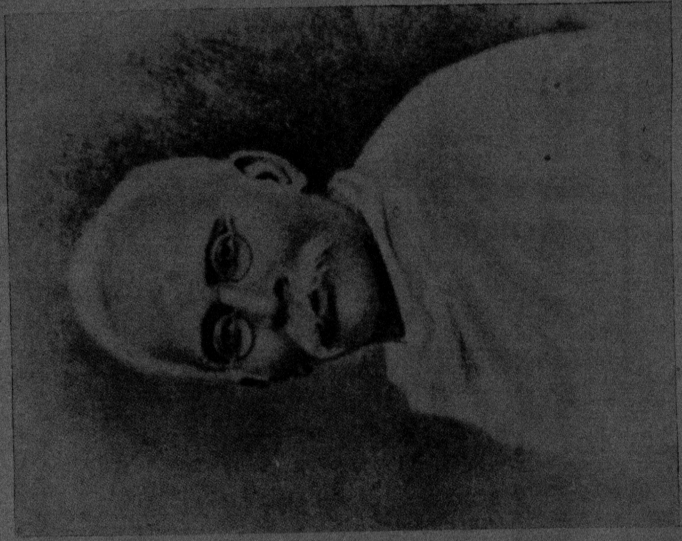
অশ্বিনীকুমার দত্ত ॥ ১৮৫৬-১৯২৩

ভাবে বিস্তৃত না হয়, তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু হিন্দুদের সংস্কারে তাহা বাধিল, ব্রাহ্মণ-গৃহ হইতে প্লেগাক্রান্ত রোগীকে গভর্ণমেন্টের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার ঘটনা লইয়া দেশের জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। দেশের মুখপাত্রস্বরূপ তিলক "কেশরী"তে গভর্ণমেন্টের এই আচরণ গর্হিত, এইরূপ মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা করিলেন না। তিনি জানিতেন না—এই অসন্তোষ-বহ্নি কি ভীমমূর্ত্তি ধরিয়া জাতিকে আলোড়িত করিবে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন তারিখে প্লেগ কমিটীর প্রেসিডেণ্ট মিঃ র‍্যাণ্ড ও কমিসারিয়েটের একজন কর্ম্মচারী লেফ্টনেণ্ট আইরেষ্ট একজন চিৎপাবন ব্রাহ্মণযুবকের গুলীতে নিহত হইলেন। ভারতের রাষ্ট্র-নীতিক ক্ষেত্রে এইরূপ বীভৎস লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটায়, ইহা লইয়া সমগ্র ভারতে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। ইহার উপর মহামতি তিলক এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া "কেশরী"তে লেখার জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। তিলক ইহার পর হইতেই ভারতের একজন যোগ্যতম নেতা বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। বিশেষতঃ, বাংলায় তাঁর প্রতিপত্তি বিশেষ ভাবে ছড়াইয়া পড়িল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট বাঙ্গালী বয়কট ঘোষণা করিয়া, তাঁহাদের নেতৃরূপে মহামতি তিলককে পাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া পড়িল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসে তাঁহাকে সভাপতি করিবার জন্য বাঙ্গালীর জিদ্ ভারতের নরমপন্থী নেতৃবৃন্দকে বিশেষরূপে ভাবাইয়া তুলে। পুণার অশান্তিসৃষ্টির মূল কর্ম্মকলাপ অনেক নেতৃবৃন্দের ইচ্ছাবিরুদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহারা তিলকের প্রতিপক্ষ-রূপেই দাঁড়াইয়াছিলেন। এই অবস্থায় তিলককে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে বরণ করিলে তাঁহাদিগকে কংগ্রেস ছাড়িয়া দিতে হইবে, এই ভয়ও দেখাইতে

তাঁহারা বিরত হন নাই; কিন্তু বাংলার এই নব জাগরণযুগে নেতৃবৃন্দের এ কথা কেহ শুনিতে চাহে নাই। অবশেষে মধ্যপন্থী স্যার শা মেটা বিলাতের পার্ল্যামেন্টে ভারতপ্রতিনিধি দাদাভাই নৌরজীকে কংগ্রেস-সভার নায়কত্ব দিয়া সে যাত্রা নূতন ও পুরাতন দলের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করেন। কিন্তু যে প্রাণ সেদিন জাগিয়াছিল, তাহাকে এভাবে ধামাচাপা দিয়া রাখার সম্ভব ছিল না। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ইহা রক্ষা পাইল বটে; কিন্তু তিলকের প্রতি বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা যেরূপ দৃঢ় ভিত্তি লইয়াছিল, তাহা উৎখাত করিতে গিয়া পর বৎসরেই মধ্যপন্থীদের চিবদিনের জন্য দেশের প্রতিনিধিত্বের আসন হইতে অপসৃত হওয়ার দক্ষযজ্ঞ সুরাটে সংঘটিত হয়। এইজন্য বাংলার স্বদেশী যুগের পশ্চাৎ পুণার পুরুষসিংহ লোকমান্য তিলকের প্রভাব যে অনেকখানি ছিল, তাহা না বলিলে সত্যের অপলাপ হয়।

আর কয়েকটী কথা উল্লেখ করিয়া, ঘটনার পর ঘটনা আঁকিয়া কি ভাবে সে যুগের তরুণ দেশের কাজে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছিল, তাহা দেখাইব।

দীর্ঘ শতাব্দী বৈদেশিক শিক্ষা ও সভ্যতার অধীন ভারতবর্ষ আত্ম-বৈশিষ্ট্য এক প্রকার ভুলিতে বসিয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষায় আত্ম-বিস্মৃতি অধিকতর ঘনীভূত হয়। ভারতের ত্রিশ কোটী নরনারীর মধ্যে অন্যূন ৩০ লক্ষ লোক সহরবাসী। ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন সহরাঞ্চলেই সর্ব্ব প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয়। খৃষ্টান মিশনরী ডফ্‌ ও ক্যারি সাহেবের প্রতিপত্তি সহরবাসী উচ্চশ্রেণীর মধ্যে এমন ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, অনেকে আত্ম-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া এই সময়ে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। যাহারা খৃষ্টান হয় নাই, তাহাদের মধ্য হইতে হিন্দুত্বের মর্য্যাদা লুপ্ত

হইয়াছিল। হিন্দু-শাস্ত্রের আলোচনা ছাড়িয়া শিক্ষিত যুবকেরা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও ব্রাউনিঙ প্রভৃতি ইংরাজী-কবিদের নামে সমিতি গড়িয়া ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনা-ক্ষেত্র গড়িয়া তুলিয়াছিল। জীবনের আদর্শ স্থির করার জন্য তাহারা মিলটন্, বার্ক, জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের উক্তি শাস্ত্রবাক্যের ন্যায় শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিত, মনে হেগেল, হারবার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য মনীষিদের গুরুর আসনে উঠাইয়া নব শিক্ষিত তরুণেরা গর্ব্ব অনুভব করিত। বাংলার ব্রাহ্মসমাজ, বোম্বাইয়ের প্রার্থনাসমাজ ও অন্যান্য সমাজসংস্কারক সমিতির পক্ষে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিজয়াভিযান হইতে জাতিকে রক্ষা করা দুরূহ হইত, যদি দক্ষিণেশ্বরের অবিমিশ্র সনাতন হিন্দুধর্ম্ম যথাসময়ে অভ্যুদিত হইয়া ইহার গতিরোধ না করিত। এই সকল কথা পূর্ব্বে যথাসাধ্য আলোচিত হইয়াছে; কিন্তু ভারতের আত্ম-বিস্মৃতি দূর করার সাহায্য বাহির হইতেও পাওয়া গিয়াছে, উদীয়মান জাতি অতি কৃতজ্ঞতার সহিত তাহাও স্মরণ রাখিবে।

ভারতের অবিনশ্বর সম্পদ্—তাহার শিক্ষা, সভ্যতা ও সাধনা। পর-জাতির অধীনতাপাশে বদ্ধ হইয়া, সে সমস্ত হইতে তাহাদের দীর্ঘ দিন বিরত থাকিতে হয়। নিজেদের যাহা কিছু মহনীয়, অনুশীলনের অভাবে—যথারীতি চর্চ্চা না থাকায়, তাহা বিস্মরণ হওয়া অস্বাভাবিক নয়; এই অবস্থায় পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞানগর্ভ শিক্ষার অবদান যখন ভারতের দুয়ারে অকাতরে বিতরিত হইল, তখন বুভুক্ষু বুদ্ধি-বৃত্তি অতি উপাদেয় বোধেই তাহা আত্মসাৎ করিল, এবং তদনুগত করিয়া এমন জীবন গড়িয়া তুলিল যে, অনাদরে ভারতের শিক্ষা ও সাধনার বাঙ্‌মূর্ত্তি—সংস্কৃত গ্রন্থগুলি—নিঃস্ব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে বস্তাবন্দী হইয়া রহিল, প্রাচীন ভারতের এই অলৌকিক

জ্ঞানরাশি উপেক্ষায় ম্লান হইয়া পড়িল। ভারতের ব্রাহ্মণই সর্ব্বাগ্রে ইংরাজী শিক্ষার ছত্র-তলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ; অতএব প্রাচীন ভারতের জ্ঞানচর্চ্চার যথার্থ অধিকারী যাঁহারা, তাঁহাদের নূতনের প্রতি এই আকর্ষণ সহজেই পুরাতনের প্রতি দেশ-ব্যাপী উপেক্ষার সৃষ্টি করিল, ভারতের গর্ব্ব করার কোন বস্তু কোনকালে যে ছিল তাহা ভাবিবারও আর অবকাশ রহিল না। কয়েকজন দারিদ্র্যব্রতী পণ্ডিত ভারতের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি বুকে করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের কণ্ঠেই মাঝে-মাঝে এই গ্রন্থরাজি হইতে যে জ্ঞানগর্ভ বাণী উচ্চারিত হইত, তাহা একান্ত অপদার্থ নির্জ্জীব বোধেই দেশেব শিক্ষিত শ্রেণী সেদিকে কর্ণপাত করিতেন না। ঠিক এই সময়ে, বিধাতার আশীর্ব্বাদে, পাশ্চাত্ত্য মনীষিদের কণ্ঠেই ভারতের সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের মহিমা-কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ইংরাজ পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার ও জর্ম্মণ অধ্যাপক ডিউট্‌স্ (Deutsch) শতমুখে ভারতেব মৌলিক সভ্যতা ও সাধনার প্রশংসা আরম্ভ করিলেন—দেশেব মোহ টুটিল। পরাধীন জাতি চিরদিন পরেব সঙ্কেত ভিন্ন চলিতে পারে না। একদল বিদেশী পণ্ডিত তাহাদের পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মহত্ত্ব দেখাইবা-মাত্র যেমন একদিন তাহারা স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করে নাই, তদ্রূপ আজ আবার এক মুহূর্ত্তে বিজেতা খৃষ্টান জাতির মধ্য হইতে দুই-একজন পণ্ডিতকে ভারতের প্রাচীন শিক্ষা-সাধনার প্রশংসা কবিতে দেখিয়া তাহারা জাতীয় সাহিত্যের অনুরাগী হইয়া পড়িল। দেশে সংস্কৃত-চর্চ্চার পুনরারম্ভ হইল। হিন্দু-ধর্ম্ম যাহাদের মুখের কথায় হিন্দুর নিকট নিন্দনীয় হইয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতেই অপর একদল যখন ইহার মহত্ত্ব প্রচার করিল, এবং হিন্দুধর্ম্ম জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া তাহারা

হিন্দুর আচার বরণ করিয়া লইল, তখন পরিত্যক্ত, অনাদৃত হিন্দুত্বের মধ্যে যে অমূল্য বস্তু আছে, তাহার খোঁজ পড়িল। সংস্কৃতচর্চ্চার পুনঃপ্রবর্ত্তন হওয়ার জন্য এ জাতি পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার, ডিউট্স্ প্রভৃতির নিকট যেমন ঋণী, তদ্রূপ হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি ও স্বধর্ম্মানুরাগে প্রবৃত্তির জন্য মাদাম ব্লাভাট্স্কী ও কর্ণেল অলকটের নিকটও চির-কৃতজ্ঞ থাকিবে।

বাহিরের এই দানগুলি দ্বারা জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ হইতেছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা পাশ্চাত্য সভ্যতার ভীম আক্রমণ হইতে জাতিকে নিঃসংশয়ে রক্ষা করিত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। কেননা, প্রক্ষিপ্ত ঔষধে জীবনরক্ষার আয়োজন স্থায়ী হয় না—যদি ভিতর হইতে প্রকৃতির যথারীতি সাহায্য না মিলে। ভারতের সৌভাগ্য, এই সময়ে স্বামীজী চিকাগোর ধর্ম্মসভায় হিন্দুত্বের জয় দিয়া, হিন্দুধর্ম্মে অনুরাগী কয়েকজন বিদেশীকে সঙ্গে লইয়া দেশে ফিরিলেন, জাতির জয় এইদিন অবধারিত বলিয়া গণ্য হইল।

যে জাতি আত্ম-বৈশিষ্ট্য হারায়, সে জাতির পুনরুত্থান অসম্ভব হয়। কোন জাতিকে চির-পরাধীন রাখার একমাত্র উপায়, সে জাতির আত্মগৌরবের বস্তু ধ্বংস করিয়া দেওয়া। ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে এত বড় প্রকাণ্ড জাতির অতীত গৌরবচিহ্ন মুছিয়া দেওয়া দুরাশা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। জাতির স্মৃতি বিকৃত করার কূট রাজনীতি এই ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইয়াছিল। সঙ্কটকাল যে উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহা নহে, তবে এ যাত্রা আমরা রক্ষা পাইয়াছি। স্বদেশী যুগ এই জয়েরই একটা উত্তেজনাপূর্ণ উচ্ছ্বাস মাত্র।

গৌরচন্দ্রিকা দীর্ঘ হইতেছে। তবুও আমরা সংক্ষেপে স্বদেশী যুগের পশ্চাৎ অন্যান্য প্রভাবগুলির মধ্যে, প্রধানতঃ যেগুলি

ব্যাপকভাবে জাতির চেতনা উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, সেইগুলির উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে দেখিতে হইবে—এই জাতীয় জাগরণের মৌলিক প্রেরণা কি? এবং তাহা আমরা অব্যাহত রাখিয়া চলিতে পারিয়াছি কি না? স্বদেশী যুগের আবর্ত্তে, আমরা মৌলিক প্রেরণা যথারীতি রক্ষা করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না; কেননা, জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিশারদ ছিলেন। ভারতের ধাতু দিয়া তাঁহাদের সবখানি গঠিত হইলেও, বুদ্ধিবৃত্তি ইংরাজী শিক্ষার ছাঁচে ঢালাই হইয়া যাওয়ায়, অবিকৃত ভারতীয় ভাব জাতীয় সাধনায় সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা যায় নাই। এইজন্য আমরা দেখি—জাগরণের প্রেরণা, ভারতের সত্য আকাঙ্ক্ষার সহিত জাতির পরিচয়-সাধনের যে ব্যবস্থা, তাহা সম্যক্‌রূপে কোথাও সাধিত হয় নাই—অধিকার আয়ত্ত করার জন্য শিক্ষানুযায়ী আমরা পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণ করিয়াছি, দেশের প্রাণ চেতনার স্পর্শে জাগাইয়া তুলিতে পারি নাই; উদ্দেশ্যসিদ্ধির সর্ব্বপ্রকার আয়োজনই তাই ব্যর্থ হইয়াছে।

কি রাষ্ট্র, কি শিক্ষা, সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান জাতীয়ভাববর্জ্জিত হওয়ায়, কর্ম্মসিদ্ধি সুদূরপরাহত হইয়াছে এবং সঙ্গে-সঙ্গে অবসাদেও আমরা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছি।

মহামতি তিলক, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ—ইঁহারা—ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ভঙ্গী পরিবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু যে সরিষা দিয়া ভূত ছাড়াইতে হইবে—তাহাই যদি ভূতগ্রস্ত হয়, তবে কর্ম্ম যে ব্যর্থ হইবে—ইহা না বলিলেও চলে। জাতীয় মহাসভায় দেশের নেতৃমণ্ডলী জাতিকে মুক্ত করার জন্য অচিরকাল মধ্যে যে

চারিটী সঙ্কল্প গ্রহণ করেন, তাহা ছিল—স্বরাজ, স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা ও বয়কট।

স্বরাজের অর্থ তখনও সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই; স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা ও বয়কট সম্বন্ধে লোকমান্য তিলকের যেরূপ অভিমত ছিল, তাহা শ্রীঅরবিন্দ এইরূপ ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"National education meant····· the training of the young generation in the new national spirit to be architects of liberty."

অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষা অর্থে ভবিষ্যৎ জাতিকে মুক্তির তোরণ-রূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

"Swadeshi meant an actualising of the national self-consciousness and the national will and the readiness to sacrifice, which would fix them in the daily mind and daily life of the people"

স্বদেশী জাতির মন ও প্রাণকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ রাখিবে, জাতীয় ইচ্ছাকে বস্তুতন্ত্র করিবে, এবং ত্যাগে উদ্যত করিয়া তুলিবে।

"Boycott which was only a popular name for passive resistance···· the means to give to the struggle between two ideas in conflict, between bureaucratic control and national control······"

বয়কট প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্সের নামান্তর, শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিরোধকে জাগাইয়া রাখার অস্ত্রবিশেষ; ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ভারতের অধিকারার্জ্জনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই জাতির প্রাণ উদ্বুদ্ধ হওয়ায়, এইরূপ নীতি অবলম্বন করা ভিন্ন অন্য উপায়

তখন ছিল না। ভারত যে মানুষের আকুলতায় বা চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হয় নাই, তাহার জাগরণের পশ্চাৎ যে একটী তৃতীয় হস্ত আছে এবং তাহা মানুষের কল্পিত ও কৃচ্ছ্রসাধ্য প্রয়াসের প্রতীক্ষা রাখে না—এ চেতনা স্বদেশী যুগের সূচনাকালে তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। ইংরাজী শিক্ষায় আমরা যত চালাকি, যত কূটনীতি আয়ত্ত করিয়াছিলাম, আমাদের বুদ্ধি যত তীক্ষ্ণ ও মার্জ্জিত হইয়াছিল, তাহা দিয়াই আমাদের কল্পিত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আমরা প্রাণপণ করিয়াছিলাম।

কর্ম্মকে লক্ষ্যে রাখিয়া চলা, আর কর্ম্ম—সনাতন যাহা, তাহার দিকে চলার সহজ অভিব্যক্তি-রূপে প্রকাশ হওয়া—এই দু'য়ে অনেকখানি প্রভেদ আছে। অভারতীয় শিক্ষায় এই সরল জ্ঞানটী ঢাকা পড়িয়াছে। আজিও আমরা ইহা যে অবিকৃত ভাবে বুঝিতে পারি, তাহা নহে; কেননা বুদ্ধিবৃত্তি যেভাবে গড়িয়া গিয়াছে, বুঝিবার রীতি তদনুগত হইবে। ভারতের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, আমাদের এই কৃত্রিম বুদ্ধিবৃত্তিটীকে ভাঙ্গিয়া আবার নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। দক্ষিণেশ্বরে এই সাধনা সার্থক হইয়াছিল। এইজন্যই স্বামীজী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমূল বিস্মরণ হওয়ার জন্য ইষ্টের নিকট আকুল প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেন। তিনি পরিশেষে বিশুদ্ধ বুদ্ধি লইয়া ভারতীয় সাধনার স্বরূপটী উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁর কণ্ঠে সেদিন যে নির্দ্দেশ বাহির হইয়াছিল, তাহা সিদ্ধ করার জন্য পরবর্ত্তী যুগে কিছু আগ্রহ দেখা যায়।

স্বামীজী কন্যাকুমারিকায় ভারতের দিব্যমূর্ত্তির দর্শন পান। যে ভারতের মুক্তিকল্পে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে, সেই ভারতের সহিত জাতির পরিচয় সিদ্ধ না হইলে, কেমন করিয়া জাতির কর্ম্ম

সম্পন্ন হইবে, তাহা বুদ্ধির অতীত; কিন্তু জাতীয় সাধনায় আজ অধিকার-বিচার নাই। ইহা স্বার্থসিদ্ধির মত অনায়াসসাধ্য বলিয়া প্রচারিত, লোক ও অর্থসংস্থানের উপরেই যেন ইহা নির্ভর করে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় অন্তর্দৃষ্টি রুদ্ধ; স্বদেশপ্রীতি তৃতীয় পন্থার সন্ধান না পাইয়া হয় নৈরাশ্যমূর্চ্ছিত, নয় মরীচিকাভ্রান্ত। আমরা তাই স্বদেশ ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও যে অবস্থা, আর এই কর্ম্মে উদ্যত হইলেও তদপেক্ষা ভাল কিছু যে হইয়াছে, তাহা বড় দেখা যায় নাই। তবে নিশ্চেষ্ট, হতাশ ব্যক্তির অপেক্ষা উদ্যোগী দেশ-কর্ম্মীর অভ্যুত্থান বাঞ্ছনীয়; কেননা, ইহাদের পদে-পদে ব্যর্থতার ভিতর দিয়াও ভবিষ্যতের আলো ফুটিয়া উঠিতেছে, আমরা ধীরে-ধীরে ভারতের সিদ্ধ নির্দ্দেশ লাভ করার অধিকারী হইয়া উঠিতেছি।

দম্ভের মূর্ত্তি লর্ড কার্জ্জন বিধাতার অস্ত্রস্বরূপ ভারতের শাসনকর্ত্তা হইয়া প্রেরিত হইয়াছিলেন। উপর্য্যুপরি যথাক্রমে তিনি একটীর পর একটী কুটিল রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া, ভারতবাসীর মনে সংশয়ের ঘোরাবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া তুলিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় হস্তক্ষেপ করিয়া, উন্নতিমুখী বাঙ্গালীর উচ্চশিক্ষার গতিরোধ ঘটাইতে তিনি চেষ্টা করিলেন; তারপর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ঘড়ির কাঁটা পিছু দিকে ঘুরাইয়া দিলেন। তিনিই স্বজাতীয় আমলাতন্ত্র ও শোষণতন্ত্রের স্বার্থসংরক্ষণার্থ ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের স্বার্থ পদে-পদে বিদলিত করিতে লাগিলেন, পরিশেষে ১৯০৩ সালের পূর্ব্বে, তিনি বঙ্গভঙ্গের কল্পনায় মাতিয়া উঠিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে সফরকালে এই উদ্দেশ্য তাঁহার মুখে ব্যক্ত হইল। ভারত-গভর্ণমেন্টের প্রথম প্রস্তাব শ্রবণ করিয়াই বঙ্গদেশে বিষম চাঞ্চল্য

উপস্থিত হয়। শাসনকর্ত্তৃপক্ষের বাঁশী "ষ্টেট্‌সম্যান" পত্রে এই ব্যবস্থার গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবেই এই মর্ম্মে প্রকাশ পাইল—'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্য এই যে "(১) বাঙ্গালী জাতির সমবেত শক্তিকে নষ্ট করা. (২) কলিকাতার রাজনৈতিক প্রাধান্যের উচ্ছেদসাধন করা; (৩) পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান শক্তির পরিপুষ্টি সাধন করা। মুসলমান শক্তির পুষ্টি সাধিত হইলে, তাহা শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্রুতবর্দ্ধনশীল শক্তিকে বাধা দান করিবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন।" পরে লাট বাহাদুরের দপ্তরখানার কাগজ-পত্রেও মার্জ্জিত মধুভাষায় এই ভেদনীতির সমর্থন বাহির হইয়া পড়িতে বিলম্ব হইল না।

বাংলার জনমত তীব্র মনোবেদনায় এই ভেদনীতির প্রতিবাদ করিতে কোনও ক্রটি রাখে নাই। গভর্ণমেণ্ট-সার্কুলার-প্রচারিত ব্যবচ্ছেদ-ব্যবস্থার রীতিমতভাবে অন্যাযাতাপ্রদর্শনের জন্য কলিকাতায় "Anti-circular society" বলিয়া এক সমিতি গঠিত হইল। রাজধানীতে ও নগরে-নগরে ন্যূনাধিক ৬ শত প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রত্যেক সভায় ১০ হাজার হইতে ৪০ হাজার পর্য্যন্ত লোক সমবেত হইয়াছিল। তা' ছাড়া দেশের রাজন্য ও জমিদারবর্গ, উপাধিধারী ও প্রধানগণ সকলে একবাক্যে এই প্রতিবাদে যোগ দিলেন। উত্তরপূর্ব্ব বঙ্গ হইতে নাটোর ও দিনাজপুরের মহারাজ ও কাকিনা, দিঘাপতিয়া ও ডিমলার রাজারা এবং বগুড়ার নবাব বাহাদুর রাজাদেশে অসন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক বিলাতে ভারতসচিব মহোদয়ের নিকট টেলিগ্রাম প্রেরণ করিলেন। পশ্চিম বঙ্গ হইতে মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও কাশিম-বাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীও ভারতসচিবের নিকট

তারযোগে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অসন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন। এইরূপে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, জমিদার-প্রজা, হিন্দু-মুসলমান যাবতীয় অধিবাসী একযোগে বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবে আপত্তি জানাইয়াছিলেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গ-মনীষী ও পূজার্হ নেতৃগণের মধ্যে কে না এই প্রস্তাবের কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন—কিন্তু রাজপুরুষেরা কাহারও কথা কর্ণপাতযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন না।

বঙ্গের ৭ কোটী লোক মায়ের এই অঙ্গবিচ্ছেদ রহিত করিবার জন্য না করিয়াছে কি? এক বেলা না খাটিলে যাহার সমস্ত পরিবার অনাহারে থাকে, এমন দরিদ্র কৃষক, মুটে, মজুর স্বদেশ-রক্ষার কথা শুনিয়া অর্থ দিয়াছে, কাজকর্ম্ম ফেলিয়া রাখিয়া রাজপুরুষদের নিকটে মনের ব্যথা জানাইবার জন্য ব্যাকুল প্রাণে, যেখানে সভা-সমিতি হইয়াছে, সেইখানেই ঊর্দ্ধশ্বাসে গমন করিয়াছে। প্রজারা আশা করিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহাদের প্রাণের গভীর যাতনা উপলব্ধি করিয়া বঙ্গদেশকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিতে ক্ষান্ত হইবেন। কিন্তু সারা বাংলার কাতর প্রার্থনায় লর্ড কর্জ্জন বা স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার কর্ণপাত করা উচিত মনে করিলেন না। পূর্ব্ববঙ্গের জমিদারগণ শত প্রলোভন, শত ভ্রূভঙ্গী দেখিয়াও সেদিন ভীত বা বিচলিত হন নাই—তাঁহারা জননী জন্মভূমির অঙ্গে ছুরিকাঘাত হইবে, এই কল্পনা করিতেও শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা জন্মভূমিকে অখণ্ড রাখিবার জন্য কুলি-মজুরের ন্যায় দিবারাত্র খাটিয়াছেন, দুই হস্তে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজকর্তৃপক্ষ দেশের ক্রন্দনে কর্ণপাত করিলেন না।

৭ কোটী বাঙ্গালীর কাতর প্রার্থনা উপেক্ষিত হইল। কিন্তু জন কয়েক কয়লাব্যবসায়ী ইংরাজের আপত্তিতে লর্ড কার্জ্জন ছোট নাগপুর প্রদেশটি বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে সাহসী হইলেন না।

যাহারা স্মরণাতীত কাল হইতে একত্র বাস করিতেছিল, পরস্পরে সুখ-দুঃখের অংশী ছিল, পরস্পর প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া মহাশক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইতেছিল, শাসন-দণ্ডের একটি আঘাতে তাহাদের ছিন্ন-ভিন্ন করিবার দুর্ম্মতি পরিত্যক্ত হইল না।

॥ বার ॥

লর্ড কার্জ্জনের জনমতে উপেক্ষা জাতিকে সজাগ করিয়া তুলিল. বাংলার জাগরণে সমগ্র ভারতের নূতন দৃষ্টি ফুটিল। সে যুগের ভাব, ভাষা, কর্ম্ম, উৎসাহ লিখিয়া ব্যক্ত করার নহে; স্মৃতির মধ্যে আগ্নেয় অক্ষরে যে চিত্র আঁকা আছে, তাহা এ যুগের তরুণকে বুঝি আর বুঝান সম্ভবপর নহে। সে নবানুরাগের দ্যোতনায় যে আশা ও আনন্দে বাঙ্গালী মাতিয়াছিল, তাহা যদি স্থায়ী হইত, আজ অন্ততঃ বাংলার ইতিহাস অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিত।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সপ্তকোটী কণ্ঠের কাতর নিবেদন যে এমন নির্ম্মমভাবে উপেক্ষা করিতে পারেন, দেশের জনমত যে প্রকারেই তাঁহাদের গোচর করা হউক, তাহা যে এইরূপ উদ্ধত অবজ্ঞায় ব্যর্থ হইতে পারে—এ কল্পনা কেহ করে নাই। কেমন করিয়া প্রবল জনমতের জয় দেওয়া যায়, তাহা চিন্তা করার সে যুগে লোকের অভাব ছিল না। বাংলার রাজভক্ত জমিদারমণ্ডলী হইতে ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, উকিল, মোক্তার, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী, ধনী, দরিদ্র, সকলেই একযোগে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ অবজ্ঞাদৃষ্টি প্রত্যাহৃত করাইয়া দেশের মর্য্যাদারক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। কিন্তু এত প্রতিবাদ, এই তুমুল আন্দোলনেও, করুণ অনুনয়-নিবেদন গ্রাহ্য হইবার কোনই লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়ায়, বাঙ্গালীর আর মনঃক্ষোভের সীমা রহিল না।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই গবর্ণমেণ্ট বঙ্গভঙ্গনীতি অবধারিত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। দেশের নেতৃবৃন্দ চিন্তিত হইলেন, তাঁহারা

কয়দিন ধরিয়া ইহার বিরুদ্ধে আবেদন-আন্দোলন ব্যতীত আর কি করা যাইতে পারে, তাহার চিন্তা ও আলোচনায় দিবারাত্রি কাটাইলেন। একবার মনে হইল—গবর্ণমেন্টের সহকারিতার জন্য অবৈতনিক যত পদ আছে, তাহা একযোগে ছাড়িয়া দেওয়া হউক; কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রে তাহার সম্ভব হইবে কি না এবং সম্ভব হইলেও, ইহার দ্বারা কর্ত্তৃপক্ষগণের ক্ষতির মাত্রা এমন কি হইবে, যাহাতে তাঁহারা দেশমর্য্যাদারক্ষায় ভবিষ্যতে উদাসীন হইবেন না, এইরূপ হঠকারিতা করিতে ভরসা করিবেন না। কোন যুক্তিই কার্য্যকরী বলিয়া বোধ হইল না। নিরুপায় হওয়ায় সকলেই অতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে রাজধানী হইতে দূরে, বাংলার এক সুদূর মফঃস্বল হইতে এই প্রস্তাব উঠিল—বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন করিলে হয় না! *

সুরেন্দ্রনাথ স্বীয় জীবনচরিতে লিখিয়াছেন—গবর্ণমেন্টের বঙ্গভঙ্গ-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনের নানা স্থানে যে সকল

---

* এতদ্বিষয়ে হিতবাদীর সহকারী সম্পাদক ৺যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নিকট আমরা শুনিয়াছি, ৺কাব্যবিশারদ মহাশয়ই সখারামবাবুর নিকট গিয়া বলেন—"গুরুজীর (সুরেন্দ্র বাবুকে বিশারদ মহাশয় গুরুজী বলিয়া সম্বোধন করিতেন) নিকট শুনিলাম—বঙ্গব্যবচ্ছেদ হইবেই! দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই গেজেট হইবে।" পরে এ বিষয়ে নানাপ্রকার আলোচনান্তে তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন "দেখুন সখারাম বাবু, আমার বোধ হয় এখনও একটা উপায় আমাদের হাতে আছে—যদি আমরা ম্যাঞ্চেষ্টারের গলা টিপিয়া ধরিতে পারি, তাহা হইলে পার্লামেন্ট ম্যাঞ্চেষ্টারের অনুরোধে আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে বাধ্য হইবে।" পরে এই কথা সুরেন্দ্রবাবুকে শুনান হইলে, তিনি প্রথমে ইহা impossible (অসম্ভব) বলিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু পরিশেষে কৃষ্ণকুমারবাবু, গীষ্পতি, আবুহোসেন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শান্তে এই প্রস্তাবের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বদেশী আন্দোলনে তিনি ঝম্প প্রদান করেন।

সভা হইতে থাকে, পাবনা জিলায় এইরূপ একটী সভাক্ষেত্রে বিলাতীপণ্যবর্জ্জনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং ইহাই বণিক ইংরাজ-শক্তির স্বার্থে আঘাত দিবার ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ মনে করিয়া নেতৃগণ এই প্রস্তাব কার্য্যতঃ সিদ্ধ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হন।

অবশ্য ব্রিটিশপণ্যের বর্জ্জনব্রত গ্রহণ করিলে রাজশক্তি প্রজার উপর কিরূপ আচরণ প্রকাশ করিবেন, তাহা লইয়া অনেক আন্দোলন চলিয়াছিল; কিন্তু দেশের জাগরণস্রোতে আতঙ্কের ছায়া টিকিল না। একদিন প্রভাতে রাজনগরীর পথে-পথে বৃহৎ রক্তাক্ষরে ঘোষণাপত্র আঁটিয়া দেওয়া হইল—৭ই আগষ্টের বিরাট্ সভায় ব্রিটিশপণ্যবর্জ্জনের জন্য দলে-দলে লোক সমবেত হওয়ার আহ্বান—সেদিন বিধাতার ডাকের মত, তাহা বাঙ্গালীর অন্তঃস্থলে নূতন আশার ফুলঝুরি ফুটাইয়াছিল, সে উৎসাহের আগুন স্পর্শ করে নাই, এমন লোক ছিল না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অবচেতনার স্তরে অপমানের কশাঘাত বুঝি বড় নির্ম্মমরূপেই বাজিয়াছিল এবং তাহার প্রতিশোধকামনায় অন্তরে বৃশ্চিকজ্বালার মত তীব্র অনুভূতি সেদিন জাতিকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। সে এক মহাসমারোহ ব্যাপার! সেদিন জাতির বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য, ভীরু বাঙ্গালীর সুপ্ত বীর্য্য উৎসাহ-দীপ্ত নব রূপ লইয়া দেখা দিয়াছিল। কাতারে-কাতারে, রাজপথের উপর দিয়া হরিদ্রাবর্ণরঞ্জিত উষ্ণীষ মাথায়, স্কুল-কলেজের অসংখ্য ছাত্র সেদিন গভীর নিনাদে "বন্দেমাতরম্"-শব্দে কর্ত্তৃপক্ষের হৃৎকম্প সৃষ্টি করিয়াছিল। তেমন শোভাযাত্রা বোধহয় আর হইবে না। সেদিন জয়ের পথে প্রথম যাত্রা বলিয়া মেরুদণ্ড-ভাঙ্গা এই জাতিজীবন বড় আশায় একবার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কল্পনা-কাহিনী নহে, সত্যই রুগ্ন যে, সেও লাঠি হাতে পথের ধারে এই অপূর্ব্ব

জাগরণচিত্রদর্শনে উৎসাহে আত্মহারা হইয়াছিল, মুমূর্ষুর নয়নে আশার বিদ্যুৎ খেলিয়াছিল। এই বিশাল বাহিনীর সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি দেশনেতৃগণ দীর্ঘ জীবনের তপস্যা এইভাবে মূর্ত্ত হইতে দেখিয়া কি প্রফুল্ল দীপ্তিময়, উজ্জ্বল দৃষ্টি ইতস্তত: সঞ্চালিত করিতে-করিতে পদবিক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন তাঁহাবা বুঝিবেন না। স্বর্গীয় অনাথবন্ধু সেন সুরেন্দ্র-নাথকে এই প্রতিবাদ-সভাব জন্য লোকমতগঠন হেতু আরও কিছুকাল প্রতীক্ষা কবিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন ; কিন্তু ইহা মানুষের প্রতীক্ষা রাখে নাই, ভগবানের পাঞ্চজন্য সেদিন জাতির হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনি তুলিয়াছিল।

সারা বাংলায় আগুন ধরিয়া গেল।

১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট। টাউন হলের রাক্ষসী সভায় বিশ সহস্র বঙ্গবাসী প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিল—"বঙ্গভঙ্গের রোধ করা হউক, অন্যথা অসহায় বলিয়া আমরা অত্যাচার সহিব না, ইহাব প্রতিকার করিব—অস্ত্রহীন জাতি আর নীরব থাকিবে না—হাতে না পারি, ভাতে মারিব ; বণিক্ ইংরাজের ব্যবসা নষ্ট করিব, বণিক্ জাতির পকেটে হাত পড়িলে বুঝিবে, বাঙ্গালী জাতি আজ আর যথেচ্ছাচার সহিতে রাজী নহে—প্রজা শক্তির নিকট রাজশক্তিকে পরাজয় মানিতে হইবে।"

এই বিরাট্ সভার সভাপতি ছিলেন—কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে, দেশের কণ্ঠে সেদিন স্বপ্নাতীত স্পর্দ্ধার বাণী গর্জ্জিয়া উঠিল। দেশের দৌর্ব্বল্যবোধ যেন এক নিমিষে তিরোহিত হইল, লক্ষ কণ্ঠের প্রতিজ্ঞা গগন বিদীর্ণ করিয়া প্রতিধ্বনি

আবু হোসেন, গীষ্পতি (দণ্ডায়মান), লিয়াকত হোসেন
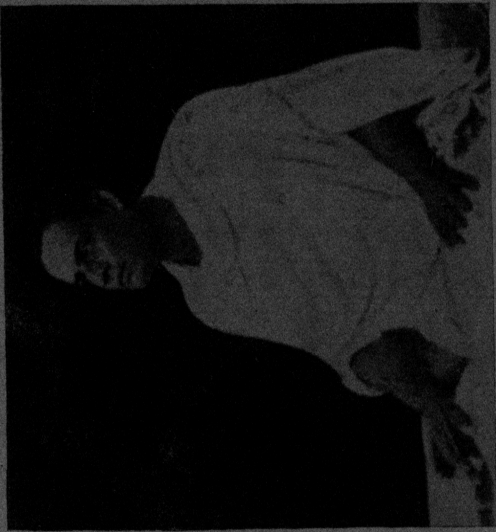
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ॥ ১৮৬১-১৯০৭

"তুলিল—বিলাতী দ্রব্য আর স্পর্শ করিব না।" আসমুদ্রহিমাচল "বন্দেমাতরম্"-শব্দে মুখরিত হইল।

জাগরণের সে নূতন প্রভাত। বাঙ্গালীর প্রাণে অজস্র বিদ্যুৎ-বৃষ্টি হইল। তরঙ্গে-তরঙ্গে সে বিদ্যুৎশক্তি দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। সে কি উৎসাহ, সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! বাংলার ইতিহাসে এমন ঘটনা আর কখনও ঘটে নাই। শুধু বাংলা কেন, জগতের ইতিহাসে বা এমন মহাজাগরণের তুলনা কোথায়!

সেদিন ভাবার অবসর ছিল না। সেদিন কোথায় কাহার স্বার্থ, আভিজাত্য, ভবিষ্যতের পরিণামচিন্তা, সব যেন লোপ পাইয়াছিল। তাই ব্রিটিশ-শাসনের ভিত্তিস্বরূপ কাশিমবাজারের রাজবংশ-তিলক স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রতিবাদসভায় নেতৃপদ গ্রহণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"We shall not be strangers in our own land." তাঁহার সেদিনের জ্বালাময়ী বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা গেল না। এ যুগের তরুণ সেদিন মহারাজার কণ্ঠে স্বদেশীর ভেরী কি ভাবে বাজিয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহা উপলব্ধি করার অবকাশ পাইবে এবং জাতির প্রাণ জাগিয়াছিল বলিয়া সে উন্মাদ প্রেরণা হইতে কেহ যে বাদ পড়েন নাই, তাহা বুঝিয়া, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বাণী যে বিধাতার আহ্বান, এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইবে :—

"I dread the prospect and the outlook fills me with anxiety as to the future of our race. The partition of Bengal will rend assunder the ties of centuries, break up associations which are a part of our being and I fear, may even alienate the sympathies of the people

from the Government. Is administration efficiently possible under these conditions?" ইহার পর তিনি নিজের রাজভক্তির নিদর্শন দেখাইয়া বলিতেছেন—"No-body will question my loyalty. My house has been associated with the genesis of British rule. The founder of my family was a friend of Warren Hastings and on a critical occasion saved his life."

ইংরাজরাজ্যের ভিত্তি রক্ষা করিয়াছিল যে বাঙ্গালী, তাহার দাবী এমন অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষিত হওয়ায়, বুঝি মহারাজের প্রাণে সেদিন বড় আঘাত লাগিয়াছিল। তাই এই উপকারের কথা স্মরণ করাইয়া কৃতজ্ঞতাস্বরূপ যদি কর্তৃপক্ষগণ মহারাজের সদুপদেশ গ্রহণ করেন, ইহাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। কিন্তু ভারতের মত, উপকারের প্রত্যুপকার করা ইংরাজের ধর্ম্ম নহে, স্বদেশ ও স্বজাতির স্বার্থ রক্ষা করাই তাহাদের ইষ্ট; তাই রাজশক্তি ইচ্ছা থাকিলেও, এই নিষ্ঠা-ত্যাগে অশক্ত।

সেই বিপুল জনসঙ্ঘের সম্মুখে, বাঙ্গালী রাজশক্তির নিকট অন্তরনিবেদনের সহিত বয়কট-রূপ ব্রহ্মাস্ত্র লইতেও কুণ্ঠা করে নাই। যে চারিটী প্রতিজ্ঞা ৭ই আগষ্টের প্রতিবাদ-সভায় গৃহীত হইয়াছিল, তাহার প্রথমটী ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ জমিদার মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় উত্থাপন করেন; স্বর্গত আশুতোষ চৌধুরী ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ইহার সমর্থন করেন। এই প্রস্তাবে বঙ্গভাষাভাষী অংশকে একত্র করিয়া, শাসন-সৌকর্য্য-রক্ষার অনুনয় ছিল। বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ যুক্ত করিয়া অখণ্ড বাংলা যাহাতে একত্র থাকে, তাহার নিবেদন পরে পালন

করা হইয়াছে ; জনমত পাছে স্পর্দ্ধান্বিত হয়, তাই সেদিন সে কথায় কর্ণপাত করা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যুক্তিসঙ্গত মনে হয় নাই।

৭ই আগষ্টের সর্ব্বপ্রধান প্রতিজ্ঞা—যাহা পালন করিবার জন্য বাঙ্গালীর প্রাণ বলি পড়িয়াছে—তাহা পরলোকগত নরেন্দ্রনাথ সেনের কণ্ঠেই উচ্চারিত হইয়াছিল। প্রস্তাবটী যথাযথ উদ্ধৃত হইল—

"That this meeting fully sympathises with the resolution adopted at many meetings held in the moffusils to abstain from the purchase of British manufactures so long as the partition resolution is not withdrawn, as a protest against the indifferences of the British public in regard to Indian affairs and the consequent disregard of Indian public opinion by the present Government."

দেশের লোক বয়কট-পণ জীবনব্রত করিয়া লইতে ইতস্ততঃ করে নাই, অনেকেই এই প্রতিজ্ঞাপত্রের বঙ্গভঙ্গরোধ হওয়া পর্য্যন্ত সর্ত্তাংশটুকু পছন্দ করিত না। দেশের তরুণ বয়কট-ব্রতে শুধু আন্দোলন ব্যতীত করার মত কিছু পাইল, দেশে কর্ম্মস্রোতঃ ভীমবেগে ছড়াইয়া পড়িল। সে সকল কথা পরে বলিতেছি।

জাতীয় জীবনের এই নবোন্মেষ-যুগে বস্তুতন্ত্রভাবে কাজ মিলিয়াছিল। সে চরণ সেইখানেই রহিল, আর উঠিল না—বঙ্গভঙ্গরোধ লইল ; কিন্তু বয়কট-মন্ত্র সফল হইল না। ইহার কারণ, মন্ত্রদ্রষ্টা যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা বিধাতার আহ্বান যে কাণ পাতিয়া ঠিকই শুনিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু ইহা সিদ্ধ করার সাধনার অভাবে মন্ত্রদানের কার্পণ্যদোষে দেশযজ্ঞের দীক্ষা পূর্ণাহুতি পায় নাই।

বয়কটপ্রতিজ্ঞা রাষ্ট্রব্রতসাধনের ব্রহ্মাস্ত্র বুঝিয়াও তাঁহাদের দেশশক্তির উপর অকপট শ্রদ্ধা ছিল না। তাই তাঁহারা এই মন্ত্র জাতির কর্ণে দিবার পূর্ব্বে শতবার ইংরাজ বন্ধুদের মনোভাব বুঝিবার জন্য গোপন পরামর্শ করিয়াছেন। যে আত্মপ্রত্যয়ের আগুন জ্বলিলে মানুষ আত্মস্থ ও অচল-প্রতিষ্ঠ হইয়া দেশের প্রাণকে অব্যর্থ সিদ্ধির পথে নির্দ্দেশ দিতে পারেন, তাঁহাদের চরিত্রে তাহার অভাব প্রতি পদেই প্রকাশিত হইয়া পড়িত। দেশাত্মার জাগরণ তাঁহাদের বুদ্ধিতে ইংরাজ-শক্তির চিত্তে আতঙ্ক জন্মাইয়া কার্য্যোদ্ধার করা ছাড়া অন্য গভীরতর উদ্দেশ্যসিদ্ধির স্বপ্ন ফলাইয়া তুলিত না। সে আগুন জ্বালাইয়া রাখার জন্য মানুষ যদি কর্ম্মক্ষেত্রে ধূর্জ্জটির মত উন্নত শিরে আসিয়া না দাঁড়াইত, তাহা হইলে ইহার কার্য্যকরী শক্তির আদৌ প্রকাশ পাইত কি না, সন্দেহ। দেশের মর্ম্মবাণী আত্মসংশয়ী পরমুখাপেক্ষী নেতৃগণেরও কণ্ঠে যথাসম্ভব বিধাতা স্বয়ং প্রকাশ করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন ; তাই ইংরাজ জাতি ইহার পূর্ব্বে অসংখ্য সভা-সমিতির প্রস্তাব যেভাবে হাসিয়া উড়াইতেন, বাঙ্গালীর এই অঙ্গীকার বাণী সেভাবে উপেক্ষা করেন নাই। 'Statesman' কাগজে সঙ্গে-সঙ্গেই ভারত গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করার সঙ্কেত বাহির হইয়াছিল—

"The Government will recognise the new note of practicality which the present situation has brought into political agitation."

নেতৃগণ নির্ব্বিবাদে হাতের ঢিল ছুঁড়িয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। আঘাতের লাঠি খাইয়া বাঙ্গালীর সম্মান কিভাবে, কাহারা রক্ষা করিয়াছিল, তাহা ক্রমে দেখাইব।

॥ তের ॥

৭ই আগষ্টের বয়কট-ঘোষণা অগ্নিশিখার ন্যায় বাংলার পল্লীতে-পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িল। প্রতিদিন সংবাদপত্রগুলি বাঙ্গালীর প্রতিজ্ঞাবাণীতে পূর্ণ হইয়া বাহির হইত। সভাসমিতির খবর ব্যতীত, ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতিও বড়-বড় অক্ষরে জাগরণের সাড়া তুলিত। মূকের ভাষা ফুটিয়াছিল, পঙ্গুও সেদিন গিরিলঙ্ঘন অসম্ভব মনে করে নাই।

শিক্ষিত শ্রেণীর এই মহতী উত্তেজনা সীমাবদ্ধ থাকে নাই। চারণের কণ্ঠভেরী পল্লীকৃষক, শ্রমজীবির প্রাণেও আগুন জ্বালিয়াছিল এবং তাহা আর নিভিবার অবকাশ পায় নাই; কেন-না বাঙ্গালীর পণ—বিদেশী দ্রব্যের বর্জ্জন। কাজেই তাঁতী-জোলার কর্ম্মবিহীন শীর্ণ বাহুযুগল আশায়-উৎসাহে আবার সবল হইয়া উঠিয়াছিল, কামারের হাপড়ে আগুন জ্বলিয়াছিল; কুম্ভকার, মালাকর, বাংলার কারিকরশ্রেণীর সুপ্ত প্রতিভা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। যাহারা বেকার বসিয়াছিল, তাহাদের চক্ষেও আশার বিদ্যুৎ খেলিয়াছিল। বিদেশীয় বস্ত্রবর্জ্জনের সঙ্গে-সঙ্গে সে যুগের তরুণ স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি এমন অনুরক্ত হইয়া পড়িল যে, চা খাইবার জন্য চায়ের পেয়ালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া নারিকেলমালা হাতে তুলিয়া লইল। বাংলায় বিশ্বকর্ম্মার কারখানা বসিয়া গেল। কাহাকেও কিছু বলিতে হয় না, সমুদ্রতটের ঝিনুক-কড়ি শার্ট কামিজের বোতাম হইয়া স্বদেশী বাজার সাজাইয়া তুলিল, নারিকেলমালা হইতে কোটের বোতাম প্রস্তুত হইল, কুল-ললনার হস্ত হইতে কাঁচের চুড়ি খসিল, রাশি-রাশি

আলুর চুড়ি ও শাঁখায় বাজার ছাইয়া গেল—হাতের কাছে যাহা সহজে মিলিল, তাহা দিয়াই স্বদেশী পণ্য উৎপাদন করার সে উৎসাহ ভাষায় বর্ণনা করার নয়। ছাত্রগণ, যুবকগণ, কেরাণীগণ প্রকাশ্য সভায় বিলাতী সিগারেট ছাড়িয়া দেওয়ার সঙ্কল্প করা মাত্র বেকার যাহারা বসিয়াছিল, তাহাদের প্রাণে শক্তিসঞ্চার হইল, পথের ধারে ভদ্রসন্তান-গণ পানবিড়ির দোকান খুলিয়া বসিল। কেবল বিদ্যালয়ের ছাত্রই স্বদেশী যুগ সফল করার দায়িত্ব মাথায় বহে নাই, অশিক্ষিত বা অল্প-শিক্ষিত লক্ষ্মীছাড়া তরুণের দলও সেদিন দেখিয়াছিল— তাহাদের ইউনি-ভার্সিটির চাপরাশ লওয়ার বুদ্ধিপ্রতিভা না থাকিলেও, দাসত্বের বন্ধনী গলায় পরিয়া উপার্জ্জনের প্রবৃত্তি না থাকিলেও, দেশের ডাকে সাড়া দেওয়ায়, প্রাণ দেওয়ায়, তাহাদের বাধা নাই ; বরং সে যুগে এই বেকার লক্ষ্মীছাড়ার দলই স্বদেশী যুগের শক্তিস্বরূপ হইয়াছিল, বিধাতা যেন এই জাগরণ-যুগের সেনাবাহিনী-রূপেই তাহাদের গড়িয়াছিলেন। দেশের প্রাণ যখন ঘুমাইয়া থাকে, ইহারা তখন অকাজে-কুকাজে রত হইয়া ব্যর্থ জীবনভার বহন করে। স্বদেশী আন্দোলনে এই শ্রেণীর অসংখ্য কর্ম্মীকে আমরা বড় বড় কাজে নিরবচ্ছিন্ন শক্তি প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি। যেখানেই কোন কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, শিক্ষিত অভিজাতশ্রেণীর লোককে পুরোভাগে রাখিয়া ইহারাই মেরুদণ্ড-স্বরূপ সেখানে সর্ব্বপ্রধান শক্তিরূপে অবস্থান করিয়াছে। যাহাদের আমরা ঘৃণার চক্ষে দেখিতাম, চরিত্রহীন বলিয়া উপেক্ষা করিতাম, মায়ের ডাকে তাহাদের আত্মদানের স্পর্দ্ধা দেখিয়া বাক্-চাতুর্য্য ছাড়া অন্য সকল দিকেই আমরা যে দেশের কাজে তাহাদের তুলনায় কত অক্ষম, কত অশক্ত, তাহা ভাবিয়া লজ্জা পাইতাম। ইহারাই তো সেদিন দেশের সেবায় দিবারাত্রি এক করিয়াছিল, এক

মুষ্টি অন্ন যোগাইতে পারিলে ইহারাই তো সেদিন সকল বন্ধন টুটাইয়া নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম অক্লান্ত পরিশ্রমে সিদ্ধ করিয়া তুলিত। দেশের ছাত্র যারা, তারা যতই স্বদেশীর উত্তেজনায় উন্মাদ হউক, স্কুল-কলেজের যথারীতি নিয়ম মানিতে বাধ্য হইত : কেরাণী কাজ বজায় রাখিয়া আন্দোলনে মাতিত ; ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ী, ব্যারিষ্টার সকলেরই তো কাজ ছিল—কিন্তু হাটে-বাজারে নিরন্তর রৌদ্র-বৃষ্টি মাথায় করিয়া, দেশীয়-বস্ত্র-ব্যবহারে, বিলাতী লবণ-শর্করা বর্জ্জন করিয়া স্বদেশীয়দ্রব্য গ্রহণে ক্রেতাদের ইহারাই অনুরোধ জ্ঞাপন করিত। স্কুল-কলেজের অবকাশে, ছুটির দিনে নেতাদের অবসর হইলে এই অবিচ্ছিন্ন কর্ম্মস্রোতঃ প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করিত, সন্দেহ নাই ; কিন্তু স্বদেশী যুগের অনাহত আগুনে ইন্ধন যোগাইবার জন্য এই লক্ষ্মীছাড়ার দল সেদিন ঋত্বিক্-বেশে দেখা দিয়াছিল—তাহাদের কথা কেহ আজ জানে না, তাহাদের চরিত্রচিত্র কোথাও মিলে না ; কিন্তু স্মৃতির দর্পণে সেই সকল সহকর্ম্মিদের ত্যাগ, বীরত্ব, দেশপ্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের অন্তর হইতে কোনদিন মুছিবার নহে।

কলিকাতায় স্বদেশী ভেরী বাজিল। সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি নয়, বাণী বহন করিয়া দেশব্যাপী আন্দোলন সুরু হইল। সাধ্যে সেদিন যাহা হয়, তাহাই যোগান দেওয়া হইয়াছিল ; কিন্তু স্বদেশিবস্ত্রসরবরাহ একদিনের কথা নহে, বাংলায় তখন কাপড়ের কল ছিল না ; কাজেই কলওয়ালারা বাঁচিয়া গেল, দেশী মিলের ছাপ দিয়া বস্ত্রব্যবসায়ীরা বিলাতী বস্ত্র চালাইতে লাগিল। নেতারা পরীক্ষা করিয়া যে দোকানে স্বদেশী মিলের কাপড় পাওয়া যায়, তাহার নির্দ্দেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু চাহিদার সংখ্যা সেদিন যে অসংখ্য! স্বদেশী নামে বিলাতী বস্ত্রও সমানভাবে বিক্রীত হইতে লাগিল। মাড়োয়ারীর কাপড়ের

গুদামেও ধুম পড়িয়া গেল ; গাঁট হইতে কাপড় ফাঁড়িয়া, মার্কা উঠান ও নূতন ছাপ দিয়া বাজারে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা অবাধেই চলিল। এই সময়ে দেশনেতা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন করার অক্লান্ত পরিশ্রম উল্লেখযোগ্য। ইঁহার চেষ্টায় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কংগ্রেসে এক স্বদেশী শিল্পের প্রদর্শনী হইয়াছিল। বয়কট আন্দোলন আরম্ভ হওয়ামাত্র, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যোগে স্বদেশজাত বস্ত্রশিল্পের প্রসারতা-বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হয়। কলিকাতার স্থানে-স্থানে "ভারত ভাণ্ডার" নামক দোকান যোগেশবাবুর তত্ত্বাবধানে খোলা হইয়াছিল। কিন্তু স্বদেশী বস্ত্র বলিতে বোম্বাই মিলের কাপড় ; আর হাওড়া, ধনিয়াখালি, হরিপাল, কৈকালা প্রভৃতি স্থানের জোলা-তাঁতিদের তাঁতের বস্ত্র ভিন্ন তখন তাঁত-চরকার কথাই ছিল না ; সুতরাং বিলাতী সূতায় দেশী মিল ও তাঁতের কাপড়ই আমরা স্বদেশী বলিয়া খরিদ করিতাম। ৭ই আগষ্টের পর পূজার বাজার আগতপ্রায়। ইহার মধ্যে বাঙ্গালীর প্রতিজ্ঞারক্ষার সুযোগ করা নেতাদের পক্ষে সম্ভবপর হইল না। কিন্তু দেশের জনসাধারণ সেদিন স্বদেশী ব্রতপালনে উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিল —সূতার বিচার না থাকিলেও, পল্লীশ্রমিকদের হাতে তাঁত চলিল, হাটে-হাটে তাঁতিরা কাপড়ের মোট মাথায় উপস্থিত হইল। বর্জ্জন-ব্রত পালনের জেদ দেখিয়া ইংরাজজাতি সেদিন চমকিত হইয়াছিল, পার্লামেন্টের ভূতপূর্ব্ব সভ্য মিঃ ম্যাক্লিন বলিয়াছিলেন, "A resolution to boycott American goods has been passed and acted upon by China. But the Bengal resolution affects a much more extensive trade and is an alarming matter".

এই সময়ে মিঃ হ্যাভেল ও চ্যাটার্টন্‌ ঠক্‌ঠকি তাঁত চালাইতে পারিলে বস্ত্রোৎপাদন সহজ হইতে পারে, এই মন্তব্য প্রকাশ করেন। নির্দ্দেশ কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা সেদিন এমনই উদ্যত ছিল—পরিণাম চিন্তা অনাবশ্যক হইল, ঠক্‌ঠকি তাঁত ঘরে-ঘরে বসিল। সূতার ব্যবস্থা না করিয়া স্বদেশী বস্ত্র কিভাবে উৎপন্ন হইতে পারে, সে কথা তখন ভাবিবার প্রয়োজন হয় নাই; জাতির পীড়িত প্রাণশক্তি নূতন স্বাস্থ্য ও উদ্যম-লাভের সুযোগটুকুতে মুক্তি চাহিয়াছিল, তাই ঘরে-ঘরে ঠক্‌ঠকি তাঁতের ব্যবস্থা হইল। দেশের শ্রমজীবিরা ভদ্র স্বদেশী কর্ম্মিদের জীবনের উপর ভর করিয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া লইল। ঠক্‌ঠকি তাঁত চলে নাই, উত্তেজনার সাড়া তুলিয়াছিল মাত্র। বাংলায় অসংখ্য তাঁত প্রস্তুত হওয়ায় সূত্রধরগণও কাজ পাইয়াছিল। বাংলার দুর্গোৎসবের মত স্বদেশী আন্দোলন সকল শ্রেণীর শ্রমজীবির রিক্তহস্তে কমলার আশীর্ব্বাদদানের মহোৎসব-স্বরূপ সত্যই প্রাণশক্তির উদ্বোধন করিয়াছিল। যে কাজে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হাত নাই, সে কাজ যে দেশের কাজ নয়, সে যে জাতীয় জাগরণের লক্ষণ নয়—বাংলার স্বদেশী যুগের পরিচয় যাহার জানা আছে, সে ইহা বুঝিবে। তাই জাতীয় আন্দোলন—স্বদেশী-শিল্পের প্রতি অনুরাগ হ্রাস পাইলেই তাহা দেশের প্রাণধারা হইতে একান্তই বিচ্ছিন্ন বলিতে হইবে। সুরেন্দ্রনাথ সেদিন তাই বিলাতী বেশ বর্জ্জন করিয়া স্বদেশজাত পরিচ্ছদে বাংলার গ্রামে-গ্রামে বয়কট-মন্ত্র প্রচার করিতে বাহির হইয়াছিলেন।

প্রজার প্রতিবাদে রাজপ্রতিনিধি অটল রহিলেন। ১লা সেপ্টেম্বর তিনি ঘোষণা করিলেন—১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ অবধারিত অনুষ্ঠিত হইবে। রাজাদেশের ঘোষণায় আপাত

পক্ষে ভেদনীতির জয় হইল বটে ; কিন্তু উত্তেজনার অবধি রহিল না। স্কুল-কলেজ হইতে ছাত্রগণ বাহির হইয়া পড়িল। সভাক্ষেত্রে বিলাতী বস্ত্র রাশীকৃত করিয়া আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইল। ঢাকায়, বরিশালে, বাংলার সর্ব্বত্র ইংরাজরাজের এই ঘোষণা-বাণীর বিরুদ্ধে তারস্বরে প্রতিবাদের ধ্বনি উঠিল। হাটে-বাজারে সেবকের দল কাহাকেও বিলাতী দ্রব্য খরিদ করিতে দিল না। স্কুল-কলেজ ছাত্র-শূন্য হইল। কবির কণ্ঠ নূতন ঝঙ্কার তুলিল। রবীন্দ্রের বীণা বাজিল। সাহিত্যের কমলবনেও আগুনের শিখা জ্বলিয়া উঠিল। এই সময়ে আবার সেনাপতি লর্ড কিচনারের সহিত জেনারেল ব্যারো সাহেবের নিয়োগব্যাপার লইয়া লর্ড কার্জ্জনের বিবাদ বাধায়, ভারতের নবযুগ-বিধানের বিধাতা লাট বাহাদুর পদত্যাগ করিলেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদ-রূপেই এই সংবাদ উত্তেজিত দেশের প্রাণে কর্ম্মসাফল্যের শুভচিহ্ন-রূপেই প্রতিভাত হইল। উৎসাহের আর সীমা রহিল না। এদিকে কলিকাতার ছোটলাট বাহাদুর জেলায়-জেলায় বঙ্গভঙ্গনীতির উদ্দেশ্য ও ইহার উপকারিতা শতমুখে গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনমনীয় লৌহদণ্ডের ন্যায় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের এই কায়েমী নীতি কঠোর ও বিশেষ শক্তিসম্পন্ন। দেশের অখণ্ড মতবাদ সেদিন না ভাঙ্গিলেও, একদল লোকের মন যে ভিজিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই ; বিশেষতঃ, আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ স্যার বামফিল্ড ফুলারের সুয়োরাণীর স্থান-লাভের প্রত্যাশায়, এই জাতীয় আন্দোলনে সর্ব্বতোভাবে যোগ দিতে পারেন নাই। অবশ্য প্রাতঃস্মরণীয় রসুল ও লিয়াকৎ হোসেনের ন্যায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইসলামধর্ম্মী জাতীয়-যজ্ঞে হিন্দুর সহিত সমানভাবেই দুঃখ-দুর্দ্দশার কষাঘাত সহিয়া সহকর্ম্মী হইয়াছিলেন।

ইংরাজ-রাজের সকল কর্ম্মই এ দেশের কল্যাণবিধানের উদ্দেশ্যেই যে সাধিত হয়, তাহা প্রচার করার নীতিতে সে যুগেও আজিকার মতই রাজকর্ম্মচারিদের কণ্ঠে সেই এক বাণীই উচ্চারিত হইত। ছোটলাট এণ্ড্রু ফ্রেজার বলিয়া বেড়াইতেন— ...... "That the administration will be better and more efficient and the time will come before long when even most of those who are now trying against partition will be very glad that it tcok place......"

কিন্তু বাঙ্গালীর সে দিনের সঙ্কল্প এই কথায় কোথাও বিচলিত হয় নাই, জাতীয় আন্দোলনক্ষেত্রে যাঁহারা বঙ্গভঙ্গনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনও মত পরিবর্ত্তন করেন নাই— বাঙ্গালীর অভেদ প্রতিজ্ঞা বজ্রাদপি অটুট ও সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। এইজন্য সেদিনের 'settled fact unsettled' হওয়া অসম্ভব হয় নাই।

দেখিতে-দেখিতে অক্টোবর মাসের ১৬ তারিখ আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘোষণানুযায়ী ঐদিন বঙ্গজননীকে যথাসময়ে দ্বিধাবিভক্তা করা হইল। স্বদেশী যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত সুরেন্দ্রনাথ বাংলার নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া সমগ্র বঙ্গে এক নূতন উৎসবের আয়োজন করিলেন। নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরসংযুক্ত ঘোষণাপত্রে বাহির হইল—"৩০শে আশ্বিন বঙ্গবাসীর দেহে নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে। বাঙ্গালী মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছে। সেদিন—

"১। সমস্ত বাঙ্গালী নরনারী, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, কাহারও রন্ধনশালায় অগ্নি জ্বলিবে না।

২। সকলে দুগ্ধ বা ফলাহার করিয়া অথবা সমস্ত দিন উপবাস করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবেন এবং যিনি রাজার উপরে

রাজা, পতিত জাতির উদ্ধারকর্ত্তা, দেশের মঙ্গলের জন্য তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিবেন।

৩। বঙ্গের প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান সকলে একত্র হইয়া মহাব্রত গ্রহণ করিবেন।

(ক) বিদেশিদ্রব্যবর্জ্জন। (খ) স্বদেশিদ্রব্যব্যবহার। (গ) স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদনে আপন শক্তি ও অর্থনিয়োগ (যথা, কলকারখানাস্থাপন, গৃহে-গৃহে চরকার প্রচলন ইত্যাদি।

৪। সেদিন সমস্ত বঙ্গবাসী স্নানান্তে পরস্পরের হস্তে "রাখী-বন্ধন" করিবেন এবং চিরদিন সুখে-দুঃখে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গবাসী সমুদায় হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান পরস্পরের সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন।"

বাঙ্গালী সেদিন উন্মাদ। নগরের রাজপথে, পল্লীর হাটে-মাঠে, সারি দিয়া অসংখ্য তরুণ হরিদ্রাবর্ণের উষ্ণীষ মাথায় শোভাযাত্রায় বাহির হইয়াছে, স্বদেশপ্রেমের মাদকতায় নেশাখোরের মত, উন্মত্তের মত নগ্নপদে, অনাবৃত অঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশসঙ্গীত গাহিয়া বেড়াইতেছে—

"ভাই-ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই"

মাতৃমন্ত্র গাহিতে-গাহিতে, কোটী চক্ষে অশ্রু উথলিয়া প্রীতির অনুরাগে সে যে কি মধুময় আবেশ, কি অনির্ব্বচনীয় অমৃতানুভূতি, যে না পাইয়াছে, মৃন্ময়ী জননীর চিন্ময়ী মূর্ত্তি দর্শন করা তার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। মাতৃপ্রেমের অফুরন্ত সুধাপানে বিভোর হইয়া কোটী নরনারী যুক্তকরপুটে মঙ্গলাশিস্ প্রার্থনা করিতেছে—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,

পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান্‌!
বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ,
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক, হে ভগবান।
বাঙ্গালীর পণ, বাঙ্গালীর আশা,
বাঙ্গালীর কাজ, বাঙ্গালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান!
বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন,
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই-বোন,
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান!"

আর মায়ের চরণরেণুর পরশদান মাথায় ছোঁয়াইয়া—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই"

বলিয়া অপূর্ব্ব নবজীবনের সঞ্চার, সরল, স্বাভাবিক প্রাণের পরতে-পরতে অনুভব করিয়া, নূতন প্রেরণার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ভরিয়া উঠিয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি সেদিন স্বদেশ-প্রেরণার উৎস, সেদিন সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এদিনকার রাজপারিষদগণও উৎসাহবক্ষে, নগ্নপদে ইংরাজের বঙ্গভঙ্গ-বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা" বঙ্গললনাকুলকে মাতাইয়াছে।

দেশের ডাক বিধাতার আদেশের ন্যায় দেশবাসীর প্রাণে গিয়া বাজিল। ১৬ই অক্টোবর, কলিকাতার রাজপথে উষা সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইল। গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থীর ভীড় দেখিয়া ইহা যে যুগের হাওয়া, তাহাতে আর কাহারও সংশয় রহিল না। বাংলায় এমন নগর, গ্রাম, জনপথ ছিল না, যেখানে "রাখীবন্ধন উৎসবের" কোলাহল উঠে নাই; এমন তরুণ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যে সেদিন দেশের কাজে উদাসীন ছিল—আজ সে শুভদিনের কথা স্মরণে আনিয়াও উৎসাহ পাই, আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠে। শরতের প্রভাত-সমীরণ সারা রাত্রির ক্লান্তি দূর করিতেছিল। পল্লীপথ মুখরিত করিয়া দেশের জয় দিতে-দিতে যখন খোল-করতাল সহযোগে আমাদের শোভাযাত্রা চলিতেছে, সেদিন এক কিশোর বালককে দ্রুত পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখি—তাহার চক্ষে কি দীপ্তি, অধরে কি প্রফুল্ল হাসি! একমুঠা গাঁদা-ফুল অতি উৎসাহের সহিত আমাদের মাথার উপর ছুঁড়িয়া সে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"বন্দেমাতরম্"। এই বালক কানাইলালই স্বদেশ-যজ্ঞের মহাবলি-রূপে পরে জগৎপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

ইহা ব্যতীত কুল-ললনাদের বাতায়নপথে সোৎসুক দৃষ্টি, তাঁহাদের সস্নেহ নীরব সম্বর্দ্ধনা—অন্তঃপুর পর্য্যন্ত জাগরণের স্বপ্নে দেশের প্রাণ যে মাতিয়া উঠিতেছে, তাহা তাঁহাদের উলুধ্বনির সাথে শঙ্খনিনাদে ঘোষণা করিয়াছিল। আর একটী পবিত্র চিত্র স্মৃতির মধ্যে বড় জাগরূক হইয়া আছে—কোন এক সম্ভ্রান্ত গৃহের চিন্তাশীল প্রবীণ, যাঁহাকে সর্ব্বদাই আমরা স্থির গম্ভীর মূর্ত্তিতে সকল ব্যাপারে উদাসীন দেখিতাম, সাহস করিয়া কথা কহিতে ভরসা হইত না, তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে "রাখী উৎসবের" শোভাযাত্রা যাওয়া মাত্র, পল্লীপথে সঙ্কীর্ত্তনের

সম্মুখে ভক্তের মত তাঁহাকে এক অঞ্জলি প্রস্ফুটিত শেফালিকা লইয়া, দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম! আমাদের গতি স্তম্ভিত হইল। দেশের বন্দনা দুইবাব পুনবাবৃত্তি করিয়া গাওয়া হইল। তারপর বৃদ্ধ অশ্রুপূর্ণ নয়নে পুষ্পাঞ্জলি আমাদেব মাথার উপর আশীর্ব্বাদেব মত ছড়াইয়া পথ ছাড়িয়া দিলেন। এ দৃশ্য প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করার ভাগ্য যাহার হয় নাই, সে বুঝিবে না—দেশের প্রাণ সেদিন কত গভীরে, কোন গোপনপুরে গুঞ্জরিযা উঠিয়াছিল।

কলিকাতায় উৎসাহেব সীমা ছিল না। দেশবরেণ্য সন্তান আনন্দমোহন বসু তখন উত্থানশক্তি-রহিত বোগশয্যায়। তাঁর শিরায়-শিরায় সেদিন যে বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্য নাই। "রাখীবন্ধনের" উৎসবক্ষেত্রে তাঁহাকে সভাপতি-পদে বরণ করা হইলে, দেশযজ্ঞে জীবনের শেষ অর্ঘ্য-সমর্পণের জন্য তিনি শয্যাশ্রয় কবিয়াই সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তাঁর প্রাণের আকুল বাণী লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গনীতির প্রতিবাদ করিতে গিয়া ইহার পূর্ব্বেই আমাদের কর্ণে নূতন ধ্বনি তুলিয়াছিল। সে যুগে দেশপ্রেমিকের কণ্ঠে যে ভাষা বাহির হইত, তাহা নব ঋকের ন্যায় এ যুগের তরুণকে দেশব্রতপালনে নবশক্তি দিবে, এই আশায় তাঁর হৃদয়বাণীর অগ্নিমন্ত্রই এখানে উপহার দিলাম :—

"Lord Curzon has done us indeed a signal service and enabled us to lay the priceless foundation of our new national life, if we are only true to ourselves and carry on the work which we have begun······the time has fully come when we must translate all this grim determination into action and God helping, so translate we

shall. Take this vow and resolve my friends. If the bolt has fallen on us, let us not forget the grace, grandeur and beauty of the Lord as manifest in thunder as it is in the gentle dew."

দেশকে হিন্দু-মুসলমান ধর্ম্মভেদেও অভেদ দেখার নির্দ্দেশ দিয়া তিনি বলিয়াছেন—"Brotherly union between Hindus and Mahommedans. Let us love all Bengalees and feel the solidarity of fraternal union amongst all our people."

মনীষী আনন্দমোহন মৃত্যুশয্যায় এই বিরাট্ আন্দোলন নবজাতিনির্ম্মাণের সূচনারূপেই দেখিয়াছিলেন। তাঁর কথা :—

"Our present troubles herald a new birth ; we are going to see the birth of a nation and be the joy and glory ours to work, God willing, to bring on that happy and auspicious day."

এই ঋষি-দৃষ্টি, বাংলার এই শুভদিনের স্বপ্ন ব্যর্থ হইবার নয়।

সুরেন্দ্রনাথ স্বর্গত তারকনাথ পালিত ও স্বামীজীর মানসকন্যা ভগ্নী নিবেদিতার সহিত পরামর্শ করিয়া বঙ্গভঙ্গনীতির বিরুদ্ধে জাগ্রৎ স্মৃতিসৌধনির্ম্মাণের ব্যবস্থায়, "রাখীবন্ধনের" দিন জাতীয় ধনভাণ্ডারগঠনের আহ্বান দিয়াছিলেন। এই সভায় সহস্র-সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিল। আনন্দমোহন বসুকে যখন শয্যাশ্রয় করিয়া সভাক্ষেত্রে উপস্থিত করা হইল, তখন জনসমুদ্র উত্তেজনার গর্জ্জন তুলিল। সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত "মিলনমন্দির"-গঠনের সমর্থন করিয়া আনন্দমোহনের উক্তি একজন উচ্চকণ্ঠে জনগণের কর্ণগোচর করিয়া দিল। তার পর স্যার আশুতোষ ইংরাজী ভাষায়
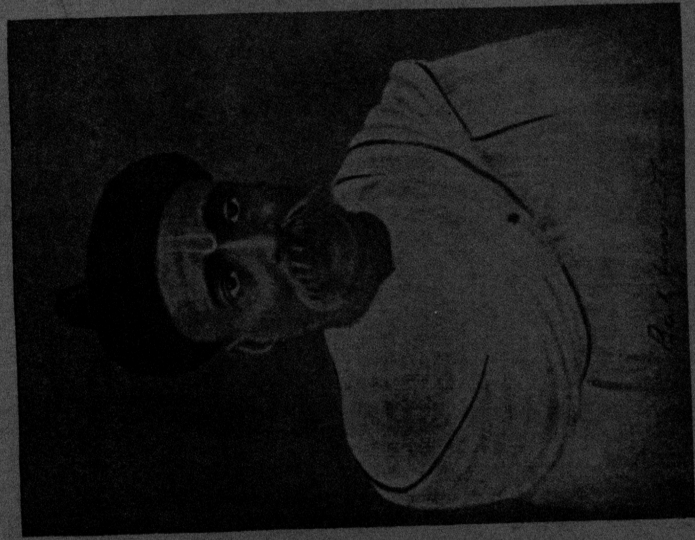
বালগঙ্গাধর তিলক ॥ ১৮৫৬-১৯২০

দাদাভাই নৌরজী ॥ ১৮২৫-১৯১৭

ইংরাজরাজের বঙ্গভঙ্গনীতির বিরুদ্ধে ঘোষণা করিলেন, কবি রবীন্দ্রনাথ তাহা মাতৃভাষায় সকলকে শুনাইয়া দিলেন। বঙ্গভঙ্গনীতির বিরুদ্ধে জাতীয় ঘোষণা-বাণী "মিলনমন্দির"-গাত্রে খোদিত করার আর প্রয়োজন হয় নাই; তবে যে বাণী জাতির কণ্ঠে সেদিন হুঙ্কার দিয়াছিল, তাহা বাংলার ইতিহাসে চির অঙ্কিত থাকিবে :—

"Whereas the Government has thought fit to effectuate the partition of Bengal in spite of the universal protest of the Bengalee nation, we hereby pledge and proclaim that we as a people shall do everything in our power to counteract the evil effects of the dismemberment of our province and to maintain the integrity of our race. So God help us."

"সাতকোটী বাঙ্গালীর এক-মতকে পদদলিত করিয়া রাজকর্তৃপক্ষ যখন বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করাই স্থির করিলেন, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে এই ভেদনীতির কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য জাতির অখণ্ড একত্ব ঘোষণাপূর্ব্বক আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম—আমরা ভাই-ভাই এক রহিব। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।"

নব্য বঙ্গের অন্যতম নির্ম্মাতা, দেশগতপ্রাণ, উচ্চহৃদয়, আদর্শনিষ্ঠ এই মহাপ্রাণ স্বদেশী যুগের আবাহন করিয়াই অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যখন তিনি মৃত্যু-শয্যায়, বাংলায় তখন মরাগাঙে বান আসিয়াছে, মিলনের মহোৎসবে বাঙ্গালী মাতোয়ারা। তাঁর সাধের "মিলন-মন্দিরের" (Federation-Hall)

ভিত্তিপ্রতিষ্ঠায়, পাল্কী-চেয়ারে করিয়া তিনি অতি কষ্টে উঠিয়া আসিলেন—হায়, শেষ শুদ্ধ নিঃশ্বাসটুকু দিয়া বাংলার নবজাতিকে আশিস্ না করিয়া তিনি মরিবেন কিরূপে! মরণকালেও দেখা গেল—তাঁর বুকে, মর্ম্মের মর্ম্মমধ্যে যাহা লুকান ছিল—গীতা নয়, চণ্ডী নয়—একখানি রেশমী পটীতে আঁকা—"বন্দেমাতরম্।" সার্থক সিষ্টার নিবেদিতা তোমায় "বাংলার নাগরিকশ্রেষ্ঠ" (The first citizen of Bengal) বলিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছিলেন—দেশধ্যান, দেশপ্রেম-সাধনার তুমি একটী পবিত্র নয়নমণি!

আজ আনন্দমোহন স্বর্গগত। তাঁর আত্মার তৃপ্তি—বাঙ্গালী বঙ্গ-ভঙ্গ রোধ করিতে যে সঙ্কল্প সেদিন গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার জন্য প্রাণবলি দিতেও কুণ্ঠা করে নাই।

উক্ত ঘোষণাবাণী পাঠ করার পর, জনসমুদ্র উৎসাহপ্রমত্ত হইয়া জাতীয় ধনভাণ্ডারস্থাপনের ক্ষেত্র সভার স্থান হইতে এক ক্রোশ দূরে হইলেও, নগ্নপদে রায় পশুপতিনাথ বসুর বাটীর দিকে ধাবিত হইল। ভিক্ষুক যে, সে অর্দ্ধপয়সাও দেশের ভিক্ষার ঝুলিতে উৎসর্গ করিয়াছিল। একদিনের উপার্জ্জনদানের আহ্বান ছিল, মানুষের কার্পণ্য ছিল না—কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হইল। দেখা গেল—৭০,০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

বহিষ্কার-ব্রত বাঙ্গালী প্রাণ দিয়া বরণ করিয়া লইল। বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করা ক্রমে আতঙ্কের বিষয় হইল। পথে-ঘাটে বিলাতী কাপড় কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেখিলে, শতকরা ৯০ জন লোক তাহার বিরুদ্ধ হইয়া উঠিত। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যেই অধিক উৎসাহ দেখা যাইত। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় স্বদেশজাত বস্ত্র ব্যবহার করিতে একপ্রকার সকলেই বাধ্য হইয়া পড়িত। ট্রামে, রেলগাড়ীতে,

ষ্টীমারে, যাত্রীদল পরস্পরের পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টি রাখিত ; বিদেশী বস্ত্রের পরিচ্ছদ কাহারও অঙ্গে দেখিতে পাইলে, .তাহার আর লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। দেশমাতৃকার আদেশলঙ্ঘনকারী দেশদ্রোহী বলিয়া সে গণ্য হইত। সে দিন আর এ দিন—দেশপ্রীতির মহিমাবোধ ফল্গুধারার ন্যায় হয়তো অন্তপ্র্বাহী ; কিন্তু আজ প্রকাশ্য ক্ষেত্রে দেশপ্রীতির পরিচয় দেওয়া সেদিনের ন্যায় সুলভ নহে, একপ্রকার বিপরীত অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। এক্ষণে আর্টের দোহাই দিয়া অনেক মার্জ্জিতবুদ্ধি বাঙ্গালী বিলাতী সূতার সূক্ষ্মবস্ত্র গর্ব্বের সহিত পরিধান করে, সেদিনের মত তাহাদের আর লাঞ্ছিত হওয়ার ভয় নাই।

প্রসঙ্গচ্ছলে একটী ঘটনার উল্লেখ করিব। হাওড়া হইতে রেলগাড়ী ছাড়িবামাত্র, একটী কামরায় কোন ভদ্রলোককে White-away Laid-Law কোম্পানীর দোকান হইতে একটী ইস্ত্রি-করা জামা খরিদ করিয়া লইয়া যাইতে দেখা যায়। সহযাত্রীরা বার-বার কটাক্ষপাত করিয়া, প্রথম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন তিনি বিলাতী জামা খরিদ করিয়াছেন ? দেশের বাণী অবজ্ঞা করার এই অপরাধের কঠিন শাস্তির ফলও তাঁহাকে জানাইয়া দেওয়া হইল। ভদ্রলোক অনেক তর্ক করিলেন। গাড়ীর সমস্ত লোক একপক্ষে, অন্য পক্ষে তিনি একা ; তাঁহার অপমানের সীমা রহিল না। হাওড়া-ভদ্রেশ্বর পর্য্যন্ত তিনি সকলের নিকট হইতে অশেষ লাঞ্ছনা সহিয়া পরিশেষে ধৈর্য্যহীন হইলেন, নিজেই জামাটী ক্রোধে-দুঃখে টুক্‌রা-টুকরা করিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। স্বদেশী দ্রব্যব্যবহারের এইরূপ জয় সেদিন বড় গর্ব্বের বিষয় ছিল ; ভদ্রলোক যখন শপথ করিলেন আর কখনও তিনি বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিবেন না—"বন্দেমাতরম্"-

ধ্বনিতে কর্ণ বধির হইয়া গেল। দুইদিন পরে এই ঘটনার কথাও সংবাদপত্রের স্তম্ভে বাহির হইল। এমনই উত্তেজনার সহিত স্বদেশী যুগ অজস্র ধারায় বহিয়া চলিতেছিল। প্রত্যেকেই সেদিন চারণব্রতী, স্বদেশীপ্রচারের অধিকার কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়-বিশেষের উপরই নির্ভর করিত না—এইজন্য বাংলার বয়কট আন্দোলন ষোল আনা সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

ইংরাজী সংবাদপত্রে বাংলার বয়কট আন্দোলন লইয়া গভীরভাবে আলোচনা চলিতে লাগিল। বিষয়টির গুরুতর ভঙ্গী কেহই উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না। ম্যানচেষ্টারের বণিক্‌গণ মাথায় হাত দিয়া বসিল, লিভারপুল হইতে বস্ত্র-ব্যবসায়িগণ বিচলিত হইল; কেননা, ভারতের কলওয়ালারা যে সকল সামগ্রী খরিদ করার ব্যবস্থা করিয়াছিল, বাংলার আন্দোলন দেখিয়া তাহারা ইহা গ্রহণ করিতে চাহিল না। বিলাতের বেকার-সমস্যা আসন্ন হইয়া পড়িল। বাঙ্গালী ইংরাজ জাতির পকেটে হাত দিবার উপক্রম করায়, ইংলণ্ডের বণিক্‌সমাজ প্রমাদ গণিল। একান্ত রাজকর্তৃপক্ষ ব্যতীত ইংরাজপরিচালিত সংবাদপত্রগুলিতেও লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গনীতি ঘোরতর অন্ধতা বলিয়া স্বীকৃত হইল। মহামতি গোখ্‌লে বলিলেন, "It is a great political blunder to make the people realise their helplessness as the Government has done in this case." "মর্ণিং-পোষ্ট" লিখিলেন, "The people of Bengal, baffled in all their attempts to make their protest avail by other means, have now united to adopt the method of Boycott, that particular weapon, and we are not among those who profess to smile at it."

সেদিনের আন্দোলন হাসিয়া উড়াইবার বস্তু ছিল না, জাতির সমগ্র প্রাণশক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কুলী, মজুর, ভিক্ষুক পর্য্যন্ত বয়কট আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল। শাসন-কর্ত্তৃপক্ষগণ বিজিত জাতির নিকট এতদিন অবনত শিরে অভিবাদন লাভ করিত। কিন্তু স্বদেশী যুগের প্রভাব কি এক অলৌকিক শক্তি সঞ্চার করিয়া জাতির সুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগাইয়া দিল। রেল-ষ্টেশনে স্বয়ং স্যার ব্যামফিল্ড ফুলালের মোট বহিবার সেদিন কুলী পাওয়া যায় নাই। আত্মচেতনার উন্মেষে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি ইংরাজশক্তির বিজাতীয় প্রতিশোধ কেমন করিয়া লইতে হয়, বাঙ্গালী সেদিন সে স্পর্দ্ধা সর্ব্বতোভাবে প্রদর্শন করিয়াছিল। সে জাতীয় স্পর্দ্ধা আজিও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, ফাঁসী-কাষ্ঠের আতঙ্কেও বাঙ্গালী স্বজাতি-গৌরবের দৃঢ় ভিত্তি হইতে এক পদ অবনত হয় নাই। স্বদেশী যুগের যবনিকা পড়িয়াছে, জাতীয় মাহাত্ম্যবোধ কিন্তু জাতিকে মহাবীর্য্য প্রদান করিয়াছে; বাঙ্গালীর মাথা আর নত হইবার নয়।

বৈদেশিক বণিকেব কাঁচ বিক্রয় করিয়া স্বর্ণপ্রসূ ভারতের রত্না-পহরণের নীতি গোড়া হইতেই বাঙ্গালী কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের রাজত্বকালে, নবদ্বীপের এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া সপ্তশৃঙ্গ পর্ব্বতে অবস্থান করিতেন। তিনি গৌড়পাদ স্বামী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রের বহু সম্ভ্রান্ত লোক ইঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। ধর্ম্মবীর এই গৌড়পাদ স্বামীর শিষ্য। স্বামীজী বিদেশীয় পণ্যবর্জ্জনের সঙ্কল্প লইয়া, সমগ্র ভারতে বহিষ্কার-মন্ত্র প্রথম প্রচার করেন। তিনি ভারতের হিন্দু-মুসলমানকে অসাধারণ বাগ্মিতা-প্রভাবে একযোগে বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করিতে অনুপ্রাণিত করেন। তাহার ফলে

বোম্বাই ও বঙ্গদেশ হইতে বিখ্যাত ফরাসী কোম্পানী অষ্টেণ্ড নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। রাজা-প্রজা একযোগে সেদিন জর্ম্মণ, ফরাসী, ডাচ ও ইংরাজ পণ্যের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসীর বহিষ্কার-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ভারতের সম্পদ্ রক্ষা করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। আবার বাংলার ব্রাহ্মণ সুরেন্দ্রনাথ বহিষ্কার-মন্ত্রে বাঙ্গালীকে দীক্ষা দিলেন।

কিন্তু সে দুর্দ্দিনে আত্মরক্ষায় উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালীর পক্ষ-সমর্থনে, পরবর্ত্তী জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে, সভাপতি ৺গোখলে মহোদয়ও এই মর্শ্মে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন:—"অমঙ্গলেও মঙ্গল হয়, বঙ্গে যে দুর্দ্দিন যাইতেছে, তাহার এই শুভফল প্রত্যক্ষ করিতেছি। ইংরাজ রাজত্বে এই প্রথম সর্ব্বশ্রেণীর ভারতবাসী জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে এক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া একযোগে রাষ্ট্রকার্য্যে যথেচ্ছাচারের প্রতিবিধানে যত্নপর হইয়াছে। সমগ্র প্রদেশে অপূর্ব্ব জাতীয় ভাবের উন্মেষ হইয়াছে······এই ব্যাপ্যার উপলক্ষ্যে এ দেশের প্রজাসাধাবণ যে শক্তি লাভ করিল, তজ্জন্য বঙ্গবাসীর নিকট সমগ্র ভারত চির কৃতজ্ঞ থাকিবে। আমি আশ্বাস দিতেছি, অদ্য সমগ্র ভারতবাসী বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠপোষকরূপে দণ্ডায়মান। বাংলার নেতৃগণ স্মরণ রাখিবেন যে, তাঁহাদিগের হস্তে সমগ্র ভারতের সম্মান সংন্যস্ত রহিয়াছে।" ঐ যুগেও এই বয়কট-মন্ত্রের সমর্থন মহারাষ্ট্রের নেতৃমণ্ডলীর নিকট হইতে যেরূপ আন্তরিকতার সহিত পাওয়া গিয়াছিল, ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে সেরূপ প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় নাই। বাংলার বহিষ্কার-ব্রত যদি সেদিন নিখিল ভারতের ব্রত-স্বরূপ হইত, তাহা হইলে আজ ভারতরাষ্ট্রের আকার অন্যরূপ হইত, সন্দেহ

নাই। কংগ্রেস কেবল বঙ্গভঙ্গনীতির প্রতিবাদ করিয়াই সেদিন কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছিল ; বাংলার বয়কট আন্দোলন বাঙ্গালীর পালনীয় বলিয়া নিখিল ভারতরাষ্ট্র নীরব হইয়াছিল। বাঙ্গালীর পণ কিন্তু বাঙ্গালী পূর্ণ ভাবেই সেদিন পালন করিয়াছে।

সত্যই সে মহাজাতীয় আন্দোলনে সেদিন সমস্ত বাংলার অন্তরাত্মাই হুঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে—কবি, সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী, শিল্পী, জমিদার, রাজন্যবর্গ হইতে সামান্য দিনোপজীবী পর্য্যন্ত, বাংলার যে যেখানে হৃদয়বান্ মনীষী ছিলেন, সকলেই প্রাণের তারে কিসের সাড়া অনুভব করিয়া, দেশযজ্ঞে স্ব-স্ব আহুতি লইয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন—জাতির মর্ম্ম ভরিয়া এক অভেদ, অনির্ব্বচনীয় মাতৃ-সত্তার অনুভূতি তর-তর প্রবাহে মহৎ ও অণু সকলকেই ভাসাইয়া, পুণ্যস্নাত করিয়া দিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ এই বিরাট্ আন্দোলনের সুদূরগামী ব্যাপকতা অন্তর্দৃষ্টি দিয়া উপলব্ধি করিয়া পরে ইহার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন—"the chief current of a world-wide revolution"—জগৎপ্লাবী মহাবিপ্লবের ইহাই মূল প্রবাহ। বঙ্গভঙ্গ-রোধের সহিত বাঙ্গালীর এই পণ শিথিল হইয়া পড়ে। মন্ত্রশক্তি কিন্তু নির্ব্বীর্য্য নয় ; বিদেশীয় পণ্যবর্জ্জনের প্রেরণা জাতিকে যুগে-যুগে উদ্বুদ্ধ করিয়া একদিন মহাসিদ্ধি প্রদান করিবে—ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, জগদিন্দ্রনাথ, মহারাজ মণীন্দ্র নন্দী, আব্দুল রসুল, পশুপতি নাথ, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ও স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র সেদিন সভায়-সভায়, গৃহস্থের দ্বারে-দ্বারে বিতরিত হইত, উহা এই ক্ষেত্রে অবিকল লিপিবদ্ধ করিলাম।

প্রতিজ্ঞাপত্র

"আমি স্বদেশীর নামে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এখন হইতে ধর্ম্মে ও সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে এবং সাধারণ সমবেত অনুষ্ঠান বা উৎসবাদিতে ব্যয়সাধ্য আমোদ-প্রমোদ কি অন্যান্য সমারোহ বা আড়ম্বরের বাহুল্য আয়োজন করিব না। যে ক্ষেত্রে একেবারে বন্ধ করা অসম্ভব, সে ক্ষেত্রে তাহার যথাসম্ভব সংক্ষেপ ও সঙ্কোচ করিব।

ইহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, খাঁটি লৌকিকতা হিসাবে আদান-প্রদান এবং কোন পণ গ্রহণ করিব না।

এই সূত্রে যে অর্থ বাঁচিবে, যথাসম্ভব তাহা তৎকালেই কোন স্বদেশী কাজে বা কোন জাতীয় ধনভাণ্ডারে অর্পণ করিব।"

আজিকার দিনে নেতৃমণ্ডলীর আদেশ-পত্র যেরূপ লঘুভাবে গ্রহণ করা হয়, সেদিন সে ভাব ছিল না; দেশনেতৃগণের আজ্ঞা পালন করা অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। স্বদেশব্রতীরা সে যুগে সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ হইতে অজস্র উৎসাহ ও ভাগবত প্রেরণার বাণী শুনিত। তিনি যখন বলিতেন—"We feel that ours is a divine mission. We feel in this great work that we are humble instruments in divine hands."—তখন সত্যই অন্তরে নবশক্তি সঞ্চার করিত, ধমনীতে-ধমনীতে আগুন ছুটিত।

বিলাতের বণিকেরা হাহাকার আরম্ভ করিল, ম্যানচেষ্টারের তাঁতীরা অভিযোগের কান্না যুড়িয়া দিল। ইংরাজ বণিকের যাবতীয় মুখপত্র শাসন-কর্ত্তৃপক্ষগণের এইরূপ হঠকারিতার নিন্দা প্রচার করিতে লাগিল। রাজশক্তির মর্য্যাদা যায়; কাজেই শাসনশক্তি রুদ্রমূর্ত্তিতে দেখা দিল। রাজকর্ত্তৃপক্ষগণের রক্তচক্ষুঃ দেখিয়া কেহ ভয় খাইল না। স্বদেশ-যজ্ঞের পুরোহিত সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে বিষাণ

বাজিল। তিনি বলিলেন, "We desire to tell our rulers that repression will not daunt us; on the contrary, it will strengthen our moral fibres, stimulate our self-sacrifice and call forth all that is great and manly in our nature." তাঁর এই বেদধ্বনি সত্যের মূর্ত্তি লইয়া বাঙ্গালীর জীবনে যে প্রত্যক্ষ-রূপে দেখা দিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ছাত্র-জীবনের ক্ষেত্র হইতে স্বদেশীর অঙ্কুর নির্ম্মূল করিতে রাজপুরুষেরা বিশেষভাবে উদ্যত হইলেন। সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর শাসন চলিতেছিল পূর্ব্ববঙ্গে। স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার নির্য্যাতননীতির অগ্রদূত হইয়াছিলেন। তিনি ছাত্রগণের কণ্ঠে "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র যাহাতে আর উচ্চারিত না হয়, তাহার নানারূপ ব্যবস্থা করিলেন। স্বদেশীপ্রচার অপরাধ-রূপে গণ্য হইল। ছাত্রগণকে ধৃত করিয়া তাহাদের পৃষ্ঠে চাবুক পড়িতে আরম্ভ করিল। নির্য্যাতনের কথা সংবাদ-পত্রে প্রচারিত হওয়া মাত্র, দেশে উত্তেজনার আগুন ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। রাজকর্ত্তৃপক্ষগণ সেদিকে দৃষ্টি দিলেন না। সভা-সমিতি-বন্ধের আদেশ বাহির হইতে লাগিল, স্বদেশী কীর্ত্তন বাহির করা নিষিদ্ধ হইল। শাসননীতির চরম ফল প্রথম বরিশালে দেখা গেল। রংপুর বাদ গেল না। ময়মনসিংহে উত্তেজনার বান ডাকিল। রাজপুরুষগণের শাসনদণ্ড অবাধে চলিল। সিরাজগঞ্জে অরাজকতা দেখা দিল, হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানের অত্যাচার সুরু হইল। স্যার ফুলারের এদিকে দৃষ্টিপাত নাই; বরং রসিকতা করিয়া তিনি বলিলেন—তাঁহার সুয়ো-দুয়ো দুই রাণী—মুসলমান যে তাঁর প্রিয়াপত্নীস্বরূপ, এইরূপ নির্লজ্জ ঘোষণা তিনি অনায়াসেই করিলেন। প্রশ্রয় পাইয়া অশিক্ষিত মুসলমান প্রজা

হিন্দুদ্বেষী হইল। বাংলায় সম্প্রদায়গত বিরোধের মূলে এই প্রশ্রয় চিরদিন অনৈক্য সৃষ্টি করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিয়াছে।

স্বদেশীর প্রবল গতি রুদ্ধ করিবার জন্য গোড়া হইতেই রাজ-কর্ত্তৃপক্ষগণ সচেষ্ট ছিলেন। কার্লাইল ও লিয়ন সাহেবের "এ্যান্টি-স্বদেশী" সার্কুলার দমননীতির প্রথম নমুনারূপে প্রচারিত হইয়াছিল। তারপরে কুখ্যাত রিজলী সার্কুলার, উহাই ইন্ধনস্বরূপ, বাংলার তরুণ জীবনে গোলামখানার কুশিক্ষার বিরুদ্ধে যে ধূমায়িত বিতৃষ্ণা, তাহাকে জাগাইয়া জাতীয় শিক্ষার নবায়তনপ্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল। সেদিন কলিকাতার ছাত্রমহলে যে তুমুল জাগরণ-চাঞ্চল্য, বাংলায় আর একবার চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে এদিনে যে উৎসাহদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কেবল ইহারই সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। ১৯০৬ সালের ১৪ই আগষ্ট ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে "বঙ্গীয় শিক্ষা-পরিষৎ" সংস্থাপিত হয়। আমাদের যতদূর স্মরণ আছে, রংপুরেই প্রথম জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় —পরে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অঙ্গাধীনতায়, বাংলার বিভিন্ন জেলায় এইরূপ অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতায় নেতৃগণের উদ্যোগে একটী "জাতীয় ধনভাণ্ডারও" (National Fund) আরম্ভ করা হয়। সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে।

সার্কুলারের পর সার্কুলার বাহির হইতে লাগিল। বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণের উপরেই আক্রোশ অধিক প্রকাশ পাইত। আমরা এখানে এন্টি-স্বদেশী সার্কুলার হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম, ইহা হইতে সে যুগের রাষ্ট্রনীতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইবে :—

"Unless the school and college authorities and teachers prevent their pupils from taking public action in connection with political questions or in connection with boycotting, picketing and other abuses associated with the Swadeshi Movement, the schools and colleges concerned will be called on to forfeit grant-in-aid and privilege for competing for scholarships and the University will disaffiliate them. Should there be any reasonable apprehension of disturbances on the part of school-boys, it will be necessary to call on the teachers and managers of institutions for assistance in keeping the peace by enrolling them as special constables."

আন্দোলন-যজ্ঞে ইহা হবিঃ-প্রদানের ন্যায় আগুন অধিক প্রজ্জ্বলিত করার ইন্ধন সংযোগ করিল। সুরেন্দ্রনাথ রাখী সভায় জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের কর্তব্য নির্দ্দেশ করিলেন। ভগ্নী নিবেদিতার কণ্ঠে ইহার সমর্থন-বাণী উচ্চারিত হইল। সন্ন্যাসী উপাধ্যায় গোলামখানার উচ্ছেদকামনায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। গ্রামে-গ্রামে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের উৎসাহবাণী ছাত্রজীবন চঞ্চল করিয়া তুলিল। রঙপুর, ঢাকা, মেদিনীপুর ও হুগলী জিলার ছাত্রগণ সর্ব্ব প্রথমে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইল। এই সময়ে লিয়ন সার্কুলার বাহির হইল। তাহার শেষভাগে দুই ছত্র লেখা আবার নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি করিল, "Anyone who compels another against his wish to buy country-made goods, is guilty under law."

এতদিন অবাধে বিপুল স্পর্দ্ধায় বিদেশী বস্ত্রক্রেতাদের উপর আক্রোশ ও লাঞ্ছনাপ্রকাশের সুবিধা ছিল, গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ-পত্র পিকেটিং করার পথ বন্ধ করিতে উদ্যত হইল। সে সব কালা-পাহাড় এতদিন স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রভাব-বশতঃ দায়ে পড়িয়া বিদেশী পণ্য খরিদ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিত, গবর্ণমেণ্টের সাহায্যহস্ত প্রসারিত হওয়া মাত্র সেরূপ এক দল লোকের স্বরূপ বাহির হইয়া পড়িল। অনুরোধ বলপ্রয়োগ-রূপে গণ্য হইয়া, কোথাও-কোথাও স্বদেশব্রতিগণ আইনের ফাঁদে বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল। অবাধ উত্তেজনা-প্রবাহ অকস্মাৎ প্রবল বাধার সম্মুখে ক্ষোভে-রোষে আস্ফালন যুড়িয়া দিল। দেখিতে-দেখিতে অশান্তির আগুন দেশব্যাপী হইল। স্বদেশমন্ত্র বিপ্লবের বেশে জাতিকে অগ্নিশুদ্ধ করিয়া লইল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ এইরূপে শেষ হইল। দেশের প্রাণ সেদিন বারণ মানে নাই। লর্ড কার্জ্জন ও স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার যে স্বদেশী আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনাশ সম্ভাবনা গর্ব্বভরেই করার আশা করিতেছিলেন—A cloud no bigger than a man's hand in the eastern sky.—পূর্ব্বাকাশে এক টুকরা মেঘ মনে করিয়া ফুঁ দিয়া উড়াইবার চেষ্টায় ছিলেন, দেখিতে-দেখিতে সেই এক খণ্ড কৃষ্ণ মেঘই বঙ্গগগন ছাইয়া ফেলিল। অতঃপর লর্ড মর্লির "Settled fact" কিরূপে বাঙ্গালী নাকচ করিল, তাহা পরে দেখাইতেছি।

*

*   *

॥ চৌদ্দ ॥

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিন হইতেই রাজকর্তৃপক্ষের শাসন-যন্ত্র নিয়মিতভাবে স্বদেশী যুগের প্রতিকূলে চলিতে আরম্ভ করিল। নোয়াখালিতে স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরের আগমনোপলক্ষ্যে ছাত্রগণের অভিভাবকদের লইয়া এক বিরাট্‌ সভার আয়োজন হয়। এই সভায় স্বদেশী আন্দোলন হইতে ছাত্রসকল যাহাতে প্রতিনিবৃত্ত থাকে, তাহারই চেষ্টা হইয়াছিল। কোন-কোন বক্তা উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন—'বন্দেমাতরম্‌' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিলে যখন রাজকর্তৃপক্ষ বিরক্ত হন, তখন অনুচ্চকণ্ঠে বলাই বিধেয়। এই উপদেশ ছাত্রগণের অন্তরে সেদিন অতিশয় বিরক্তির কারণ হইয়াছিল। তিনজন নির্ভীক ছাত্র ইহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে। একজন বলে "মুক্তির মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্‌' বাঁচিবার জন্যই আমাদের চীৎকার করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। আপনাদের উপদেশ ভীরুতাব্যঞ্জক, অতএব অগ্রাহ্য।"

স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর ও প্রবীণ অভিভাবকমণ্ডলীর সম্মুখে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ ওজস্বিনী ভাষায় দেশভক্তিমূলক মুক্তিবার্ত্তা নির্ভীকভাবে ব্যক্ত করিলে, সমগ্র ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে উৎসাহের সীমা থাকে নাই; তাহারা দলে-দলে সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া পথে গগনভেদী 'বন্দেমাতরম্‌' ধ্বনি করিতে আরম্ভ করে।

ইন্‌স্পেক্টর কয়েকজন শিক্ষকের নিকট যে সকল ছাত্র 'বন্দেমাতরম্‌' ধ্বনি করিল, তাহাদের নাম চাহিলেন। শিক্ষকগণ একবার পথে বাহির হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন—

তাহারা সব চলিয়া গিয়াছে ; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি জিলা-স্কুল হইতে অন্ততঃ ৫জন ছাত্রকে বিতাড়িত করিবার আদেশ দিলেন। এই পাঁচজনের মধ্যে যে তিনজন সভাক্ষেত্রে বক্তৃতা করিয়াছিল, তাহারাও ছিল। নোয়াখালি জিলা-স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নাম শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গাঙ্গুলী। তিনি ছাত্রদমনের যুগে যেরূপ নির্ভীকতা দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নাম সেই সময়ে দেশময় প্রচারিত হইযাছিল। তিনি এই ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ের মৌখিক আদেশ পালন কবেন নাই, লিখিত আদেশের জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। ছাত্রগণের মধ্যে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা প্রবল হইয়া উঠিল। তাহারা কেহই বেতন দিতে চাহিল না। রজনীবাবু জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে ও ইন্‌স্পেক্টরকে জানাইলেন—ছাত্র-বিতাড়নের আদেশ না উঠাইয়া লইলে, স্কুলের আর্থিক ক্ষতি হওয়ার বিশেষ আশঙ্কা আছে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না ; বরং আশীজন ছাত্রকে বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া দিবাব আদেশ দিলেন। রজনীবাবু ছাত্রদের প্রতি এই নিষ্ঠুর আদেশ পালন অপেক্ষা চাকুরী ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সে সময়ে বড় মমতার বন্ধন ছিল। রজনী বাবুর পদত্যাগের কথা শুনিয়া ছাত্রগণের চক্ষে অশ্রু ঝরিয়াছিল। তাহাদের অনুরোধেই রজনীবাবু পদত্যাগ করেন নাই, ছাত্রগণই বিদায় লইয়াছিল। এই ঘটনার পর, রজনী-বাবুকে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে কুষ্টিয়ায় বদলী করিয়া দেওয়া হয়। তিনি শেষে নিজেই কর্ম্মত্যাগ করেন, ছাত্রগণ রজনীবাবুর কণ্ঠে পুষ্পমালা দিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে চড়াইয়া নগর ভ্রমণ করিয়াছিল। রজনীবাবুর কথা আজ আর কাহারও মনে নাই ; স্বদেশী যুগে

এইরূপ অকপট দেশহিতৈষীর চরিত্রবল নবজাগ্রৎ বাঙ্গালীর প্রাণে কি যে উৎসাহের সঞ্চার করিত, তাহা আর বলিবার নহে। রজনীবাবুর মন্ত্র ছিল—"সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্, সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্;" এইজন্য চিরদিন তিনি চরকায় সূতা কাটিয়া নিজের হাতেই স্বীয় পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতেন। সে যুগের দৃঢ় চরিত্রবল আজিকার যুগে শিক্ষকদের মধ্যে ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। ছাত্রগণ শিক্ষকদের নিকট হইতেই দেশপ্রীতির অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা পাইত। আজ তাহার বিপরীত হইয়াছে; ইহা যুগের হাওয়া বলিতে হইবে।

পূর্ব্ব বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার "বন্দেমাতরম্" উচ্চারণ করা বে-আইনী বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। কলিকাতার এডভোকেট্ ডাক্তার পিউগ্ ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেও, কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই; সার্কুলারের উপর সার্কুলার জারী করিয়া তরুণের কণ্ঠ নীরব করার কঠোর ব্যবস্থা হইয়াছিল। গুর্খার লাঠি, গভর্ণমেন্টের শাসনদণ্ড, ছাত্রদলনের নিষ্ঠুর ব্যবস্থা—কোন মতেই কিন্তু বাংলার ছাত্রসমাজ সেদিন মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করিতে ছাড়ে নাই। চট্টলের কমিশনার সাহেব ছাত্রদের একত্র করিয়া যখন জানাইলেন যে, স্বদেশী সভায় উপস্থিত হওয়া, কোনরূপ মিছিলে যোগদান, 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করা আইনসঙ্গত নহে, কেহ এইরূপ করিলে তাহাকে শাস্তি পাইতে হইবে; তৎক্ষণাৎ তরুণ ছাত্রগণ তাহার প্রতিবাদ করিয়া জানাইয়া দিল—দেশবিরুদ্ধে এই নীতি পালন করা তাহাদের বিবেকসঙ্গত নহে; অতএব শাস্তি তাহারা মাথা পাতিয়া লইবে। কিশোরগঞ্জের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের উপর আদেশ জারী হইয়াছিল যে, তাঁহার বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর

ছাত্রগণকে প্রতিদিন পাঁচশত ছত্র লিখিতে হইবে—"It is foolish and rude to waste my time in shouting Bande-mataram". বলা বাহুল্য, এই সকল অদ্ভুত আচরণে বাংলার ছাত্রসমাজ ভয়ঙ্কর উত্যক্ত হইয়া উঠায় কর্ত্তৃপক্ষ এ আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছিলেন।

ছাত্রদলন-কার্য্যে ও স্বদেশী যুগের সকল রকম আন্দোলন ও উত্তেজনা দমন করিতে স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের নাম চিরকুখ্যাত হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিতেন—বাংলায় স্বদেশীযুগ আসায় বাঙ্গালী জাতি উন্নতির পথ হইতে পাঁচশত বৎসর পিছাইয়া পড়িল। মিঃ কার্লাইলের ছাত্রদমননীতির ফলে অনেক বিদ্যালয় গভর্ণমেণ্টের বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, অনেক শিক্ষক পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শিক্ষকদের special constable করিয়া অশেষ লাঞ্ছনা করা হইয়াছিল। স্থানে-স্থানে গুর্খা রাখায় গ্রামবাসীদের মুক্ত জীবন পদে-পদে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। গুর্খারা অনায়াসেই সেই নিরীহ প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া বসিত। বরিশালে ইহার চরম হইয়াছিল। পথচলা নিরাপদ ছিল না, প্রতিদিন কোন-না-কোন দুর্ঘটনার সংবাদ দেশকে চঞ্চল করিয়া তুলিত। গুর্খাদের অত্যাচারে বাজার-হাটের বিক্রেতা পর্য্যন্ত বেচা-কনা বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহারা ইচ্ছামত দ্রব্যাদি জোর করিয়া উঠাইয়া লইত—মূল্য ইচ্ছামত দিত, প্রতিবাদ করিলে, মাথায় লাঠি মারিত। বরিশালের একজন উকিল গুর্খার লাঠিতে গুরুতর-রূপে আহত হইয়াছিলেন। লাঠির ঘায়ে তাঁহার মাথা ফাটিয়া গিয়াছিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রতিবিধানের তাগিদ আসিত। কর্ত্তৃপক্ষ ইহার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিতেন; কিন্তু ফলে তেমন কিছুই হইত না। দিবা-রাত্রি যেন অশান্তির আগুন মানুষের চেতনা উদ্ভ্রান্ত
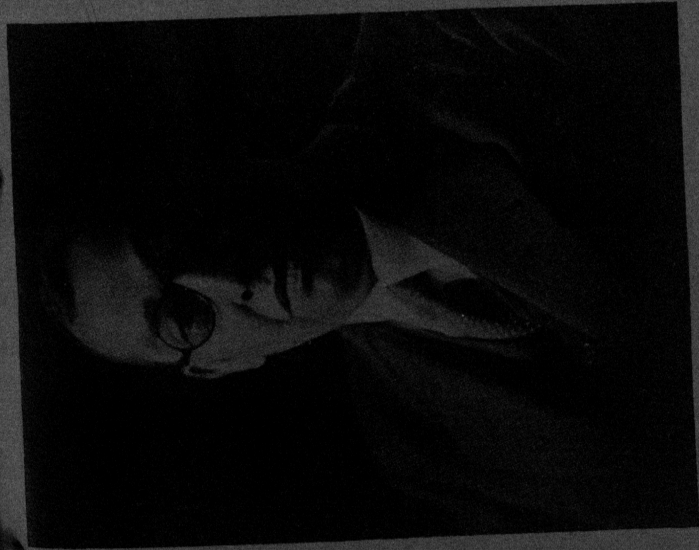
রাসবিহারী বসু ॥ ১৮৮৬-১৯৪৫
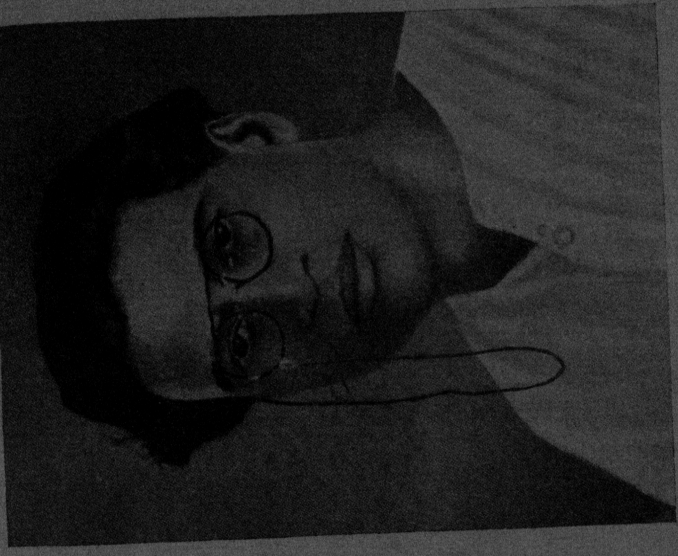
মানবেন্দ্রনাথ রায় ॥ ১৮৮৭-১৯৫৪

করিয়া রাখিত। বাংলার তাৎকালীন অবস্থা যে কিরূপ গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা বিলাতের কাগজপত্রে যে সকল মন্তব্য বাহির হইত, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। "ম্যানচেষ্টার-গার্জেনে" বাহির হইয়াছিল: "It is doubtful if Russia can afford a petty-fogging tyranny in attempting to throttle political thought among the people by making war upon the very children... ...."

এত করিয়াও, কিন্তু দেশের হাওয়া সেদিন ফিরে নাই। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব সমূলে বিনষ্ট করার জন্য কর্তৃপক্ষগণের সকল ব্যবস্থাই জাহ্নবীপ্রবাহে মত্ত হস্তীর বাধা-প্রদানের ন্যায় ব্যর্থ হইয়াছিল। দেশের লোক যখন শাসন-দণ্ডের নিষ্পেষণে একান্ত অতিষ্ঠ, তখন বাংলার সর্ব্বপ্রধান জমিদারবর্গ একত্র হইয়া, শান্তিস্থাপনোদ্দেশ্যে ভারতসচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য বহু আবেদন-নিবেদন প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু আজিও যেমন, সেদিনও তেমনি বিলাতের মন্ত্রিসমাজ সেরূপ কথার উত্তরে ভারতের কর্তৃপক্ষগণের কার্য্যকেই সমর্থন করিতেন। স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও নাটোরের কুমার যোগেন্দ্রনাথ রায় বড়লাট বাহাদুরের নিকট দেশীয় পক্ষের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন; লাটবাহাদুর তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতেও অস্বীকৃতি জানাইয়াছিলেন।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলন কেবল উত্তেজনার আগুন জ্বালিয়া অশান্তির আবর্ত্ত রচনা করে নাই, নব সৃষ্টির বনিয়াদও গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই মহাসমস্যার মধ্যে—যে সময়ে বস্ত্রজীবনের সামান্য সূচীটী পর্য্যন্ত বিলাত ভিন্ন মিলিত না, সেই সময়ে

নিত্যব্যবহার্য্য সকল দ্রব্যই দেশে রাশি-রাশি প্রস্তুত হইত এবং এইগুলি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করার ব্যবস্থা হইলে ইহার বিরুদ্ধেও রাজকর্তৃপক্ষ কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। গভর্ণমেণ্টকে স্বদেশ-শিল্পরক্ষায় সহানুভূতিসম্পন্ন করিতেও বাঙ্গালীকে বুকের রক্ত ঝরাইতে হইয়াছে। নিম্নলিখিত পুলিস সার্কুলারখানি ইহার নিদর্শন :

"Regarding Swadeshi Movement, I have heard reports from sub-divisions that agitators are going about hawking swadeshi articles at cost price to stop the sale of foreign goods. But I want to know, if it has been taken in the districts and villages". স্বদেশজাত পণ্যপ্রচারের পথেও পুলিসের সতর্ক-দৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছিল। তিনি পুলিস ইন্স্পেক্টরদের উপর আদেশ জারী করিয়াছিলেন : "to inform about the names and persons connected, goods sold, price demanded and if the movement is appreciated, secrecy must be observed in obtaining information." দেশের কল্যাণকামীদের উপর কর্তাদের অনুগ্রহদৃষ্টি এইদিন হইতে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। অতএব ঘটনা ক্ষুদ্র মনে হইলেও, শাসকজাতির মনোবৃত্তি এইভাবে সংশয়াপন্ন হইয়া ক্রমে অনেক ক্ষেত্রে অকারণ দেশব্রতীদের রাজদ্রোহী রূপে যে ধারণা করিয়া লইবে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে কি ?

স্বদেশীযুগের সুযোগ লইয়া পশ্চিম ভারতে বস্ত্রবয়নের অসংখ্য কল গড়িয়া উঠে। বাংলায় 'বঙ্গলক্ষ্মী' ও 'মোহিনী মিল' প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই দেখি—বাঙ্গালী উত্তেজনার আগুন জ্বালিয়া কেবল ধ্বংসযজ্ঞের অবতারণা করে নাই, সৃষ্টিযজ্ঞেরও বেদীরচনা

করিয়াছে। ১৮৯৫ হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ—এই দশ বৎসরে বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কলে দশ হাজার তাঁত বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। স্বদেশীযুগ আরম্ভ করা মাত্র ১২,০০০ হাজার তাঁত বাড়াইতে হয়। ৩৫,০০০ হাজার তাঁত লইয়া এই কলগুলি আরম্ভ করা হয়। দশ বৎসরে দশ হাজার তাঁতের উৎপন্ন বস্ত্র ভারতে ও অন্যান্য স্থানে বিক্রয় করার সুযোগ ঘটিয়াছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এক বৎসরেই বার হাজার তাঁত বাড়াইয়াও চাহিদার অনুপাতে বস্ত্রসরবরাহ প্রচুর হয় নাই—ব্যবসার ক্ষেত্রে ইহা কম লাভের কথা নহে! ইহা ব্যতীত বাংলার ব্যবসায় চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। স্বদেশী মিলের কাপড় ও তাঁতের প্রস্তুত বস্ত্রাদি মাথায় করিয়া স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকগণের পথে-পথে ফিরি করিয়া বেড়ান স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠে, আর মনে হয়—স্বদেশপ্রীতির দীক্ষাযুগে কি অকপট হৃদয় ও প্রাণের পরিচয় বাঙ্গালীর জীবন ধন্য করিয়াছিল! অপর পক্ষ হইতে নির্য্যাতনের আশঙ্কা সমগ্র দেশের জাগ্রৎ প্রাণের সম্মুখে ম্লান হইয়া পড়িত। অনৈক্যের মোচড় খাইয়া আবার যে আমরা বিভক্ত-বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজের পায়ে কুঠার মারিয়া মরিব, সেদিন তাহা কল্পনায় আসিত না।

॥ পনের ॥

স্বদেশীযুগের যে প্রাণ দেশের সম্পদ্-বৃদ্ধি ও জাতির চরিত্র উন্নত করার জন্য উদ্বুদ্ধ হইযাছিল, সে প্রাণ ধ্বংসের অনল জ্বালিয়া তুলিল—রাজকর্তৃপক্ষগণেরই অদূরদর্শিতায়। পার্ল্যামেণ্ট হইতে বাংলাকে দ্বিধাবিভক্ত করিবার সম্মতি পাওয়ার পূর্ব্বেই স্বেচ্ছাচারী লর্ড কার্জ্জন স্বীয় অভীষ্ট সাধন করিয়াছিলেন এবং ইহার বিরুদ্ধে বাংলার প্রতিবাদ বিলাতের মন্ত্রিসভায় যাহাতে না পৌঁছায়, তাহার জন্য মহারাজ সূর্য্যকান্তের ভবনে গিয়া তাঁহাকে আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত করার অনুযোগ হইতে ছাত্রদলন, দেশনেতৃদের নির্য্যাতন প্রভৃতি কোন আয়োজনই বাদ রাখেন নাই।

লর্ড মর্লি বিলাতের মন্ত্রিসভায়, প্রকাশ্যেই লর্ড কার্জ্জনের কর্ম্ম-পদ্ধতির নিন্দা করিতেন। এই সম্বন্ধে কথা উঠিলেই লর্ড মর্লি স্বীকার করিতেন, শাসন-সৌকর্য্যে বঙ্গভঙ্গনীতির প্রবর্ত্তন হইলেও, ইহা সম্পূর্ণভাবে এবং স্পর্দ্ধার সহিত লোকমত উপেক্ষা করিয়াই সাধিত হইয়াছে—তাঁর কণ্ঠে এমন কথাও প্রকাশ পাইত : "I am bound to say that nothing was ever worse done so far as the disregard which was shown to the feeling and opinion of the people concerned." বাঙ্গালী জাতির কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা এই কথায় শিথিল হয় নাই, বরং মাত্রা বাড়িয়াছিল ; বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের শাসনকর্ত্তা স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ বৃটিশ জাতির ন্যায়-বিচার ও অপক্ষপাত-দৃষ্টির যে খ্যাতি ছিল, তাহা চিরদিনের জন্য লোপ করিয়াছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অঙ্কুরে উৎপাটন করার কঠোর ব্যবস্থা হইয়াছিল। ছাত্রের সহিত শিক্ষক-দলনের ক্রটি হয় নাই; স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর মহোদয়গণ যে সকল শিক্ষক দেশ ও জাতির প্রতি কর্ম্মে ও ভাবে অনুরাগ প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদিগকে চাকুরী ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধের সহিত ভয় প্রদর্শন করিতেন। সেদিন শিক্ষক ও অধ্যাপকগণই স্বদেশী আন্দোলনের মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিলেন; ইংরাজশাসনের দায়ে বা ভয়ে ছাত্রপীড়ন করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হইত না। এইজন্য লায়ন সাহেবের সার্কুলার কার্য্যকরী হয় নাই।

শান্তিরক্ষার নামে আইনের লৌহ-শৃঙ্খল যতই কর্কশ শব্দে ঝন্ ঝন্ করিয়া লোকের মনে আতঙ্কসৃষ্টির ব্যবস্থা করিল, বাঙ্গালী আইন-ভঙ্গের জন্য ততই নির্ভীক হইয়া উঠিতে লাগিল। দেশ ও জাতির জীবন জাগাইয়া তুলিবার আন্দোলন দেখিতে-দেখিতে বৃটিশ-শাসন পদে-পদে প্রতিহত করার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িল। গভর্ণমেণ্টের দিক্ হইতে যতই সার্কুলারের পর সার্কুলার বাহির হয়, দেশের দিক্ হইতে উহা অমান্য করার দুর্জ্জয় প্রবৃত্তি ততই জাগিয়া উঠে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের সভাপতিত্বে ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদকত্বে "Anti-Circular Society" গড়িয়া উঠিয়াছিল।

এই সমিতি স্বদেশী আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে সকল আইন প্রবর্ত্তন করিতেন, তাহা অস্বীকার করিয়া ঐগুলি নিরর্থক করিয়া দিত। রাজশক্তির বিরুদ্ধ হওয়ার স্পর্দ্ধা কর্ত্তৃপক্ষগণ নীরবে সে সময়ে সহ্য করিবার মত সহিষ্ণুতা অর্জ্জন করেন নাই; কাজেই বঙ্গভঙ্গ হওয়ার এক বৎসরের মধ্যেই, শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিজাতীয় বিদ্বেষ জাগিয়া উঠিল। বাঙ্গালীর অস্ত্রবল না থাকিলেও, অসহায় অবস্থাতেই কেবল প্রাণের আবেগে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

উপলক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালী জাতি সেদিন ইংরেজের বিরুদ্ধে এক প্রকার সংগ্রাম ঘোষণাই করিয়া দিয়াছিল। দেশ-নেতৃগণের এইরূপ বিরুদ্ধ ভাব তরুণ যুবকগণকে যে অধিকতর প্রমত্ত করিবে, তাহা কিছু বিচিত্র ছিল না। রাজদ্রোহী হওয়ার কল্পনা করিতে পূর্ব্বে বাঙ্গালীর হৃৎকম্প হইত; অকস্মাৎ প্রকাশ্য রাজপথে এক্ষণে ইংরাজ-রাজ্যের উচ্ছেদ কামনা করিয়া বিজ্ঞাপনপ্রচার হইতে লাগিল। মেদিনীপুরে ক্ষুদিরামের নাম এই ঘটনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই বালক রাজদ্রোহমূলক 'সোনার বাংলা' পুস্তিকা প্রচার করার অভিযোগে ধৃত হয়। বিচারে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। দেশব্রতী বলিয়া ক্ষুদিরাম রাজদ্বার হইতে মুক্তি পাইয়া যেরূপ আদর ও সম্মান লাভ করিয়াছিল, তাহা এ যুগে আন্দামান হইতে মুক্ত রাজবন্দীও লাভ করে না। দেশের প্রাণ সেদিন এইরূপ কর্ম্মকে এতখানি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত বলিয়াই বাংলায় বিপ্লব-যুগের উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছিল।

কিন্তু খড়ের আগুনের মত, বাঙ্গালীর এই দুঃসাহস হয়তো জ্বলিয়াই নিভিত, রাজশক্তির নিরন্তর ইন্ধনেই ইহা প্রলয়-মূর্ত্তি ধরিল। বাংলায় পরবর্ত্তী যুগে যে সকল তরুণ জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিসর্জ্জন দিয়া অকাল-মৃত্যু বরণ করিয়াছে, নির্য্যাতনের পীড়নে চিরদিনের জন্য স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়া পঙ্গু হইয়াছে, তাহার জন্য দেশ দায়ী নহে; এমন কি, বীভৎস প্রতিবিধিৎসার বশবর্ত্তী হইয়া, জাতির জীবনে যে হিংসার কলঙ্ক রক্তরেখায় অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা জাতির কলঙ্ক নহে—রাজ্য-শাসননীতি যদি সুস্থ ও সুচিন্তিত ধারায় প্রবর্ত্তিত হইত, হয়তো এইরূপ বিচিত্র চরিত্র তরুণদের বিপন্ন করিত না।

যে নীতি বিলাতের পার্ল্যামেণ্ট পর্য্যন্ত অনুমোদন করে নাই, তাহার প্রতিবাদ বাঙ্গালী বিধিসঙ্গত ভাবেই আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা স্বদেশজাত শিল্পের উদ্ধার করিয়া বৃটিশ-পণ্য বর্জ্জন করিতে চাহিয়াছিল। ভারতীয় শাসন-কর্তৃপক্ষদিগের হঠকারিতার কথা ইংরাজ জাতির কর্ণগোচর করাইয়া দিবার জন্য তাহারা পূর্ব্ববঙ্গের শাসনকর্ত্তা স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারকে অভিনন্দন কবিতে অস্বীকার করিয়াছিল। সংবাদপত্রে ও বক্তৃতামঞ্চে, জনমতের বিরুদ্ধে লর্ড কর্জ্জনের কর্ম্মের প্রতিবাদই স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছিল। কোন ক্ষেত্রে উদ্ধত আচরণ প্রকাশ পায় নাই, কোথাও আঘাতের রক্ত ঝরিয়া পড়ে নাই, শান্তি-শৃঙ্খলা-ভঙ্গের কোন কারণই ঘটে নাই; কিন্তু শাসন-যন্ত্রের নিষ্পেষণে জাতিকে ধীরে-ধীরে অতিষ্ঠ করিয়া তোলা হইল। গুর্খার লাঠি বিনা বিচারেই লোকের মাথা ভাঙ্গিয়াছিল; ইহার চরম দৃষ্টান্ত বরিশাল কন্ফারেন্সে দেখা গিয়াছিল।

কলিকাতা হইতে বিচক্ষণ নেতৃবৃন্দ বরিশালের বন্দরে গিয়া শুনিলেন যে, তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করাব জন্য মাতৃ-বন্দনার কণ্ঠ বন্ধ করা হইয়াছে; বরিশালের পথে-ঘাটে, বক্তৃতা-সভায়, বরিশালবাসী "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিতেও পারিবে না। ষ্টীমারে এণ্টি-সার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ ছিলেন, ইহা শুনিয়া তাঁহারা যে সহজেই উত্তেজিত হইয়া উঠিবেন, তাহা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথ, মতিলাল, সুরেন্দ্রনাথ, আশুতোষ প্রভৃতির ন্যায় বিজ্ঞ নেতৃগণ তরুণদের মধ্যে যে চাঞ্চল্যপ্রকাশ হইয়াছিল, সুযুক্তি দিয়া তাহা নিবারণ করিলেন; রাজার আইন মান্য করিয়াই তাঁহারা বরিশালের রাষ্ট্রক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে দ্বিধা করিলেন না।

বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইমার্সন কলিকাতার নিমন্ত্রিত সভ্যবৃন্দকে অভিনন্দিত করার জন্য "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই নীতি পালন করিয়া অন্যান্য সভ্যেরা সভায় যোগদান কবিতে শোভাযাত্রা করিলেন। তাঁহাবা নীরবেই চলিতেছিলেন; কিন্তু অকস্মাৎ ছয় ফুট লম্বা বাঁশেব লাঠি তাঁহাদের মাথায় পড়িল। সুবেন্দ্রনাথেব জীবনকাহিনী হইতে অবগত হওয়া যায়—শোভাযাত্রীদের হাতে সখের লাঠিও ছিল না, সকলে নিস্তব্ধ-ভাবেই মিছিলে চলিতেছিলেন; লাঠির আঘাত খাইয়া রুদ্ধ বেদনা গর্জ্জিয়া উঠিল, তাহাও প্রতিশোধের রুদ্রমূর্ত্তিতে নহে। মাতৃবন্দনায় বরিশালের গগন-পবন মুখরিত হইল। শত-শত কণ্ঠের "বন্দেমাতরম্"-ধ্বনি গুরু-গুরু মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শ্রুত হইল। আকাশ হইতে বৃষ্টিধারার ন্যায় অজস্র লাঠির আঘাতে বরিশালের রাজপথ স্বদেশব্রতীর রক্তে সিক্ত হইল। তরুণ দেশসেবক চিত্তরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা গুরুতর আঘাতে পথ হইতে জলাশয়ে পতিত হইলেন। যদি সঙ্গে-সঙ্গে সেদিকে কাহারও দৃষ্টি না পড়িত, তবে তাঁর জল-গর্ভেই ইহজীবন শেষ হইত। পিতা পুত্রকে বক্ষে করিয়া হাঁকিলেন—"বন্দেমাতরম্"। স্বদেশ-যজ্ঞে রুধির আহুতি পড়িয়া উহা ঊর্দ্ধশিখায় জ্বলিয়া উঠিল। দেশের নেতা সত্যই মাথা দিয়া দাঁড়াইলেন। বরিশালের পুলিস-কোটাল মিঃ কেম্প সুরেন্দ্রনাথকে বন্দী করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসভবনেই তাঁর বিচার শেষ হইল। ক্লান্ত চরণ সেদিন সুরেন্দ্রনাথকে বোধ হয় বহন করিতে অসমর্থ হইয়াছিল; তাই তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের কক্ষে বসিবার উদ্যোগ করিলেন। মিঃ ইমার্সনের কণ্ঠে পরুষভাবে তৎক্ষণাৎ উচ্চারিত হইয়াছিল: "You are a prisoner; you cannot take your seat, you must

stand." বৃটিশের ভদ্রতা দেখাইতে গিয়া তিনি আরও গুরুতর ভাবে অভিযুক্ত হইলেন। কোর্টের মর্য্যাদা-হানি করায় তাঁহার তৎক্ষণাৎ দুইশত টাকা জরিমানা হইল এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম অমান্য করা হেতু আরও অধিক দুইশত টাকা তাঁহার অর্থদণ্ড হইল।

সুরেন্দ্রনাথ পুলিসের হস্তে বন্দী হইলেও, বরিশালের সভা-ভঙ্গ হয় নাই। দেশভক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা আহত পুত্রকে বুকে লইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে দেশের প্রাণে সেদিন বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। বরিশালের নারী-পুরুষের অন্তরে রুদ্র যেন নৃত্য করিয়া উঠিল। দেশপ্রাণ ইস্‌লামধর্ম্মী এ. রসুল এই মহাযজ্ঞের প্রধান হোতা ছিলেন। তিনি সেদিন মর্ম্ম নিঙড়াইয়া অগ্নি-বাণী উচ্চারণ করিলেন, বরিশালের সভায় অদৃশ্য অগ্নিক্রীড়া হইয়া গেল। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের প্রাণে সে উষ্ণ স্পর্শ অনুভূত হইয়াছিল। রসুলের শেষ কথার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া পরলোকগত স্বদেশভক্তের স্মৃতিপূজা করি :

"There is no denying that a cloud rests at present all over Bengal. It is a dark and heavy cloud and its darkness extends over the feelings of men in all parts of the country. But if we can only be united, that cloud will be dispelled."

কিন্তু হায়, মহামতি রসুলের এ বাণী সার্থক হয় নাই, বিরোধ কেবল হিন্দু-মুসলমানে নহে, অন্তর্বিরোধের দায়ে দেশের জীবন আজও মসীময় কাল-মেঘে আচ্ছন্ন !

বরিশালের ঘটনা এইখানেই শেষ হইল না। তাহার পরদিন সভা বসিলে, মিঃ কেম্প সভাপতির নিকট গিয়া জানাইলেন—যদি

সভ্যবৃন্দ পথে "বন্দেমাতরম্"-ধ্বনি করিবে না, এই অঙ্গীকার না করে, তাহা হইলে সভাভঙ্গ করিয়া দেওয়ার আদেশ পালন করা হইবে। বলা বাহুল্য, এই নিতান্ত অপমানজনক শান্তিরক্ষার নীতি কোন বাঙালীই স্বীকার করিলেন না। মিঃ কেম্প সভা-ভঙ্গের আদেশ দিলেন। ক্ষুব্ধচিত্তে সভ্যবৃন্দ বাড়ী ফিরিলেন।

কিন্তু বরিশালের নির্ভীক যুবকদল নীরব রহিলেন না। তাঁহারা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। ফলে পুলিসের লাঠির আঘাতে রক্তের নদী বহিল।

সে অত্যাচারের নগ্ন রূপ দেখিয়া শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসুর মত ধীরবুদ্ধি রাষ্ট্রনেতারও ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বাহির হইল : 'This is the beginning of the end.'—ইংরাজশাসনের অন্তিম দশার এইখানেই সূচনা হইল।

বরিশালের এই অপমান বাঙালী হজম করিতে পারে নাই। লাঠির বিরুদ্ধে লাঠি চালাইবার হিংস্র ক্ষুধা বাঙ্গালীকে বড় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। বঙ্গললনাকুল এই বরিশালের কাণ্ডে, স্বামি-পুত্রগণের অপমানে ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে, অঙ্গের অলঙ্কার মোচনপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—এই অপমানের প্রতিবিধান না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা অঙ্গে আর বিলাসদ্রব্য ধারণ করিবেন না। সংবাদটী দেশব্যাপী হইয়া পড়িলে, একজন রাজকর্ম্মচারীর মুখ হইতেও এমন কথা শুনা গিয়াছিল—দেশে কি এমন লোক নাই, যে প্রতিশোধ লইতে পারে! বাঙ্গালীর হৃদয় মথিয়া সেদিন এমনি প্রতিবিধিৎসার নির্ম্মম মর্ম্মবাণীই ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

তারপর একে-একে ঘটনার প্রবল তরঙ্গাবর্ত্তে বাঙ্গালীর শান্ত আন্দোলনকে নিষ্ঠুর শক্তিপরীক্ষায় পরিণত করিয়া তুলিল।

এই ঘটনা আবার বাংলার আন্দোলন-স্রোতকে আর এক দিক্

দিয়াও বিভিন্নমুখী করিয়া দিল। বাংলায় ইহার পূর্ব্বে নরম-গরম শ্রেণী ছিল না। রাজপক্ষ ইচ্ছা করিলে, প্রচলিত বিধির প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া নাগরিক জীবনের অনিবার্য্য অধিকার এক কথায় কাড়িয়া লইতে পারে, ইহা জানিয়া সাবধানীর দল ক্রমেই সতর্ক হইয়া চলিতে সুরু করিলেন ; আর একদল লোক অপমানে-লাঞ্ছনায় অতিষ্ঠ হইয়া যে নীতির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা ভবিষ্যতে বাংলায় বিপ্লব-পন্থীর আবির্ভাবে হওয়ার সুযোগ করিয়া দিল।

বাংলায় এই শ্রেণীভেদ একদিনে হয় নাই ; ঘটনাচক্রে ইহা কিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল, তাহা পরে দেখাইব। তবে বরিশালের লাঠি ও মিঃ ইমার্সনের শাসনদণ্ড নেতৃবৃন্দকে যে নূতন চৈতন্য দিয়াছিল, তাহা হইতেই যে ইহার সূচনা, ইহাতে আর মতভেদ নাই।

বরিশালের কথা সকল কাগজে জোর গলায় প্রকাশ করিতে-করিতে দেখা গেল—নেতৃবৃন্দ পরস্পর পরস্পরকে লোক-চক্ষে হেয় প্রতিপাদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বরিশালের লাঠি খাইয়া কে কোন্ পথে চম্পট দিয়াছিলেন, তাহা লইয়া ব্যঙ্গকৌতুক-পূর্ণ আলোচনা অবাধেই প্রচারিত হইতে লাগিল। দলাদলি হওয়ার বীজ সেদিন অতি সূক্ষ্মভাবেই অখণ্ড বাঙ্গালী জাতির অন্তরে মিঃ ইমার্সন সাহেবই সর্ব্বপ্রথমে রোপণ করিয়া দেন, যাহার ফলে বাংলায় নরম-গরম দলের উৎপত্তি ; মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্সে যাহা নিষ্ঠুরভাবেই অভিব্যক্ত হয়, সুরাটে বিয়োগান্ত নাটকের ন্যায় তাহারই চরম অভিনয়। আমরা ধীরে-ধীরে বাংলার জাগরণস্রোতঃ কোথায় গিয়া কিরূপে রূপান্তরিত হইল, তাহা দেখাইব।

॥ ষোল ॥

বরিশালের ঘটনায় জাতীয় জীবনে যেমন পরিবর্ত্তনের সূচনা হইল, শাসনকর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যেও তেমনি মতবিরোধ দেখা দিল। স্যার ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলারের পদত্যাগপত্র সমর্থিত হওয়ায়, বিলাতে এই বিষয় লইয়া ঘোরতর আন্দোলন হইয়াছিল; কিন্তু ফুলার পদত্যাগ করিলেও, কঠোর শাসননীতিই চলিতে লাগিল, এবং ইহার ফলেই বাংলার আন্দোলনকারীদের মধ্যে দলাদলি দেখা যায়। যে শক্তি জাতির অভ্যুত্থান লক্ষ্যে রাখিয়া উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আত্ম-বিরোধে ম্লান হইয়া পড়িল। বরিশালের আঘাত একাংশের চিন্তাস্রোতঃ নূতন দিকে ঘুরাইয়া দিল। এতদিন তাঁহারা অপর পক্ষের শক্তির হিসাব না করিয়াই আত্মপ্রেরণায় উন্মাদ হইয়া ছুটিতেছিলেন, মন-বুদ্ধি যুগপ্রেরণায় স্তম্ভিত হইয়াছিল, এক্ষণে যুক্তি ও বিচার আসিয়া মরণপণে তাঁহাদের যে যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল তাহা রুদ্ধ করিল। সুরেন্দ্রনাথ বরিশাল হইতে যে অগ্নিমূর্ত্তি লইয়া ফিরিলেন, দেখিতে-দেখিতে তাহা মলিন হইয়া পড়িল। এতদিন যে কণ্ঠ বিধাতার বজ্রহুঙ্কার তুলিতেছিল, সে কণ্ঠ কে যেন চাপিয়া ধরিল। তিনি ইংরাজের গোলামখানা গোলদীঘির জলে বিসর্জ্জন দিয়া জাতীয়বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের রিপন কলেজ জাতীয় যজ্ঞক্ষেত্রে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। দেশের প্রাণ বিদ্যুদুৎসাহে তাহা গ্রহণ করিয়া, জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ-গঠনের জন্য অকাতরে অর্থ দান করিয়াছিল। এই ক্ষেত্রে রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের নাম উল্লেখযোগ্য—তিনি জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য

এক লক্ষ মুদ্রা দান করেন। স্যার তারকনাথ পালিত এই কার্য্যে যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। এই জাতীয়শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ বরোদা হইতে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বাংলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের পীড়ননীতি প্রবল হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল—সৃষ্টির সূচনা কল্পনায় রহিয়া গেল, কার্য্যে আর পরিণত হইল না।

যুগের প্রেরণা সুরেন্দ্রনাথকে আশ্রয় করিয়া অবতরণ করিয়াছিল, অভিনব প্রেরণার অলক্ষ্য শক্তি অকস্মাৎ তাঁহাকে ভর করিয়া বাংলায় নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করে! সে শক্তিকে শেষ পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখার ত্যাগ ও তপস্যা বড় কাহারও ছিল না। সুরেন্দ্রনাথও প্রাচ্য শিক্ষা ও সাধনার সন্ধান পান নাই। কাজেই এই মহাশক্তি বাংলায় প্রবল ঝড়ের ন্যায় প্রলয়কাণ্ড বাধাইয়াই গেল—ইহার অমৃতময় ফলের আস্বাদ জাতির ভাগ্যে ঘটিল না। ইহার জন্য একা সুরেন্দ্রনাথ দায়ী নহেন। কেননা, এই শক্তির সহিত নিত্যযুক্ত থাকিতে হইলে, বস্তুতঃ ক্ষতি ও লাভের হিসাব রাখা চলে না। ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে যাহা ঘটে, উহা জাতিগত তপস্যা হওয়ায় সমগ্র জাতি ও দেশের ভাগ্যেও যে তাহা অনিবার্য্য—ইহা অবধারিত। বরিশালের আঘাত সহিয়া দেশ ও জাতি কিরূপে দাঁড়াইতে পারিত, সে বিষয়ে তিনি যাহা স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন তাহা বড় আশার কথা ছিল না। অবশ্য এই দর্শন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মবৎ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তিনিও তো দেশসত্তার অবিভাজ্য রূপ—যাহা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে, দেশের পক্ষে তাহা যে অসম্ভব হইবে, এরূপ ধারণা নিতান্ত অমূলক নহে। বিশেষতঃ, স্বদেশ-যজ্ঞের পুরোহিতরূপে তিনিই বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট পুরুষ

ছিলেন; কাজেই দেশের জাগরণস্রোতঃ যে ভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল, বৃটিশ রাজ্যের রুদ্রমূর্ত্তির সম্মুখ হইতে তাহা উল্টাইয়া আবার প্রকৃতিস্থ করার প্রয়োজন তিনি যে দরদ দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, অপরের পক্ষে তাহার সম্ভব ছিল না। এইজন্য তাঁহার হিসাব-মতই ইহা করিয়া তুলিবার জন্য যে তিনি উদ্বুদ্ধ হইবেন, ইহা খুবই সহজ কথা। কিন্তু দেশের সমস্ত প্রকৃতি তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল না। জাতিকে আশ্রয় করিয়া যে রুদ্র জাগিয়াছিলেন, মানুষের হিসাব তিনি গ্রাহ্য করেন নাই; কাজেই বাংলার জননেতা দেশব্রতের দীক্ষা দিয়া এক্ষণে নিষ্প্রভ হইয়া পড়েন। শ্যামবাজারে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও তদীয় ভক্তগণের নিকট রাজসম্মান পাইয়াই তিনি দক্ষিণান্ত হন। সুরেন্দ্রনাথের জীবন দিয়া দেশের ভাগ্যবিধাতা যাহা করাইবার বিধান স্থির করিয়াছিলেন, তাহাই সুসিদ্ধ হইল। দেশ তাঁহার নিকট হইতে আরও অধিক আশা করিয়াছিল এবং সে আশা তিনি পূরণ করিতে আসেন নাই। এই নিগূঢ় বিষয় বুঝা যায় নাই বলিয়াই সে যুগে উত্তেজিত জননেতৃগণ তাঁহার মস্তক লইয়া গেণ্ডুয়া-ক্রীড়ার কল্পনা-চিত্র আঁকিয়া প্রকাশ্যে বিতরণ করিতে কুণ্ঠা করেন নাই। শক্তি সেদিন আশ্রয়চ্যুত হইয়া অন্ধ মূর্ত্তিতে দেশে যে প্রলয়নৃত্য যুড়িয়া দিয়াছিল, তাহা সংযত করার সাধ্য কাহারও ছিল না। একদিকে প্রবীণ জননেতৃমণ্ডলীর সুবুদ্ধিচালিত নির্দ্দেশ, অন্যদিকে রাজশক্তির শাসনযন্ত্রের কঠোর নিষ্পেষণ, এই দুইই মানুষের সৃষ্টি—বাংলায় তখন যে অপার্থিব শক্তির লীলা চলিয়াছে, তাহা ইহার দ্বারা নিরস্ত হয় নাই। জাতির আধার যদি নিষ্কলুষ ও কামনাশূন্য হইত, তবে সেই শক্তি দেশের ইতিহাস আজ অন্য রূপে রচিয়া তুলিত। ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে এই দৈবশক্তি বিচরণ

করিয়াই শেষ হইল। বাংলার যুদ্ধপ্রেরণা বাঙ্গালীকে অভিজ্ঞতা দিয়া গেল, সিদ্ধির জয়টীকা ললাটে আঁকিয়া দিল না।

সুরেন্দ্রনাথের জীবনে এই শক্তির অনুভূতি এক শুভ-মুহূর্তে বড় জাগ্রৎ রূপেই দেখা দিয়াছিল। তিনি ববিশালের নির্য্যাতনের পর কোন এক দেবমন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্বদেশ-মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের কথাই বলিব : "As I spoke and had my eyes fixed upon the temple and the image, and my mind was full of the association of the place, in a moment of sudden impulse I appealed to the audience to stand up and to take a solemn vow in the presence of the God of their worship".

অতীন্দ্রিয় জগৎ হইতে দেশবরেণ্য নেতার কণ্ঠ দিয়া সেদিন যে মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা বিধাতার আদেশরূপেই জাতির চির-পালনীয়। আমাদেব কণ্ঠে সে মন্ত্রধ্বনি আজও ঝঙ্কার দিতেছে :

"আমরা সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কে সাক্ষ্য রাখিয়া, উত্তর-পুরুষদের সম্মুখে রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি—সাধ্যমত স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার করিব, বিদেশী সামগ্রী স্পর্শ করিব না। ভগবান্ আমাদের সহায় হউন।"

সুরেন্দ্রনাথ বলেন : "I had never before thought of this vow."—দিব্য প্রেরণার ইহাই বিশেষ লক্ষণ। তাঁর কথাটুকু তাঁরই বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই ক্ষেত্রে পাঠকদের উপহার দিলাম। ইহা হইতেই বুঝা যায়, সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে এই সময়ে কি মহতী তৃতীয় শক্তির লীলা চলিয়াছিল : "It was a sudden inspiration, prompted by the surrounding of the place. For a

time our critics said nothing; but soon the profound impression it created became apparent, and they thundered forth their anathemas. We noted them, but heeded them not, and pursued the even tenor of our ways."

এই অনির্ব্বচনীয় শক্তির যন্ত্রস্বরূপ তিনি সেদিন বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উন্মাদের ন্যায় পবিভ্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু পরীক্ষার আঘাতে ইহা হইতে বিচ্যুত হইলেন। মানুষের মনের কথা—যদি তিনি এই শক্তিমন্ত্রে উন্মাদ, সর্ব্বত্যাগী হইতেন, তাহা হইলে এই যে শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ অতিবাহিত হইল, আমরা যে তিমিরে সে তিমিরেই রহিলাম, ইহার অন্যথা হইত। যুগে-যুগে ভগবানের শক্তি যোগ্যতম ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া লীলায়িত হয়; কিন্তু কেহই খৃষ্টের মত আপনাকে পূর্ণাহুতি দিয়া নিঃশেষ হয় না। তাই আজিও শুনা যায়, "মৈ ভুখা হুঁ"—এ ক্ষুধা নিবৃত্ত করার অধিকার কাহার হইবে, কে জানে!

বরিশালের আগুন নিভাইবার জন্য নিখিল ভারতের নেতৃগণ উদ্যত হইলেন। বঙ্গভঙ্গ রোধ করিবার জন্য নিবেদনপত্র বহুবার প্রেরণ করা হইয়াছিল; কিন্তু লর্ড মর্লি বার-বার ইহা "Settled" fact" বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। বাঙ্গালী জাতি এই হেতু জীবনমরণ পণ করিয়া বহিষ্কারনীতি অবলম্বন করে। লবণ, কাপড়, শর্করার বর্জ্জনের সহিত রাজকর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত একযোগে কর্ম্ম করিতেও তাহারা অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের রাজকর্ম্মচারিগণের মোট বহিবার কুলী মিলিত না, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু বোম্বাই প্রদেশের প্রসিদ্ধ নেতা বাংলাব উত্তেজিত জনমত প্রশমিত করার জন্য যে সুযুক্তি দিতে আরম্ভ করিলেন, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ
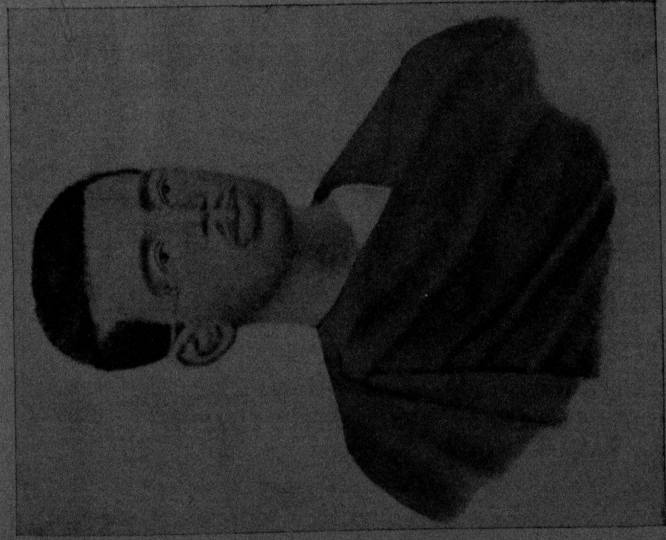
কানাইলাল দত্ত ॥ ১৮৮৭-১৯০৮ (ফাঁসি)
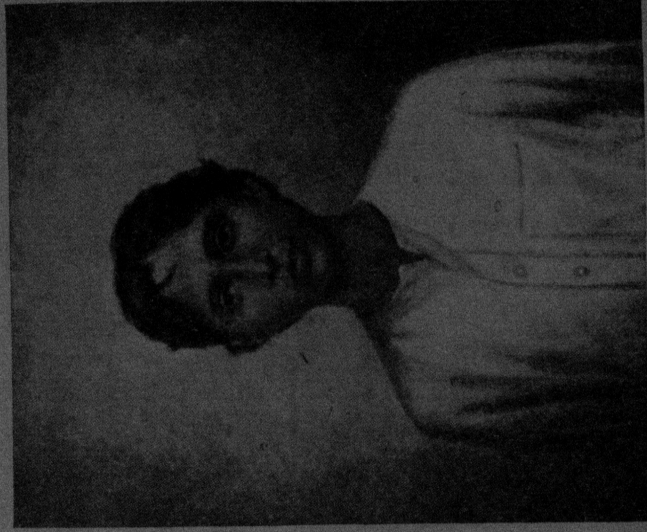
ক্ষুদিরাম বসু ॥ ১৮৮৯-১৯০৮ (ফাঁসি)

জননেতৃগণ তাহাই মাথা পাতিয়া লইলেন। তাঁহার 'Bengalee' পত্রে ধারাবাহিক সামঞ্জস্যের বাণী প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিল— স্বদেশী যজ্ঞে জীবন পণ করিয়া যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথের সুর পরিবর্ত্তিত হওয়ায় তাঁহারা বিচলিত হইলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ৭ই আগষ্ট উৎসবে, যে নরেন্দ্রনাথ সেন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া বাংলায় স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, তিনিই আবার দুই মাসের মধ্যে মত পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিলেন—"To say that educated India desires to be absolutely free of British control is absolutely idiotic and we are sure every thoughtful and cultured Indian will resent such a suggestion with the utmost indignation."

কথা বুদ্ধিমানের মত হইলেও, যে আগুন তখন জ্বলিতেছিল, তাহার সম্মুখে এইরূপ নরম কথা বলা খুবই সাহসের বিষয় ছিল। এই সাহস সুরেন্দ্রনাথের মতপরিবর্ত্তনের ফলেই হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ মিঃ গোখ্‌লের নিকট হইতে ভরসা পাইয়া বিলাতের পার্ল্যামেন্টে পুনঃ নিবেদন-পত্র প্রেরণের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; জাতির জাগরণ অপেক্ষা কোন প্রকারে বাঙ্গালীর জেদরক্ষা হইলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, এইভাবেই তিনি স্বীয় কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারিত করিয়া ফেলিলেন। যে সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে ভাবিবার অবসর দেন নাই, এক বৎসরের মধ্যে সমগ্র জগতের দৃষ্টি বাঙ্গালীর আন্দোলনের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তিনি লিখিলেন— "Bengal will have to work a little longer not historically, but rationally and strongly—making it clear that she will not accept the present partition." বলা বাহুল্য, এই সময়ে মিঃ

গোখ্‌লে বিলাত গিয়া বাংলার আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিবার জন্য বঙ্গভঙ্গ যাহাতে নাকচ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। রাজকর্ত্তৃপক্ষ সহজে যে আত্মমর্য্যাদাভঙ্গ করিবেন না, ইহা সকলেই জানিতেন। সুরেন্দ্রনাথ তাই বাংলার আন্দোলনকে হাতে রাখিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। যে প্রাণ একাগ্র হইয়া বাংলার জাতীয় প্রাণে নবশক্তিসঞ্চারে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা যে এইরূপ অবস্থায় নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িবে, ইহা সহজেই বুঝা যায়।

ইহা ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গের অনেক নেতার ভাবান্তর দেখা দিল। ঢাকার আনন্দচন্দ্র রায় স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের যুগে যে ভাবের কার্য্য করিয়াছিলেন, বরিশালের পর তিনি অন্য সুর তুলিলেন। মিঃ হেয়ারের পূর্ব্ববঙ্গ-পরিদর্শনের ধুয়া ধরিয়া তিনি তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য আয়োজন আরম্ভ করিলেন। বঙ্গভঙ্গনীতির বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর যে সঙ্কল্প, ইহাতে তাহা ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়া এক পক্ষ ইহার বিরুদ্ধ হইলেন। তাহা ব্যতীত, ঢাকার ব্যবস্থাপক সভায় তিনি যোগদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বাংলার নেতৃগণ যদি এইভাবে কার্য্য করেন, আর কেবল সভাসমিতিতে বঙ্গভঙ্গ-বিরুদ্ধ প্রস্তাব সমর্থন করিয়া জাতীয় জাগরণ সফল করার আশা রাখেন, তাহা একান্তই হাস্যাস্পদ ব্যাপার হইবে, ইহা তাঁহারা বুঝিতে চাহিলেন না। কলিকাতার নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা এই সব বিষয়ে নীরব হইয়া রহিলেন। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরী—ইঁহারা বয়কটপ্রচারে অগ্রসর হইলেও, ব্যবস্থাপক সভায় সহিত ইঁহাদের সম্পর্ক ছিল। সুরেন্দ্রনাথ এই সকলে উদাসীন থাকিতেন এবং কোন-কোন ক্ষেত্রে এইরূপ আচরণ তাঁর নিকট হইতে সমর্থিত

হওয়ায় দলাদলি চরম হইয়া উঠিল। "বন্দেমাতরম্" দৈনিক ইংরাজী পত্র নূতন দলের মুখপত্র-রূপে বাহির হইল। 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি' প্রভৃতি নূতন দৈনিক বাংলা পত্রে নেতাদের চরিত্রগত সমালোচনা বাহির হইতে লাগিল। পরলোকগত মতিলাল ঘোষ মহাশয় প্রত্যক্ষভাবে কোন দলে না থাকিলেও, তিনি সুরেন্দ্রনাথের আচরণের তীব্র ভাষায় সমালোচনা করিতেন। বাংলার এই সময়ের অবস্থা দেখিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নেতৃমণ্ডলীও চমৎকৃত হইয়াছিলেন, "If leaders like Babu Surendra Nath and Babu Motilal drag their private quarrels and jealousies into public affairs, India will be the worse for it. Babu Bipin Chandra Pal is now openly attacking Babu Surendra Nath and his followers." ইহা হইতেও বুঝা যায়—এক বৎসরের মধ্যে বাংলার স্বদেশী আন্দোলন কিরূপ আত্মবিরোধের সৃষ্টি করিয়া, উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছিল।

বাংলায় দুইটী বিরুদ্ধ পক্ষ মত ও পথের সংগ্রামে শক্তি-ক্ষয় করিতে আরম্ভ করিল। ইহা ব্যতীত তখন আর অন্য উপায় ছিল না; কিন্তু জনসমাজের মধ্যে স্বদেশীযুগের যে আগুন ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা নেতৃগণের মুখাপেক্ষায় নিভিয়া গেল না, প্রচণ্ড মূর্ত্তি লইয়া দেখা গেল। জাতিসাধারণের মধ্যে দুর্জ্জয় সাহস ও আত্মসম্মানবোধ স্বতঃই জাগিয়া উঠিল। যে বাঙ্গালী দশ টাকা মাহিনায় ইংরাজের গোলাম হইয়া থাকিত, দিনে দশ বার সেলাম ঠুকিয়া দুই-চারি বৎসর অন্তর দুই টাকা তলববৃদ্ধির জন্য সাহেবের মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত, বস্তুতঃ কোন আশা

ও আশ্রয়ের ক্ষেত্র না থাকিলেও, তাহারা অবনত মেরুদণ্ডকে প্রভুর সম্মুখে সোজা করিয়া তুলিয়া ধরিল, শ্রমের কড়ি না বাড়াইলে তাহারা কাজে ইস্তফা দিবার ভয় দেখাইতে কুণ্ঠা করিল না। বাঙ্গালী মসীজীবীর এই দর্প প্রভুর দল সহজে সহ্য করিল না, উপেক্ষা করিতে গিয়া প্রমাদ গণিল! একদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল—হাওড়া হইতে আসানসোল পর্য্যন্ত রেল লাইন, ষ্টেশন নীরব কোলাহলশূন্য; ষ্টেশনে যাত্রীর ভীড, টিকিট দিবার লোক নাই; কর্ত্তৃপক্ষগণের জিদে দুই-একখানি গাড়ী চলিলেও, যাত্রিগণ বিনা টিকিটেই যাতায়াত করিল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! কেরাণীকুল ভাতের ভাবনা ছাড়িয়া কেবল দেশের মহিমাপ্রভাবেই যে এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলিবে। এই রেল-ধর্ম্মঘটের ফলে, কত গৃহস্থ যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। দেশের এই সর্ব্বনাশ লইয়াও, নেতৃগণের মধ্যে দলাদলির বিরাম ছিল না। সুরেন্দ্রনাথকে এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া দেশের নিকট হইতে কত লাঞ্ছনাই যে ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা আর বলিবার নহে। তিনি এই সময়ে শিমুলতলায় ছিলেন। জাতির নেতার নিকট ধর্ম্মঘটকারিগণ যে দুঃখ জানাইতে যাইবে, ইহা আশ্চর্য্য কথা নহে; কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত ভাবে এই দারুণ অভাব কিরূপে নিবারণ করিবেন? প্রত্যুত, সেদিন একথা বুঝিতে কেহ চাহে নাই। স্বদেশযজ্ঞের পুরোহিতকে সর্ব্বশক্তিমান্‌রূপেই আমরা দেখিতে চাহিয়াছিলাম। যুগের শক্তি হইতে তিনি যতই দূরে পড়িতে লাগিলেন, তাঁর অক্ষমতা ততই প্রকট হইতে লাগিল—আর দেশময় সুরেন্দ্রনাথের কলঙ্কে আকাশ-বাতাস যেন ছাইয়া যাইতে লাগিল।

কেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মক্ষেত্রেই এই ধর্ম্মঘট আবদ্ধ রহিল না। ইহা দুঃখ-দুর্দ্দশার হেতু জানিয়াও, দেশের বাতাসে কি যে উন্মাদনা তখন ছুটিতেছিল, যাহার ফলে সর্ব্বত্র এই অশান্তি দেখা যাইতে লাগিল! বিশেষতঃ, জামালপুরের কুলি-ধর্ম্মঘট উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নিরস্ত্র অসহায় প্রজার হৃদয় লক্ষ্য করিয়া ইংরাজের আগ্নেয় অস্ত্র কি নিষ্ঠুর রূপে আঘাত দেয়, জামালপুরের ঘটনায় তাহা দেশের চক্ষে প্রথম বড় ভীষণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কুলীদের উদ্ধত অবস্থা দেখিয়া একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী—তাঁহার নাম এখনও বাংলার স্মৃতিতে জাগিয়া আছে—মিঃ ম্যাকমিলন অনায়াসেই জনতার উপর গুলী বর্ষণ করেন। জেনারেল ডায়ারের মত কীর্ত্তি বাংলায় স্বদেশী যুগেও দেখা দিয়াছিল।

এই সকল উত্তেজনা আশ্রয় করিয়া বাংলায় তরুণদের মধ্যে দল গড়ার প্রেরণা দেখা দেয়, ঐক্যবদ্ধ সমিতি গঠিত হইতে থাকে, জননেতৃগণের উপর শ্রদ্ধা হারাইয়া সমিতির নেতৃগণের উপরেই তরুণদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সমর্পিত হয়। "অনুশীলন সমিতি" "ব্রতী সমিতি" "আত্মোন্নতি সমিতি" প্রভৃতি নানা দল বাংলার চতুর্দ্দিকে যুবকশক্তিকে জাগাইয়া তুলে, নেতাদের সহিত ইহাদের বড় সম্পর্ক ছিল না। এই জন্য স্যার ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলারের হত্যার ষড়যন্ত্র যখন অজ্ঞাত যুবকদ্বয়ের নিকট হইতে সুরেন্দ্রনাথ প্রথম শ্রবণ করেন, তিনি বাংলার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আতঙ্কিত হইয়াছিলেন। একদিকে রাজ্যশাসনব্যবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষগণের হঠকারিতা, অন্যদিকে নেতৃগণের জাতীয় শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করার ঔদাসীন্য ও অক্ষমতা—দেশে বিপ্লবদলগঠনের সুযোগ দিয়াছিল। একদিকে মিঃ গোখ্‌লে বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া বাংলার উত্তেজনাস্রোতঃ রুদ্ধ করিবার জন্য যেমন এখানে

message পাঠাইলেন, "Agitate moderately, loyally, without obstinacy and folly and trust in Mr. Morley". নরম দলের নেতৃগণ আফিমের নেশায় অমনি ঝিমাইয়া পড়িলেন, গরম দল রুখিয়া জনমতকে জাগ্রৎ রাখার প্রয়াস করিলেন, আর তৃতীয় পক্ষ মাঝে-মাঝে "সোণার বাংলা" গোপন পত্র বাহির করিয়া দেশের প্রাণে স্বাধীনতার অগ্নিময় আকাঙ্খা জাগাইয়া তুলিতে লাগিলেন। বরিশালের রাষ্ট্রযজ্ঞে প্রবীণ-নবীন, নরম-গরম অভেদ হইয়া দেশের ভবিষ্যৎ-নির্ণয়ে যেমন তৎপর ছিল, বরিশালের পর তেমনি রাষ্ট্রশক্তি বিভক্ত-বিভিন্ন হইয়া নানা আকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল—এ জলতরঙ্গরোধের আর উপায় রহিল না। "রাখীবন্ধনের" দিন আবার সব এক হইল বটে; কিন্তু উদ্দেশ্য সেদিন সব ভিন্ন-ভিন্ন ছিল। "বন্দেমাতরম"-মন্ত্রদ্রষ্টা, নব যুগের ঋষি তখন সবে মাত্র লেখনী ধরিয়াছেন। আমরা সেদিনের চিন্তাধারা পাঠ করিয়া আবৃত্তি করিলাম:

> "Perish policy and cunning,
> Perish all that fear the light—
> Whether winning, whether losing,
> Trust in God and do the right."

॥ সতের ॥

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের "রাখীবন্ধন উৎসব" খুব সমারোহেই সম্পন্ন হইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমানের ঘরে সেদিন রন্ধনের আগুন জ্বলে নাই; সারাদিন দেশের জয় গাহিয়া উপবাসে দিন কাটিয়াছিল, বাজার-হাট বন্ধ ছিল। অপরাহ্নে বাংলার সর্ব্বস্থানে সভা করিয়া বাঙ্গালী বিদেশী বর্জ্জন করার শপথ গ্রহণ করিয়াছিল। প্রাতঃকালে নদীতীরে অসংখ্য নারীপুরুষ জাতিবর্ণনির্বিবশেষে পরস্পরের হাতে পরস্পর রাখী বাঁধিয়া গান গাহিয়াছিল:

এক দেশ, এক ভগবান্,
এক জাতি, এক মন-প্রাণ।

কলিকাতা রাজপথে পথিকদের পাদুকা মোচন করার ধুম পড়িয়াছিল। সকলেই স্বেচ্ছাসেবকদিগের কাতর মিনতি পালন করিত, তাহা নহে; দোলের উৎসবে ফাগুয়া লইয়া যেমন হাতাহাতি হইয়া যায়, "রাখীবন্ধন উৎসবে"ও তেমনি পাদুকা মোচন করার প্রস্তাব শুনিয়া অনেকে চটিয়া যাইতেন—তর্কাতর্কির পর পুলিস ডাকাডাকিও বাদ পড়িত না।

নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটায়, দলাদলি লইয়া অনেক অপ্রিয় কথাই কাগজপত্রে প্রচারিত হইত। কিন্তু দেশের তরুণ সেদিন জাগরণের জোয়ারে গা ভাসাইয়াছে; উপর হইতে কোন নির্দ্দেশ পাইলে আর রক্ষা নাই, প্রাণ দিয়া তাহা একযোগে পালন করার চেষ্টা হইত। "রাখীবন্ধনের" নির্দ্দেশপত্র সারা বাংলায় বর্ণে-বর্ণে প্রতিপালিত হইত। "রাখীবন্ধনের" দিন বাজার-হাট বন্ধ থাকিত

রাজকর্ত্তৃপক্ষগণের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও অখণ্ড বাংলায় জাতীয় ভাবরক্ষায় কেহ কুণ্ঠা করিত না, কেহ ইহার ব্যত্যয় করিলে তার লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। এই বৎসরে "রাখীবন্ধনের" উৎসবানুষ্ঠান উপেক্ষা করিয়া নোয়াখালীর "সুহৃদ্" নামক একখানা পত্রিকার সম্পাদক ঐদিন মাংস রন্ধন করিয়া আমোদ করিয়াছিলেন। ইঁহার বাড়ী বরিশালে। শ্যামাপূজার সময়ে তিনি পুরোহিত পান নাই। দেশমত-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করার প্রবৃত্তি যেখানে দেখা যাইত, দেশের প্রাণশক্তি সেখানে উদ্বুদ্ধ মূর্ত্তিতে তাহার প্রতীকারে উদ্যত হইত। এইসব সামান্য ব্যাপার লইয়া অনেকের অর্থদণ্ড, এমন কি কারাবন্ধনও ভাগ্যে ঘটিয়াছিল।

এই বৎসরের উৎসব একটী কারণের জন্য আমাদের মনে চিব স্মরণীয় হইয়া আছে। দেশনেতৃগণের নির্দ্দেশমত, আমরাও প্রাতঃ-কালে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইতাম। রাত্রি শেষ হইতে-না-হইতে চতুর্দ্দিকে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলিত। শিশিরসিক্ত দূর্ব্বাক্ষেত্রের উপর দিয়া আমরা শত-শত তরুণ মাতৃবন্দনা গাহিতে-গাহিতে যখন স্নানের জন্য বাহির হইতাম, তখন দেশেব হাওয়ায় কি যে আশা ও উৎসাহের সন্ধান পাওয়া যাইত, তাহা ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে। আমরা সকলেই হরিদ্রারঞ্জিত উষ্ণীষ মাথায় পরিতাম; অঞ্জলি-অঞ্জলি ফুলদল গঙ্গাস্রোতে ভাসাইয়া নবারুণরঞ্জিত গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দিয়া পড়িতাম—শতকণ্ঠে ধ্বনি উঠিত "হরে মুরারে, হরে মুরারে।" স্নানান্তে পরস্পরের হস্তে রাখী বাঁধিয়া তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত নগরকীর্ত্তন করা হইত। তাহার পর একত্র হইয়া ফলাহার সমাপন করিয়া অপরাহ্ণে বিরাট্ সভায় শত-শত কণ্ঠে বিদেশিবর্জ্জনের শপথ গ্রহণ করিতাম। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেহই সেদিন "স্বদেশী" বলিয়া দূরে থাকিত না। এই জাতীয় উৎসব বাঙ্গালী

মাত্রেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। এই সকল অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমরা দ্বারে-দ্বারে মঙ্গল-কলস, কদলীতরু, শাখা-পল্লবের মালা-স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। বাংলার নয়নমণি কানাইলাল তখন আমাদের সঙ্গে সকল কর্ম্মেই যোগ দিত, সেও ইহাব অন্যথা করে নাই ; কিন্তু তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর, ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী বলিয়াই হউক অথবা এইরূপ আডম্বর তাঁহার চক্ষে নিতান্ত অশোভন বলিয়া বোধ হওয়ায়, পাদুকাপ্রহারে সব কিছু দূর করিয়া দিয়াছিলেন। আমাদের এই দিনের ব্যথিত স্মৃতি স্পষ্ট হইয়াই আছে। কেননা, কানাইলাল অভিভাবকদের একান্ত বাধ্য ছিল, বয়োজ্যেষ্ঠদের সহিত কোনদিন সে বিরোধ করে নাই। স্বদেশভক্তি-প্রণোদিত হইয়া সে শেষে উন্মাদ হইয়াছিল, এই ইতিহাস অন্যত্র প্রকাশ করিয়াছি। এই ঘটনায় তাহার সেদিনের সেই বিষণ্নমূর্ত্তি, ক্ষোভ-দুঃখ-অভিমানমিশ্রিত চক্ষের অজস্র অশ্রু আমাদেরও অন্তঃকরণকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। আমরা যখন নিরুপায় হইয়া ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ়, তখন তাহার মাতুল পরলোকগত নন্দকুমার দত্ত মহাশয় পথ হইতে ঘট ও পল্লবমালা কুড়াইয়া বাড়ীর স্বতন্ত্র দরজায় স্থাপন করিয়া আমাদের সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। ইঁহার মুখে ভাষা ছিল না ; কিন্তু অন্তরে অকৃত্রিম দেশানুরাগের পরিচয় বহু বার পাইয়াছি। তাঁর আশ্রয়েই কানাইলাল লালিত, পালিত, বর্দ্ধিত ; তাঁর স্নেহময় ক্রোড়েই কানাইলালের শিক্ষা ও নবজীবনের আরম্ভ। তাঁর অঙ্গনে সে সময়ে প্রতিদিন অপরাহ্নে শত-শত তরুণ গিয়া লাঠি খেলিত, ব্যায়াম-চর্চ্চা করিত, স্বদেশযজ্ঞের অগ্নিরক্ষা করিত। স্বদেশীযুগের স্মৃতির সহিত নন্দবাবুর জীবনও জড়িত ছিল ; ফল্গুধারার পরিচয় দেশ রাখে নাই, কিন্তু এইখানেই যুগের সত্য ইতিহাস লুকাইয়া থাকে।

একদিকে "রাখীবন্ধনের" মহাধূম, অন্যদিকে এই বৎসর হইতেই ইহার বিরুদ্ধতা প্রকাশ্য মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল। দেশের নেতারা যেমন নির্দ্দেশ দিলেন :

(১) হিন্দু-মুসলমান কোন বাঙ্গালীর রন্ধনশালায় আজ আগুন জ্বলিবে না।

(২) প্রত্যেকেই সামান্য ফল-দুগ্ধ খাইয়া সারাদিন এই পতিত জাতির প্রভু, যিনি রাজার রাজা, তাঁহার প্রার্থনা, উপাসনা করিবেন।

(৩) বাঙ্গালী জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বিদেশিবর্জ্জনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিবে, স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার করিয়া দেশের অর্থদ্বারা কাপড়ের কল, তাঁত, চরকা প্রতিষ্ঠা করিবে।

(৪) স্নানান্তে ভায়ের হাতে রাখী বাঁধিয়া দুঃখে-বিপদে পরস্পরের সহকারী হইব, এই প্রতিজ্ঞা করিবে।

ঢাকায় সলিমুল্লা ইস্তাহার বাহির করিলেন "অদ্য মধ্যাহ্নে, সহরের ভিন্ন-ভিন্ন মহল্লায় সর্দ্দারগণ সদলবলে ময়দানে উপস্থিত হইয়া নামাজ পড়িবে। বঙ্গভঙ্গবিধি প্রবর্ত্তন করার জন্য সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবে। কাঙালীভোজন হইবে। সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইবে। নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হইবে।"

ঢাকার এই নীতি পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য জেলায়ও চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ময়মনসিংহে "রাখীবন্ধনের" শোভাযাত্রা বন্ধ করিতে হয় ; কেননা, মুসলমানগণও বঙ্গভঙ্গপ্রতিবাদের বিরুদ্ধে শোভাযাত্রার আয়োজন করিয়াছিল। পুলিসসাহেব মিঃ বডিস্ হিন্দুনেতৃদের পথে দাঙ্গা হইলে তাহার জন্য তাঁহারা দায়ী হইবেন কি না, এইরূপ সর্ত্তে সহি চাহিয়াছিলেন। হিন্দুনেতৃগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

মুসলমান নেতাদের উপর এইরূপ দাবী করা হইয়াছে কি না'। তাহাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—"I would stand guarantee for the Mussalmans." রাজকর্তৃপক্ষগণের এইরূপ পক্ষপাতিত্ব-দোষেই বাংলায় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিরোধের আগুন জ্বলিয়া উঠে; নতুবা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাও প্রথম যোগদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমান অস্বতন্ত্র রূপেই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিল; কিন্তু যেদিন হইতে স্যার ফুলার মুসলমানদিগকে তাঁর প্রিয়তমা পিয়ারী পত্নীর আসনে বসাইয়া সোহাগ করিলেন, সেইদিন হইতেই এক দেশ ও এক স্বার্থ ভুলিয়া মুসলমান ভ্রাতৃগণ হিন্দুদের হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িলেন। বাংলার এই রাষ্ট্রীয় আন্দোলন একমাত্র হিন্দুদিগকেই বহন করিতে হইয়াছিল। যে দুই-একজন মুসলমান নেতা স্বদেশীযুগের প্রচারক ছিলেন, মুসলমান সমাজে তাঁহাদের তাদৃশ প্রভাব থাকে নাই—হিন্দু-মুসলমানবিরোধ ক্রমে কি ভীমমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহা পরে দেখাইব।

স্বদেশযজ্ঞ পণ্ড করিবার জন্য অদৃশ্য হস্তের ক্রীড়া চলিতেছিল। ইহা ব্যতীত বহুদিনের পতিত জাতির জীবন এমনই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, কার্য্যকালে তাহা অচল হইয়া পড়িত। "রাখীবন্ধন উৎসবের" পর কোন নেতা চা-বিস্কুট খাইয়া দিন যাপন করিয়াছে, তাহার আন্দোলন একমাস কাল চলিয়াছিল—খবরের কাগজেও ইহা লইয়া আলোচনা হইত। একটা মরা জাতিকে বাঁচাইতে হইলে দেশের সাহিত্য যে অব্যর্থ উদ্দেশ্য লক্ষ্যে রাখিয়া চলা উচিত, অনেক ক্ষেত্রেই তাহার ব্যত্যয় হইত; বরং জীবনের পথ-নির্দ্দেশ না দিয়া নেতৃগণকে দেশের চক্ষে হেয় অপদার্থ করিয়া তুলিবার জন্য অজস্র

শক্তিব্যয় হইত। হতভাগ্য জাতির দুর্ভাগ্যের কথাই ইহাতে ব্যক্ত হইত। যাঁহারা জাতিকে জাগরিত করিতে মাথা তুলিয়াছিলেন, কারও দোষ না দিয়া তাঁহারা স্বখাত-সলিলে ডুবিতে লাগিলেন, জাতিব অগ্রগতি তাঁদের আচরণেই শ্লথ হইয়া পড়িল, তাঁহারাই ইহার পরিপন্থী হইয়া পড়িলেন। দেশের মনীষী যাঁরা, তাঁরাই সেদিন ভুলিলেন যে, চরিত্রবিশ্লেষণে জাতিব জীবন জড়াইয়া যে আবর্জ্জনা তাহা দূর হয় না, জাতিকে জাগাইতে হইলে আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হয়; মিথ্যাকে প্রমাণ করিতে হয় না, ধর্ম্মেব ঢাক আপনা হইতেই বাজে। কিন্তু সে কথা সেদিন শুনিবে কে? নরম-গরম দলের বিরোধ বড় কদর্য্য-মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইত। তরুণদের বুকের আগুন "যুগান্তর" তখন জ্বালাইয়া রাখিত। সে যুগের হাওয়া "সন্ধ্যা", "নবশক্তি", "যুগান্তর" ও "বন্দেমাতরম্—ইহারাই রক্ষা করিয়াছিল।

সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃগণ দেশের সামর্থ্য বুঝিয়াই চলিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাণ জাগিলে, হিসাবজ্ঞান কে রাখিতে চাহে? এইজন্য তরুণেব চাঞ্চল্য সেদিন নিয়মিত করা কাহারও সাধ্যে কুলায় নাই। বিপিনচন্দ্র যুগের শক্তি মাথা পাতিয়া ধরিতে উদ্যত হইলেন; তাঁর পশ্চাৎ ছিলেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। দেশের বিষাক্ত প্রাণসমুদ্র আলোড়িত করিয়া অমৃত আহরণ করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি অশান্তির ঝড়েই দেশের হাওয়া বিশুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্রের কণ্ঠে শিবের বিষাণ বাজিল। বাংলার পল্লীতে-পল্লীতে বিপিনচন্দ্র চারণবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্ম চাপা পড়িয়া গেল। উপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলেন পণ্ডিত শ্যামসুন্দর, সামাধ্যায়ী ও মনীষী পাঁচকড়ি। বিপিনচন্দ্রের বন্দনায় ইঁহাদের লেখনী সহস্রমুখী

হইয়াছিল ; সুরেন্দ্রনাথ ইঁহাদের মুন্সিয়ানায় দেশের শ্রদ্ধা হারাইলেন। কলিকাতার কংগ্রেসমণ্ডপে তাই তিনি যখন বক্তৃতা করিতে উঠিলেন, তখনই বুঝা গেল—যাঁর কম্বুকণ্ঠের দেশবন্দনা শুনিতে বাঙ্গালী উৎকর্ণ হইত, সে কণ্ঠ সকলের কাছে আজ শ্রুতিকটু। দেশের প্রকৃতি যাহা, তাহাই সেদিন ফুটাইয়া তোলা হইয়াছিল, অপ্রাকৃত অসাধারণকে আমরা আহ্বান করি নাই। প্রকৃতি একদিন সুরেন্দ্রনাথকে মাথায় তুলিয়াছিল, সে যেন কেবল আছাড় দিয়া ফেলিবার জন্য। প্রকৃতির এই নিত্য-ক্রীড়ার গতি স্তব্ধ করিয়া আমরা তাঁহাকে নেতার আসনে অচল রাখিয়া দেশের সামর্থ্যকে জাগাইয়া তুলিতে পারি নাই ; তাঁহাকে হতমান হইতে দেখিয়া আনন্দই অনুভব করিয়াছি। প্রকৃতির নিষ্ঠুর প্রতারণা—প্রকৃতির হাতেই আজ ইহার প্রায়শ্চিত্ত-বিধি দেখিয়া আমরা বিস্মিত নহি। স্বভাবের আবর্ত্তে এ জাতি ঘুরপাক খাইতেই যে চাহে !

বিপিনচন্দ্রের আবাহনে, পুরনারীর ফুৎকারে সহস্র-সহস্র শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। তাঁহার মাথায় অলিন্দ হইতে লাজবর্ষণ হইল। তিনি দেশের নেতা হইয়া কলিকাতার কংগ্রেসে বিজয়দর্পে নূতনের আবির্ভাব ঘোষণা করিলেন। সেদিন বিপিনচন্দ্রের অমানুষিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি দেখিয়া এই নবযুগের পুরোহিতকে আমরা ত্রাণকর্ত্তা বলিয়াই বরণ করিয়াছিলাম। প্রকৃতির প্রতিশোধ—বরিশালে তাঁহাকে 'লজিক' ও 'ম্যাজিকে'র গোলকধাঁধায় আবার বিপন্ন দেখিলাম। অব্যর্থ দৃষ্টি লইয়া অখণ্ড নেতৃত্বের অধিকার স্বভাবের ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য বলিয়াই বোধ হয়।

বাংলায় কংগ্রেসের সভাপতি-নির্ব্বাচন লইয়া বিবাদ বাধিল। নরম-গরম দলের মধ্যে নানারূপ আলোচনা-আন্দোলন চলিতে

লাগিল। হিউম, ওয়েডারবার্ণ প্রভৃতি পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিৎ পণ্ডিতগণ-প্রবর্ত্তিত এই কংগ্রেসবেদী লইয়া ভারতীয় নেতৃগণের মধ্যে যে উত্তেজনাব স্রোতঃ বহিল, বাংলার অগ্নিহোতৃগণের মনে তাহার আঁচড়ও সেদিন স্পর্শ করে নাই। কেননা, মার্চ্চ মাস হইতে এই ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বাঙ্গালীর বাণী সেদিন মুখ্যতঃ "যুগান্তর"ই বহন করিতেছিল এবং সে বাণীর নির্দ্দেশ—"পূর্ণ স্বাধীনতা"। এই স্বাধীনতার পথ নির্দ্দেশ করিতেও ইহা কুণ্ঠা কবিত না। হিসাব-বস্তু যখন উত্তেজনার মোহে হাবাইয়াছে, তখন সে পথে যাত্রীর সংখ্যা—কর্ম্মে যত না হউক, ভাবের মানুষ অনেক গডিয়া উঠিয়াছে। এই ভাব ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আরও বস্তুতন্ত্র মূর্ত্তি লইয়া ফুটিতে চাহিয়াছে। দেশের নেতা যাঁহারা, তাঁহাবা সেদিন কংগ্রেসের বেদীতে বসিয়াই দেশের মুক্তি অবধারিত, এই জ্ঞানে নিজেদের মধ্যে আন্দোলন লইয়াই ব্যস্ত—দেশের প্রাণশক্তি কোন পথে, তাহার সঠিক খবর তাঁহাবা রাখেন নাই। এইজন্যই বাংলায় ভবিষ্যতে এমন দিন আসিয়া পড়িল, যেদিন নেতা বলিয়া আর কেহই রহিলেন না; শৈবালের মত তাঁহারা কেবল উপবে-উপরে ভাসিয়াই বেডাইতেছিলেন, প্রলয়তরঙ্গে কোথায় কে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িলেন, তাহার আর ঠিকানা থাকে নাই।

সে যাহা হউক, মধ্যপন্থীরা চরমপন্থীদেব কণ্ঠ রোধ করিবার জন্য কংগ্রেসের সভাপতিনির্ব্বাচনে ব্যস্ত হইয়া পডিলেন। অনেক ভাবিয়া তাঁহারা ভারতসেবী দাদাভাই নৌরোজীকে বিলাতের পার্লামেন্ট হইতে টানিয়া আনিলেন। তিনি বয়োবৃদ্ধ দেশসেবী—এই আশী বছরের প্রবীণ নেতার নাম উঠিলে, বাংলার চরমপন্থী দল কেবল দেশবরেণ্য দাদাভাই নৌরোজীর সম্মানের খাতিরেই

আন্দোলন বন্ধ করিলেন। লালা লাজপত ও মহামতি তিলককে কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিবার জন্যও বাংলার চরমপন্থী দল সেদিন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

নিখিল-ভারত-রাষ্ট্রসভায় সুরেন্দ্রনাথ যখন বক্তৃতা করিতে উঠিলেন, জনমণ্ডলী তাঁর বাণীর ঝঙ্কারে যে সাড়া তুলিত, সেদিন তাহার কোন লক্ষণ দেখা দেয় নাই। তাহার কারণ আর অন্য কিছু নহে; দেশের প্রাণ তখন মুক্তির্ পথ নিজের সাধ্যের উপর নির্ভর করে, এই বোধে প্রাণ দিতে কৃতসঙ্কল্প। যখন সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন "......There had sprung up a new action among the leaders and the people who had lost all confidence in political agitation, in constitutional protest and in sending petition to the Government .....But I am not in accord with them, there is utility in political agitation." —আর রক্ষা নাই, কংগ্রেসের চতুর্দ্দিক্ হইতে "না"-"না" শব্দ উত্থিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ চীৎকার করিয়া বলিলেন "You may say 'no,' till the end of your life, but you cannot convince me. I am sixty years old..." দেশ বুঝিল—মুক্তির পথে সুরেন্দ্রনাথের যে বিধান, তাহা তাহাদের পক্ষে পালন করা এখন দুঃসাধ্য। দেশ সেদিন নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে চায়। এই স্বাবলম্বী হওয়ার সাধনায়, রাজশক্তির বিরুদ্ধে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষ্য করিয়া যে বিদ্বেষ প্রচারিত হইয়াছে, এবং রাজশক্তির উপর দেশের তখন যেরূপ মনোভাব, তাহাতে ইহা ভাবিতে প্রবৃত্তি হয় না। কাজেই এইরূপে ধীরে-ধীরে সুরেন্দ্রনাথ দেশের অন্তর হইতে বিসর্জ্জিত হইলেন।

কলিকাতার কংগ্রেসে বঙ্গভঙ্গনীতির প্রতিবাদ, জাতীয় শিক্ষা, বিদেশিবর্জ্জন ও স্বায়ত্তশাসন—এই চারিটী প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বাঙ্গালীজাতি প্রথম প্রস্তাব ব্যতীত, আর কোন প্রস্তাবই পূর্ণভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই। পরন্তু অপর তিনটী সুসিদ্ধ হওয়ার উপরেই জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

দাদাভাই নৌরোজীর সভাপতিত্বে বাঙ্গালী নূতন কিছু লাভ না করুক, তাহারা ইংরাজী শব্দের অনুবাদ "স্বায়ত্ত শাসনের" পরিবর্ত্তে "স্বরাজ"-শব্দটী ব্যবহার করার সুযোগ পাইয়াছে। রাষ্ট্রের লক্ষ্য-প্রকাশের ভারতীয় ভাষা এতদিন অনাবিষ্কৃত ছিল, প্রবীণ রাষ্ট্রবিদের মুখ দিয়া বিধাতা ইহা বাহির করিলেন। এই "স্বরাজ" শব্দটীই জাতিকে সেদিন উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। "ইংলিশম্যান" লিখিয়াছিলেন: ' The Swadeshi cry was bound to fail, because it wes based on wrong economic principles, but the Swaraj cry has before it the possibilities of the gravest mischief. He came, it was believed to check the extremists, whereas he has blessed them altogether." বস্তুত: ভারতের জাতীয় সাধনার পুরোহিতরূপেই দাদাভাই জাতিকে "স্বরাজ"-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন। সে মন্ত্রের সাধন জাতি কত যুগ ধরিয়া করিবে, কে জানে?
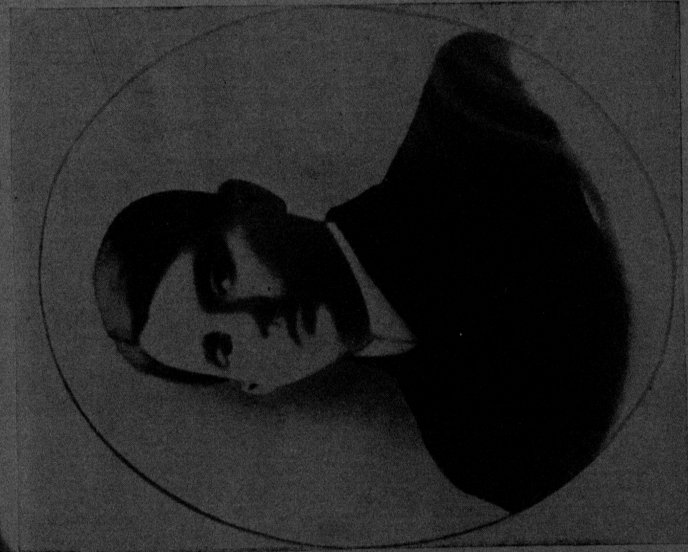
যতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী (বাঘা যতীন) ॥ ১৮৮০-১৯১৫
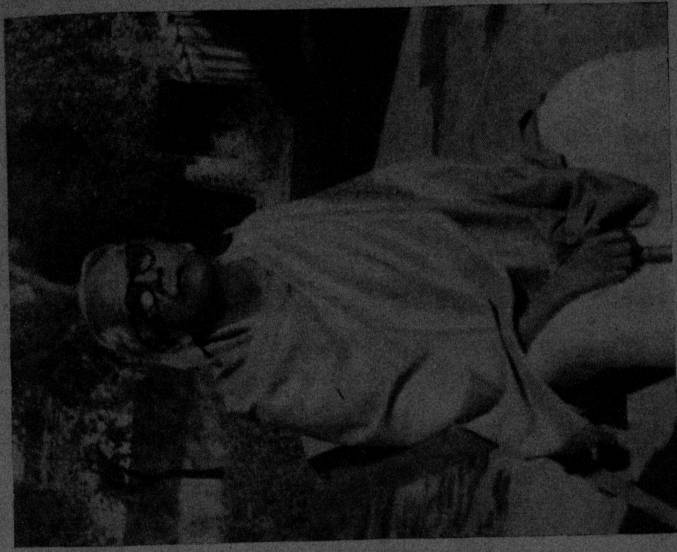
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ॥ ১৮৮০-১৯৫৯

॥ আঠার ॥

কলিকাতায় কংগ্রেস শেষ হইল। কিন্তু নরম ও গরম দলে যে বিরোধ বাধিয়াছিল, তাহার শেষ হইল না। আগুন নিভিল না, বাংলার আগুন সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িল।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই পাঞ্জাব রুদ্র শঙ্খে ফুৎকার দিল; মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রতিধ্বনি তুলিল—সঙ্গে-সঙ্গে বাংলা আরও প্রলয়-মূর্ত্তি ধারণ করিল। নরম দলের নেতৃবৃন্দ প্রমাদ গণিলেন। গরম দল ইন্ধন যোগাইলেন। আগুন ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

পঞ্জাবে গোল বাধিল—চেনাব-ক্যানেল কলোনীর বারিদোয়াব খালের খাজনাবৃদ্ধি-ঘটিত সংশ্রবে রাজকর্তৃপক্ষ যেমন বাংলার প্রজা-সাধারণের মত-বিরুদ্ধ কর্ম্ম-নিবন্ধন বাঙ্গালীর অসন্তোষ-বৃদ্ধি করিলেন, পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট তদ্রূপ বারিদোয়াব ক্যানেলের রাজস্বের হার বাড়াইয়া পঞ্চনদেও প্রলয়-ঝড় তুলিলেন।

"পাঞ্জাবী" নামক দৈনিক পত্রে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ বাহির হইল। তৎক্ষণাৎ স্বত্বাধিকারী ধৃত হইলেন। রাজপথের উপর দিয়া বন্দীকে হাতকড়া পরাইয়া লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহার চশমাখানিও কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। সারা পঞ্জাব উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বিচারালয়ের শান্তিরক্ষায় সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করা হইল। সম্পাদকের উপর দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও হাজার টাকা জরিমানা বিহিত হইলে, উন্মত্ত জনসঙ্ঘ অমৃতসহরে ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি করিল। দুই মাসের মধ্যে পঞ্জাবে আঠাশটী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল সভায়, লালা লাজপত রায় ও

অজিত সিংহ বক্তৃতা করিলেন ; তাঁহাদের কণ্ঠে সেদিন শিবের বিষাণ গর্জ্জন তুলিয়াছিল। পঞ্জাবের দেশীয় ভাষায় "ইণ্ডিয়া" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক রাজদ্রোহ প্রচার করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইলেন। পঞ্জাবের রেলে ধর্ম্মঘট হইল। শিখসৈন্যদের উত্তেজিত করিবার জন্য নানা পুস্তিকা প্রচারিত হইল। রাওয়ালপিণ্ডি, অমৃত-সহর ও চেনাব-ক্যানেল-কলোনীতে লুঠপাট আরম্ভ হইল। পঞ্জাবের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা স্যার ডেনজিল ইবেট্‌সন ঘটনা দেখিয়া রাজ্য-রক্ষায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি সিমলা শৈলে ভারত-প্রতিনিধিকে জানাইলেন—'Exceedingly dangerous and urgently demanding remedy." আর রক্ষা নাই, বৃটিশ দুর্গ হইতে দলে-দলে সেনাবাহিনী বাহির হইয়া অশান্তিদমনে প্রবৃত্ত হইল। প্রধান বিচারালয়ের বিচারকবর্গ, কলেজের অধ্যাপক, গভর্ণমেণ্টের উচ্চকর্ম্মচারিবৃন্দ স্বেচ্ছাসৈনিক হইলেন। পঞ্জাবে সামরিক বিধি প্রবর্ত্তিত হইল। তাহার পর ধরপাকড়ের পালা উচ্চ আদালতে ছয়জন আইনজীবী অতিশয় সাহসের সহিত দেশীয় পক্ষে যোগদান করায়, তাঁহারা উপদ্রবসৃষ্টির সাহায্যকারী বলিয়া ধৃত হইলেন। পঁয়তাল্লিশ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সহিত অসংখ্য লোক দাঙ্গার অভিযোগে কারারুদ্ধ হইলেন। অজিত সিংকে পঞ্জাববাসী একাদশ গুরুপদে বরণ করিবার প্রস্তাব তুলিল ; কিন্তু উহা গুরুধারার বিধি-বহির্ভূত হওয়ায়, কার্য্যে পরিণত হওয়ার সম্ভব হয় নাই। সর্দ্দার অজিত সিং আত্মগোপন করিলেন। ৯ই মে লাজপত রায়কে তিন আইনে বন্দী করা হইল। অজিত সিংহকে ধরিবার জন্য ৫০০৲ শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। পঞ্জাবের পাঁচটী ক্যানেল ডিষ্ট্রিক্টে সভাবন্ধ আইন প্রবর্ত্তিত হইল। ৩রা জুন তারিখে

অজিত সিংহকে মুণ্ডিতকেশশ্মশ্রুগুম্ফ, কটিতট-লম্বিত ছদ্মবেশে ধৃত করা হয়, তিনি এই বেশে রাওয়ালপিণ্ডিতেই লুকাইয়াছিলেন। এই সকল সংবাদ বাংলায় অতিরঞ্জিত করিয়া প্রচার করা হইত। পঞ্জাবের বীরকীর্ত্তি ইতিহাস-পাঠক বাঙ্গালী ছাত্রদের নিকট অবিদিত ছিল না; লাজপত ও অজিত সিংহকে নির্ব্বাসিত করার পশ্চাৎ কি প্রকাণ্ড বিপ্লব-রহস্য লুকাইয়া আছে, যাহা রাষ্ট্রকর্ত্তৃপক্ষ চাপিয়া রাখিয়াছিলেন —তাহা জানিবার প্রতীক্ষায় পঞ্জাবের দিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি অপলক হইয়াই থাকিত। বিশেষতঃ, লাজপতকে তিন আইনে নির্ব্বাসন করার সহিত সরকারী কাগজপত্রে প্রচার করা হইয়াছিল "He is alleged to have raised a Jat army for rebellion and overthrow of British Government". কলিকাতার মোড়ে-মোড়ে বাংলার তরুণদল রক্তাক্ষরে ছাপিয়া প্রকাণ্ড কাগজ লটকাইয়া দিয়াছিল "For one Lajpat a hundred Lajpats will arise". হায় স্বাধীনতা, সে কত আশা! লাজপত ও অজিত সিংহ সেদিন বাঙ্গালীর হৃদয়ে বসিয়া দেবতার পূজা পাইয়াছিলেন। কল্পনারাণীর তুলির রঙ কালের নিষ্ঠুর হস্তে কিরূপ ম্লান হইয়া যায়, তাহা সেদিন ও এদিনের চিত্র পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করার সুযোগ যে পাইয়াছে, সে ছাড়া অন্যে বুঝিবে না।

নভেম্বর মাসে রাজার জন্মতিথি উপলক্ষে লালা ও অজিত সিংহ উভয়েই মুক্তিলাভ করেন। অজিতের খবর আর কেহ রাখে নাই; সেদিনের বীর-টীকা ললাটে আঁকিয়া লাজপত জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বাধীনতারই সাধনা করিয়াছেন। লালাজী বাঙ্গালীর শ্রদ্ধার্ঘ্য জীবনযুগে পাইয়াছিলেন, অনন্তযুগ ধরিয়া বাংলায় তাঁর পূজা চলিবে।

অন্য দিকে, বিপিনচন্দ্র মাদ্রাজের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে, বাংলার বাণী বহন করিয়া বেড়াইতেছিলেন। মাদ্রাজের তরুণ প্রাণ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা পাইয়া বাংলার সহিত একযোগে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। রাজমহেন্দ্রীর একজন হিন্দু মহিলা বিপিনচন্দ্রের নবজাতীয়তার প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার জন্য ২৫০০০৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুতা হইয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্র কলিকাতা কংগ্রেসের বাণীই তাঁর অতুলনীয় প্রতিভাসংযুক্ত করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন :

"The present method is mendicancy ; its best work is the creation of discontent. The new spirit organised this discontent into self-reliant activity far Swaraj, Swadeshee, Boycott, National Education and organising measures for practical Self-Government."

বিপিনচন্দ্রের প্রচারেই মাদ্রাজে অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠে। পরাধীনতার নাগপাশে হৃতচৈতন্য জাতির কর্ণে জাগরণের সত্য মন্ত্র ঝঙ্কার তুলিলে, মুক্তির আকুলতায় যে অভিব্যক্তি হয়, মাদ্রাজে তাহার নিদর্শন দেখা গিয়াছে। রাজমহেন্দ্রীতে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উঠিতেই, ডাক্তার ক্যাম্প সাহেব বিরক্ত হইয়া রাজমহেন্দ্রীর কলেজের কর্তৃপক্ষদের ইহার যথারীতি প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতে বলেন। ইহাতে ছাত্রমহলে বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, ব্যথিত জাতির আত্মসম্মানরক্ষার প্রেরণা প্রবল হইয়া উঠে। রাজমহেন্দ্রীর অধিবাসিবর্গ নীরব রহিল না, রাজপুরুষদের সহিত সংঘর্ষ ঘটিল। ভীষণ দাঙ্গার বিবরণ কলিকাতার সংবাদপত্রে বাহির হইল। পাঞ্জাবের ঘটনায় বাংলা তাতিয়াছিল, মাদ্রাজের সংবাদে আরও মাতিয়া উঠিল।

সামরিক সেনাদল-কর্তৃক রাজমহেন্দ্রীর শান্তিরক্ষা করা হয়। কলেজ হইতে তুই শত ছাত্র বিতাড়িত হইয়াছিল। রাজমহেন্দ্রীর পর কোকনদে ঝড় উঠিল। রাজকর্তৃপক্ষগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব যখন মূর্ত্তি লইতে চাহে, তখনই তাহা দাঙ্গা-হাঙ্গামা-রূপে দেখা দেয়-আর তখনই সামরিক সেনাদল বাহির হইয়া দেশের শান্তি রক্ষা করে। ইহার ফলে, দেশবাসীর নির্য্যাতন ভিন্ন অন্য কিছু হয় না। দেশের কাজে বুকের রক্তপাত করা তখন নূতন কথা। এই সকল অশান্তি-মূলক সংবাদ তখন জাতীয়তা-সাধনের নিদর্শন-রূপে গণ্য হইত। কোকনদে তিনজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির এই ঘটনায় আঠার মাস কারাদণ্ড হয়, শতাধিক লোক ধৃত হয়, প্রায় ৫২ জন কারাদণ্ড মাথা পাতিয়া বরণ করে। দেশের প্রাণ ক্রমেই উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল; সেই কথাই এইবার বলিব।

বাংলায় জাতীয়তা-সাধনে যে অখণ্ড প্রাণশক্তি জাগিয়াছিল, তাহা ঘটনার আবর্ত্তে দ্বিধা-বিভক্ত হইল। বরিশালে রাজবিরোধের আভাস পাইয়াই একদল লোক যে পিছাইলেন, ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই এবং ইহা ব্যতীত বুদ্ধির মাপকাঠি দিয়া অন্য কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ সম্ভবপর নহে। আজও যেমন দেশের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা রাজ্যরক্ষার জন্য তাঁহার অব্যর্থ বিধান মান্য না করিলে ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলিয়া আতঙ্ক সৃষ্টি করেন, সে যুগেও এই একই কথা রাজপুরুষদের কণ্ঠে নিয়ত ধ্বনি তুলিত। দেশীয় প্রতিনিধিবর্গ সভাক্ষেত্রে যত জোরেই আত্মসামর্থ্য দিয়া জাতির জন্মগত অধিকার লাভ করার কথা উচ্চারণ করুন না, প্রত্যুত্তরে অসীম প্রতাপের সহিত রাজপুরুষগণ যখন নিজেদের সুদৃঢ় সঙ্কল্পের কথা শুনাইতেন, তখন তাঁহাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িত; এইজন্য তাঁহারা দেশের

জনসাধারণকে এক কথা বলিয়া ভিতরে-ভিতরে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নতজানু হইয়া সম্মান ভিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই নিষ্ঠুর চাতুরী তাঁহাদের মতে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কল্যাণপ্রদ মনে হইলেও, দেশসত্তার চেতনায় বাধিত এবং এই ব্যথাই নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার মত শক্ত ধাতুব একদল লোককে যুগে-যুগে সৃষ্টি করিয়াছে। দেশসত্তার সে দাবী বহিবার মত সম্পূর্ণ শক্তি সেদিন বুঝি কাহারও ছিল না; তাই এক যুগও কারও কণ্ঠে সাহসের বাণী নিরন্তর বাহির হয় নাই, সমুদ্রতরঙ্গের মত অনেকেই উঠিয়াছেন-পড়িয়াছেন মাত্র। প্রবল বাধার সম্মুখে মৃত্যুপণ করিয়া দাঁড়ায় যে, সেই মৃত্যুঞ্জয়; সে সাধনা বাংলায় তখনও ঠিক দেখা দেয় নাই।

কিন্তু দেশের সত্তা সিদ্ধ। বাংলার জাগরণ ছিল সত্য। বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন কোন মানুষের কৃত নহে; ভগবান্ ছিলেন এ গতির সারথি। বাংলার আত্মা ভগবানের পাঞ্চজন্যে সাড়া দিয়াছিল। তাই মানুষের উত্থান-পতনে জগন্নাথের রথ কোনদিন থামে নাই। সে যুগের বাঙ্গালীর সহিত এ যুগের বাঙ্গালীর তুলনা হয় না; অথচ সে যুগের মত করিয়াই এ যুগ দেখিতে চাহি, তাই আমরা দৃষ্টিহীন। বাংলার জাতীয় রথ বহু দূর আগাইয়াছে, কোন মানুষের প্রতীক্ষা বাংলায় নাই; শ্রীঅরবিন্দের কথায় বলি—"God is doing everything."

তাই যে দাবীর সম্মুখে জাতির দাবী জানাইলে সংঘর্ষের সম্ভাবনা, যে স্বার্থের সম্মুখে জাতির স্বার্থ স্থাপন করিলে অনর্থের আশঙ্কা, যে অধিকারের সম্মুখে জাতির জন্মগত অধিকার পাইতে হইলে আত্মবলির প্রয়োজন, জাতির সহিত যুক্তি যার নাই, তার কাছে সে আশা কোথায়? যেখানে জাতির মর্ম্মকথা উচ্চারিত হইয়াছে,

সেইখানেই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির রোষবজ্র পতিত হইয়া বিপ্লবক্ষেত্র রচনা করিয়াছে। এই ধ্বংসের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে, সিদ্ধ জাতি বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায় না। যাহা নাই, তাহার জন্য উদ্বেগ অকারণ; তবে পরীক্ষার কষ্টিপাথরে জাতীয় চরিত্র যাচাই হইয়া অনেক মেকীই বাহির হইয়াছে। খাঁটী শক্ত চরিত্রের মানুষ আজ অঙ্গুলীপর্ব্বে গণিবারও দিন আসে নাই; কিন্তু দেশের সত্তা মানুষের উত্থানে-পতনে বীর্য্য হারায় নাই, নিরবচ্ছিন্ন ধারায় নানা ঘটনায় কেবল জাতীয় চরিত্র-গঠনের সুযোগ দিয়া চলিয়াছে। তাই বাংলার স্বদেশী যুগ উপেক্ষার নহে। ইহার পশ্চাৎ অনাহত ভাগবত-শক্তিই বিদ্যুন্মূর্ত্তিতে আজিও জাতিকে নির্দ্দেশ দেয়, আজিও দেশের প্রাণ এই অব্যর্থ সঙ্কেত পালন করিয়া চলে—বাঙ্গালীর লক্ষ্য অভ্রান্ত।

বর্ত্তমান জাতি যদি সে জাতি হইত, তবে সত্তার ধর্ম্ম লাভ করিয়া এই জাতি আজি অমরত্ব লাভ করিত। জাতি-সত্তার সহিত বিযুক্ত হইয়া পড়ায়, সত্তার বীর্য্য অবজ্ঞাত। একটু নিঃস্বার্থ হইলেই মনের ফাঁক দিয়া সত্যের রুদ্র ধ্বনি ঝঙ্কার দিয়া উঠে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট "বন্দেমাতরম্"-পত্রিকায় এই অগ্নিমন্ত্রের একটু আঁচ বাহির হইয়াছিল :

"Nationalism means two things :—(1) The self-consecration to the gospel of national freedom. (2) The practice of independence. · ···Let us then calculate the day—let it be the reconsecration of the whole of Bengal to the new spirit and the new life, a purification of heart and mind to make it an undivided possession and the consecrated temple and habitation of the Mother. And

secondly, let it be a calm, brave, and masculine re-affirmation of our independent existence."

মাদ্রাজ, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে অশান্তির যে ভঙ্গী প্রকাশিত হইয়াছিল, বাহ্যতঃ বাংলার সহিত উহার সৌসাদৃশ্য থাকিলেও, বাংলাব প্রত্যেক ঘটনা জাতীয় সাধনার এক-একটী ক্রম-রূপেই ফুটিয়া উঠিত। এই জাতীয় সাধনার আশ্রয়-রূপে কোন মানুষকে দেখা হইলে নৈবাশ্যের কথা আসে; কিন্তু উহা জাতির সমষ্টিপ্রাণ আশ্রয় করিয়া সিদ্ধ হইতে চাহিয়াছে। ইহাই বাংলার গৌরবের কথা এবং এইজন্যই বাঙ্গালী জাতীয় সাধনায় আজিও অগ্রপুরোহিত!

সাধনার যুগে সবখানি সিদ্ধ রূপে ফুটিয়া উঠে না। অতএব বাংলার রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে দ্বন্দ্ব, কর্ম্মক্ষেত্রে যে রক্তমোক্ষণ, ভাবের জগতে যে আন্দোলন, তাহাতে সফল-মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার না হইলেও, উহা যে জাতীয় চরিত্রগঠনের অসংখ্য উপাদান সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা অবধারিত।

রাষ্ট্রে বিপত্তি-সূচনা মেদিনীপুব কন্‌ফারেন্সে পরিলক্ষিত হয়। মেদিনীপুরের নেতৃস্থানীয় সুপবিচিত মিঃ কে. বি. দত্ত সভাপতির আসন হইতে যে বাণী বর্ষণ কবিলেন, তাহা দেশে যে অগ্নিহোতৃ-দল গড়িয়াছিল তাহাদের মনঃপূত হইল না; কাজেই রাষ্ট্রসভা ভাঙ্গিয়া গেল। স্বদেশীযুগের ভগীরথও সেদিন আত্মসম্মান হারাইলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন......"What happened was to me a revelation."

বরিশালের ঘটনা হইতেই বাংলায় রুদ্রসাধনার আরম্ভ হয়। সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং ইহার আভাস পাইয়াছিলেন। স্যার ব্যাম্‌ফিল্ড

ফুলারকে হত্যা করিবার জন্য দুইজন তরুণ তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি সদ্‌যুক্তি দিয়া তাহাদিগকে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু দেশের তলে-তলে যে গভীর ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের রাষ্ট্রসভাভঙ্গের নিগূঢ়ে এইরূপ চক্রান্তকারীর অবস্থিতি তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

বৎসরের শেষে বাংলার অবস্থা আরও ভীষণ হইয়া উঠে। পঞ্জাব ও মাদ্রাজে যেমন অশান্তির ঝড় উঠিয়াছিল, বাংলায় তদুপরি ভেদনীতির প্রশ্রয়ে হিন্দুমুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোরতর অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। হিন্দু বাঙ্গালী আত্মস্থ হইয়া কোন দিক্ রক্ষা করিবে, তাহার অবসর পায় নাই। তাহারা ইংরাজের দমননীতি রিস্‌লি সার্কুলার প্রভৃতির দায় সাম্‌লাইয়া মাথা তুলিবার সুযোগ অন্বেষণ করিবে, না মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের অত্যাচার হইতে ধন-প্রাণ-মান রক্ষা করিবে, তাহার কিছুই ঠিক ছিল না।

ঢাকার নবাব সলিমুল্লা প্রকাশ্যে হিন্দুসম্প্রদায়ের উপর মুসলমান ভায়েদের উপদ্রব সমর্থন করিতেন। ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, পাবনায় কি অকথ্য অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা আজও স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। হিন্দু বিধবার দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। কুমারী-কন্যাহরণের দায়ে, পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল; রাজকর্ত্তৃপক্ষের শরণ লইলেও, প্রতিকার হইত না। তাঁহারা স্বদেশী নেতৃদের নাম উল্লেখ করিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে বলিতেন। মুসলমান মোল্লারা লাল ইস্তাহার বাহির করিত। তাহাতে হিন্দু বিধবা ও কুমারী কন্যাদিগকে হয় বিবাহ, নয় নিকা করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ হিন্দুশূন্য করিবার সঙ্কেত দেওয়া হইত। এই নৃশংস

অত্যাচার করিয়াও অপরাধী গুরুতর দণ্ড পাইত না। বিধবার উপর অত্যাচার করিয়া বিচারালয়ে অপরাধীর আড়াই টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে ; অনেক ক্ষেত্রে কুমারী কন্যার উপর পাশবিক অত্যাচার বিচারালয়ে প্রমাণিত হইলেও, পাঁচ টাকাব অধিক অপরাধী দণ্ড পায় নাই। পূর্ব্ববঙ্গেব স্বদেশী আন্দোলন ও "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি স্তব্ধ করার জন্য নবাব সলিমুল্লাকে স্যার ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলার একপ্রকার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইব্রাহিম মুন্সী নামক একজন মুসলমান লাল ইস্তাহারের লেখকরূপে ধৃত হইলেও, আদালতে তাহার বিচাব হয় নাই। মুসলমান সম্প্রদায় অত্যধিক প্রশ্রয়ে হিন্দুজাতিকে জামালপুর, কুমিল্লা, পাবনা প্রভৃতি স্থান হইতে নিশ্চিহ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

ময়মনসিংহের পথে-ঘাটে হিন্দু-নরনারীর নির্য্যাতনকাহিনী শুনিয়া-শুনিয়া, হিন্দু-বাঙ্গালীর শোণিতপ্রবাহ উত্তপ্ত হইয়া উঠিত। মুসলমান গুণ্ডারা গৌরীপুর কাছারী লুঠ করিল, জামালপুরের দুর্গামূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিল, হিন্দু ভায়েদের মাথা ভাঙ্গিয়া দিল, দোকানপাটও লুঠ করিল ; তাহারা জননী-ভগিনীর সতীত্বও অপহরণ করিল। পাবনায়, কুমিল্লায় বাস করা দায় হইয়া উঠিল। দেশে যেন অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে। হিন্দুর শেষ আশ্রয়—ধর্ম্ম, তাহাও যাইতে বসিয়াছে। ওই সময়ে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছিলেন—"বাজারে গিয়া দেখিলাম হিন্দুদের দোকানের দরজা ভাঙ্গিয়া মুসলমানেরা দোকান লুঠ করিয়া লইয়াছে। দুর্গাবাড়ীতে যাহা গিয়া দেখিলাম, তাহাতে আর হিন্দু বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে ইচ্ছা হইল না। দুর্গা ছিন্নমস্তা, কার্ত্তিকেয় হীনশীর্ষ, গণপতি কর্ত্তিত-তুণ্ড। আঘাতের শতচিহ্ন মার অঙ্গে বিরাজমান!—ঐ দেখ মা যাহা হইয়াছেন!"

নবাবগঞ্জেও কালীর গলায় জুতার মালা পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

পূর্ব্ব বাংলার মুসলমানগণকে সেদিন প্রলুব্ধ বাক্যে ভুলাইয়া, তীব্র বিদ্বেষ-মন্ত্রে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাল কাগজে জেহাদ ঘোষণা করা হইয়াছিল। ভায়ের বিরুদ্ধে ভাইকে আততায়িতায় প্ররোচিত করা হইয়াছিল। মেলান্দহ হাটের দাঙ্গার রিপোর্টে সবডিভিসনাল অফিসার লিখেন—"কতিপয় মুসলমান ঢকা পিটিয়া প্রচার করিয়াছিল যে, সরকার মুসলমানদিগকে হিন্দুদের দোকান-সম্পত্তি লুঠ করিবার অনুমতি দিয়াছেন।"

হরগিলাচরের সতীহরণ ব্যাপারের তদন্তে ম্যাজিষ্ট্রেটের মন্তব্যে প্রকাশ "ঐ সকল নারীনির্য্যাতন-ঘটনার মূলে, এই প্রকার ঘোষণা-প্রচার হয় যে, মুসলমানেরা হিন্দু বিধবাকে নিকা করিলে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন।"

পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে 'পিকেটিং' করায় বাধা দিবার জন্য বাজারে গুর্খা punitive (পিটুনী)-পুলিস বসান হইয়াছিল। এই সকল খুঁটিনাটি উপলক্ষ্য করিয়া বহুস্থলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। কুমিল্লায় কে সিভিল সার্জ্জনকে নদীর জলে ঠেলিয়া দেয়, ঢাকায় তিনজন লোক খুন-জখম হয়। এই প্রকার নানা রূপ অশান্তি ও উৎপাতের উত্তেজনায় পূর্ব্ববঙ্গের রাজনৈতিক আকাশ দিন-দিন ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

এই অবস্থায় হিন্দু-বাঙ্গালীর প্রাণ যে প্রচণ্ড মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে, হিন্দু অবলা যে চামুণ্ডার বেশে তাথিয়া-তাথিয়া নৃত্য করিবে, হিন্দু তরুণের বাহুবলে যে ভীম পরাক্রম প্রকাশ পাইবে, ইহা আশ্চর্য্যের কথা নহে। অসহায় হিন্দুজাতির মাথায় সেদিন সত্যই ভগবানের

আশীর্ব্বাদ অজস্র ধারে ঝরিয়াছিল। হিন্দুজাতি সেদিন দেখাইয়াছিল—এক মুষ্টি হিন্দুসম্প্রদায় প্রবল মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মুখে নিরুপায় নয়, নিরাশ্রয় নয়; স্বয়ং হৃষীকেশ তাহাদের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। কুমিল্লায় দিবারাত্র যখন লুঠ চলিতেছে, হিন্দুজাতি গৃহরক্ষা আর অসম্ভব বলিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া সর্ব্বনাশের প্রতীক্ষা করিতেছে, গভীর নিশিতে গগন ধ্বনিত করিয়া কি এক অপার্থিব কণ্ঠে শব্দ হইল "মাভৈঃ"—সমগ্র সহরবাসী সে বাণী শুনিয়া অবসন্ন হৃদয়ে বল পাইল, পুরুষের প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইল, নারী কটিতটে বসন জড়াইয়া ভীমা মূর্ত্তি ধারণ করিল। প্রত্যেক হিন্দু প্রত্যেকের পাশে গিয়া দাঁড়াইল, সমস্ত সহর কাঁপাইয়া সহস্র-সহস্র কণ্ঠে এক-যোগে গগন বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনি উঠিল "বন্দেমাতরম্"। দলে-দলে মুসলমান গুণ্ডারা হিন্দুজাতির ধন-মান লুঠিয়া বেড়াইতেছে, পাপের অনুসরণ করিয়া তাহাদের কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। দৈত্যের মত তাহারা ছুটিয়াছে, দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই; সহসা শব্দ হইল—গুড়ুম। অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! জনতা ইহার মধ্যে দেবশক্তির প্রেরণা অনুমান করিয়া স্তব্ধ হইল। অবাধ অত্যাচারিদলের বুঝি হৃদয়ে আতঙ্ক জন্মিল। সম্মুখে দুই-একজন সঙ্গীর শবদেহ দেখিয়া, উত্তেজনার আগুনে তাহাদের যে ভীরুতা ঢাকা পড়িয়াছিল তাহা তাহাদের সবখানিকে আচ্ছন্ন করিল, কে কোথায় ছত্রভঙ্গ হইবে, তাহার ঠিক নাই! কুমিল্লার দাঙ্গা বিধাতার বজ্রে শেষ হইল; কিন্তু হিন্দুজাতি তবুও সান্ত্বনা পাইল না। এই হত্যাকাণ্ড লইয়া ধর-পাকড় চলিল। কুমিল্লায় দায়রায় একজন হিন্দুর প্রাণদণ্ড হইল এবং অন্য দুইজনের উপর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আজ্ঞা প্রদত্ত হইল। কলিকাতার উচ্চ আদালত হইতে কিন্তু ইহার সুবিচার

হইয়াছিল। মুসলমানদের সাক্ষ্যের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়াই এই কঠোর দণ্ড উচ্চ আদালতে নাকচ হইয়া যায়। বিচারকদ্বয়ের মধ্যে স্যার আশুতোষ ছিলেন। দেশ সুবিচার পাইয়া ধন্য-ধন্য করিয়া উঠিল।

চাকা ঘুরিয়া গেল। ময়মনসিংহের অবলা জাতি শাণিত ছুরিকা কটিতটে রাখিয়া নির্ভয়ে পথে বাহির হইল। অত্যাচারী মুসলমানের বক্ষে আমূল ছুরিকা বসিতে লাগিল, গৌরীপুর কাছারী লুঠ করিয়া মুসলমান দস্যুগণ পরিত্রাণ পাইল না, সেখানেও গুলী চলিল। একজন যুবক উত্তেজিত দস্যুদলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অগ্নিনালিকা উত্তোলন করিয়া সদর্পে বলিলেন "আয়, যদি মৃত্যু চাস্, এগিয়ে আয়"— গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় তাহারা উর্দ্ধশ্বাসে পিছু ফিরিল, সলিমুল্লার উত্তেজনাবাণী আর কেহ শুনিল না, তাহারা গৃহে গিয়াও সর্ব্বনাশ দেখিল। এতদিন হিন্দু জননী-ভগ্নীর দুঃখের জন্য তাহাদের হৃদয় কাঁদে নাই, আজ তাহারা দেখিল—তাহাদের ঘরবাড়ী ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, আর মুসলমান রমণীগণ "পরিত্রাহি" চীৎকারে আর্ত্তনাদ করিতেছে।

হিন্দু তরুণ বুকে বল পাইল। পথে-ঘাটে "বন্দেমাতরম্"-শব্দে গগন বিদীর্ণ করিল। হাতে-হাতে খেঁটে লাঠি শোভা পাইল। একজন মুসলমান ইহা দেখিয়া বলিয়াছিল "এ বড় আশ্চর্য্য, ছাত্র-বাবুদের হাতে দিনে কলম, রাতে লাঠি, খোদার মেহেরবাণী!" "ইংলিশম্যান" লিখিল—"If rifles grow on trees, the Arms Act becomes useless—Lathi should be included within Arms Act".

হিন্দুর জাগরণ হইল, দমননীতিও বাড়িল। বরিশাল, ঢাকা,

ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, পাবনা, রঙ্গপুর, ত্রিপুরা, হবিগঞ্জ, নোয়াখালি, সর্ব্বত্র সভাভঙ্গ আইন প্রবর্ত্তিত হইল। "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র বন্ধ করার আয়োজন হইল। হিন্দু পুলিস-কর্ম্মচারীদের প্রতিও পূর্ব্ববঙ্গের রাজপুরুষগণ সেদিন সুনজর রাখেন নাই। মুসলমানের অত্যাচার অসহ্য হইলে, হিন্দু-প্রতিনিধিবর্গ ছোটলাট বাহাদুরের সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার তাঁহাদের আবেদন কর্ণগোচর করিতে সম্মত হন নাই। মুসলমানের অত্যাচার হিন্দুর হৃদয়বলে নিয়ন্ত্রিত হইল; কিন্তু রাজশক্তির কঠোর শাসননীতি হাড় গুঁড়া করিয়া দিল। দুর্ব্বল জাতির মেরুদণ্ড প্রবল বৃটিশের নির্য্যাতনে ধনুকের মত বাঁকিয়া পড়িল। সে উচ্ছ্বসিত শক্তি হয় তো স্বচ্ছবেশে কল্যাণময়ী হইত; কিন্তু অঙ্কুরে বিনষ্ট করার কঠোর হস্ত সেদিন অক্লান্ত হইয়াই হিন্দুজাতিকে উঠিতে দেয় নাই।

"বন্দেমাতরম্" উচ্চারণ করাও অপরাধ হইয়া উঠিল। পূর্ব্ববঙ্গের কোথাও-কোথাও বিলাতী দ্রব্য বিক্রয় করার জন্য শিক্ষক ও অধ্যাপকদের বাধ্য করা হইত। বিলাতী লবণ বাজার হইতে দূর করার অপরাধে কারাদণ্ডও অনেককে ভোগ করিতে হইয়াছে। সমগ্র বঙ্গদেশ শান্তিহীন। সর্ব্বত্র অরাজকতা, কলিকাতার কথা বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব।

বিপ্লবপন্থীর দল রাজধানীর বুকে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ইতিমধ্যে অগ্নিমন্ত্রপ্রচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 'যুগান্তর' বাহির হইল। দুই বৎসরের মধ্যে "যুগান্তর" পত্রের বিক্রয় ৭০০০ উপরে উঠিয়াছিল। ওদিকে ব্রহ্মবান্ধবের "সন্ধ্যা" অপূর্ব্ব লৌকিক ভাষায় দেশের প্রাণ হইতে জুজুর ভয় তাড়াইতে চাবুকের কষাঘাত করিতেছে—দোকানী-পশারী, মুদী-ফেরিওয়ালার

পর্য্যন্ত প্রতিদিনের "সন্ধ্যা" না হইলে চলে না। কলিকাতায় তুমুল ভাবের উত্তেজনা চলিয়াছে।

কলিকাতায় সভাভঙ্গনীতি ঘোষণা করা হইল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, লিয়াকৎ হোসেন, মিঃ এ. সি. ব্যানার্জ্জী, প্রভাসচন্দ্র সরকার প্রভৃতি কলিকাতার সভায়-সভায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা করিতেন। ইঁহাদের নামোল্লেখ করিয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট্ সুইন্‌হো সাহেব সভা-বন্ধের নোটিস্ জারি করিলেন। "সন্ধ্যা", "নবশক্তি", "যুগান্তরে" রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ বাহির হইত; সেদিন লেখা ও বক্তৃতা দুই বন্ধ করার জন্য সিম্‌লা শৈলে ব্যবস্থাপক সভায় আইন জারি হইয়াছিল। এই রাজবিধিপ্রয়োগের দ্বারা সভা-সমিতি ও রাজদ্রোহমূলক সংবাদপত্রের প্রচার বন্ধ করার যুগ চলিল।

প্রথমেই "যুগান্তরের" পালা। ৫ই জুলাই ১৯০৭ "ভয়ভাঙ্গা" ও "লাঠ্যৌষধি" প্রবন্ধ বাহির হওয়ার জন্য ভূপেন্দ্রনাথ অভিযুক্ত হইলেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা এবং যুগান্তরের প্রথম পুরোহিত বলিয়া তাঁর বিচার দেখার জন্য আদালতে জনসমাগম হইল। তিনি নির্ভীকভাবেই অপরাধীর কাঠগোড়ায় দাঁড়াইয়া, বীর-দর্পে সমুদয় অপরাধ আপন স্কন্ধে বরণ করিয়া সকলকে চমকিত করিলেন, কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে অসম্মতি জানাইলেন। সাহসিকতার এইটুকু আদর্শই তখন যথেষ্ট ছিল। ১৭ই জুলাই ভূপেনবাবুর এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান হইল। তিনি হাসিতে-হাসিতে কারা গমন করিলেন। দেশে উৎসাহ-উত্তেজনার সীমা রহিল না। কলিকাতার মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে সভা চলিতে লাগিল। ভূপেন্দ্রনাথের গরীয়সী জননী সগর্ব্বে ব্যক্ত করিলেন "আমার সন্তান দেশের জন্য জেলে গিয়াছে, ইহাতে আমার দুঃখ নাই। জেলে গিয়াই

সে দেশের বেশী উপকারে লাগিল।" ভূপেন্দ্রের দৃষ্টান্তে পর-পর আরও কয়েকজন যুবককে একই পত্রের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া জেলে যাইতে হয়।

"সন্ধ্যার" সম্পাদক উপাধ্যায় ভূপেনের কাণ্ড দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি "সন্ধ্যায়" লিখিলেন "ভূপেনের বেলায় যোড়া রম্ভা, সন্ধ্যার বেলায় বম্বু লম্ব।"। ইঁহার ভাষা এইরূপ ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ ছিল। "সন্ধ্যা" ঘরে-ঘরে অতি কৌতূহলে পঠিত হইত। উপাধ্যায়ের কঠোর ব্যঙ্গোক্তি রাজদ্রোহমূলক বলিয়া তিনিও অভিযুক্ত হইলেন, লালবাজার পুলিস আদালতে বরবেশে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে আনিয়াছিলেন এক কদলী-কাণ্ড! তিনি বলিতেন—জুজুর ভয় থাকিতে কাজ হইবে না, লালবাজারের হুমকী ফুঁ দিয়া উড়াইতে হইবে। ইহার পূর্ব্বে "বন্দেমাতরম্" পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে শ্রীঅরবিন্দকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। ১৮ই আগষ্ট ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ তাঁহার নামে পরোয়ানা বাহির হইয়াছে, এই কথা শুনিয়া স্বয়ং গোয়েন্দা বিভাগে গিয়া ধরা দেন। আদালতে তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করা দায় হইল। বিপিনচন্দ্র নির্ভীক হৃদয়ে তাঁর বিবেকের নির্দ্দেশমত এই অন্যায় মামলায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি তখন "প্যাসিভ রেশিজটেন্স" মন্ত্র প্রচার করিতেছেন। অরবিন্দ মুক্তি পাইলেন। মুদ্রাকরের দুই মাস জেল হইল। বিপিনচন্দ্র আদালতের আদেশ অমান্য করায় ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। যাঁর শঙ্খনাদে দেশ ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল, গভর্ণমেণ্ট সুযোগ পাইলেন তাঁকে ছয় মাসের জন্য জেলে পুরিবার। কারাপথের পথিক বিপিনচন্দ্র দেশে নূতন প্রেরণার উৎস-স্বরূপ হইলেন। কথার সহিত কাজের মিল

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী (মহারাজ)
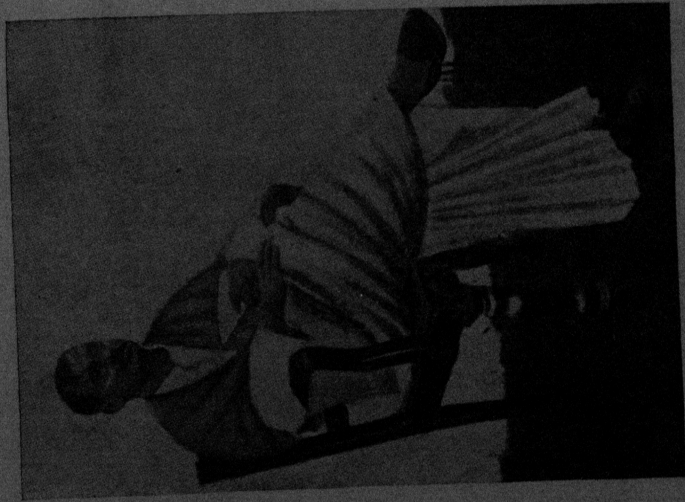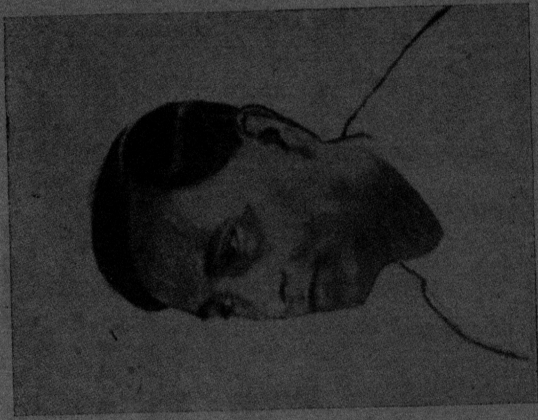
যাদুগোপাল মুখার্জ্জী

নেতাদের মধ্যে বড় দেখা যাইত না; গরম দলের নেতৃস্থানীয় বিপিনচন্দ্রের এই সাহসিকতা তাঁর প্রতি দেশের মনে গভীরতর শ্রদ্ধা জাগাইল, সঙ্গে-সঙ্গে দেশের প্রাণও সমধিক উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল।

শাসনপক্ষ হইতে দমননীতি যতই প্রবল মূর্ত্তি ধরিল, কলিকাতার স্বদেশীযুগের পুরোহিতবৃন্দও ততই উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। "যুগান্তর"-আবার বাহির হইল, "নবশক্তি" অগ্নি উদ্গীর্ণ করিল, "সন্ধ্যার" তো কথা নাই। গুজব রটিল—কলিকাতা লুঠ হইবে। "সন্ধ্যায়" এ সংবাদ প্রথম বাহির হয়। নগরবাসী সতর্ক হইল, ছাদে ইট জড় করিয়া রাখিল। বিডন বাগানের দুইধারে তখন গণিকাপল্লী ছিল, তাহারাও প্রচুর সোডা-ওয়াটারের বোতল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। সত্য-সত্যই দাঙ্গা বাধিল। ২রা অক্টোবর বিপিনবাবুর কারাদণ্ডে রাজপথে যে উত্তেজনা দেখা যায়, তাহাতে দুইজন কলেজের ছাত্র সার্জ্জেন্টকে উত্তম-মধ্যম দেওয়ায় তাহাদের কারাদণ্ড হয়। এই দণ্ডিত বালকদ্বয়ের সম্মানের জন্য বিডন বাগানে এক রাক্ষসী সভার আয়োজন হয়। হঠাৎ একদল পুলিস-প্রহরী আসিয়া সভাভঙ্গ করার জন্য লাঠি চালাইতে থাকে। নিরস্ত্র জনতা ছত্রভঙ্গ হয়। পুলিস তাহাদের তাড়া করে ও প্রহার করিতে থাকে। এই সঙ্গে মিউনিসিপালিটীর অসংখ্য কুলী দোকান-পাট-লুঠ আরম্ভ করে। কলিকাতার তরুণ-মহলে মহাচাঞ্চল্য সৃষ্ট হয়। পুলিসের সহিত ভীষণ সংঘর্ষ বাধে। ততক্ষণে জনতা ফিরিয়া লাঠি কাড়িয়া, মরিয়া হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে। ফলে বিচ্ছিন্ন লালপাগড়ির দল জনতার সম্মুখে হটিয়া যায়। রাত্রে রাজপথ যখন জনশূন্য, তখন নিরীহ পথিকদের উপর তারা ধরপাকড় আরম্ভ করে। প্রতিশোধে পুলিসও কয়েক স্থানে মার খায়। একজন

সার্জেণ্ট খানাতল্লাস-কালে সিঁড়িতে উঠিতে গিয়া দায়ের ঘা খাইয়া হাত খোয়ায়। ছাদের সংগৃহীত ইট-পাটকেলও পুলিসের মাথা ভাঙ্গিয়াছিল। বারাঙ্গনারাও বোতল ছুঁড়িয়া স্বদেশী যুগের উত্তেজনায় ইন্ধন যোগাইয়াছিল। দুইদিন ধরিয়া কলিকাতায় পুলিস ও গুণ্ডার রাজত্ব চলে। সে ভীষণ দৃশ্য আজ আর বর্ণনার নয়। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়াই কলিকাতার সমস্ত চত্বারে ১৪৪ ধারার প্রবর্ত্তনে পুলিস-ম্যাজিষ্ট্রেটের ছবিসহ সভাভঙ্গ-বিধি ঘোষিত হয়। মৌলবী লিয়াকৎ এই আইন পুনঃ-পুনঃ ভঙ্গ করিয়া কারাগৃহে গমন করিয়াছিলেন; বৃদ্ধ লিয়াকতের হৃদয়-বল বাঙ্গালীকে সে যুগে জাগাইয়া রাখিত। এই ভীষণ ঘটনার তদন্ত করিবার জন্য উভয়পক্ষের কমিশন নিযুক্ত করা হয়। দেশবাসীর পক্ষে ৺নরেন্দ্রনাথ সেন কমিশনের সভাপতি হন। রিপোর্টে পুলিসের অকারণ আক্রমণের জন্য তীব্র সমালোচনা করিতে হইয়াছিল।

পুলিসের হস্তক্ষেপেই যে এই অশান্তি, তাহা কয়েকদিন পরে ৩০শে আশ্বিনের উৎসবে প্রমাণিত হইয়া গেল। এই সভাধিবেশনের পূর্ব্বে মান্যবর ৺ভূপেন্দ্র বসু বঙ্গ-লাটকে দেশের পক্ষ হইতে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া জানাইলেন—গভর্ণমেণ্ট পুলিস সরাইয়া লইলে, সভায় কোন প্রকার শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা নাই। পুলিস-সেনা প্রস্তুত হইতেছিল, তাহাদের নিবৃত্ত করা হইল। সভার কার্য্য আদ্যোপান্ত শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হইল।

১৯০৭ সালের শেষভাগে, গোয়ালন্দ ষ্টেশনে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন সাহেবের উপর গুলী চলিল। দেশ চমকিয়া ভাবিল—একি! সকলে বুঝিল—রক্ততান্ত্রিকগণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। এই লোমহর্ষণ ঘটনার পর, কুষ্টিয়ায় পাদরী হিকেন বোথামের উপর গুলী

চলিল। বাঙ্গালী যে অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইয়াছে, এই ভাবিয়া সকলে একটা নূতন গর্ব্ব ও উত্তেজনা অনুভব করিল, ঘরের কোণে বসিয়া সন্তর্পণে তাহার আলোচনা চলিতে লাগিল।

॥ উনিশ ॥

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলন ভীমমূর্তি পরিগ্রহ করিল। দেশনেতৃগণ তাড়াতাড়ি গভর্ণমেণ্টের সহিত কোনরূপ চুক্তি করিয়া আত্মসম্মানরক্ষায় উদ্যোগী হইলেন। দ্বিধা-বিভক্ত জাতীয় দল ছন্নছাড়া হইয়া পড়িল। মেদিনীপুরের রাষ্ট্রসভাভঙ্গ হওয়ার সূত্র ধরিয়া, বাংলার জাতীয়পক্ষ নিখিল ভারতের রাষ্ট্র-যজ্ঞ পণ্ড করিলেন। সুরাটে স্বজাতিবিরোধের প্রলয়ানল জ্বলিয়া উঠিল। বাংলায় এই বৎসর হইতে শাসনদণ্ডের কঠোর নিষ্পেষণ আরব্ধ হয়।

"বন্দেমাতরম্" মকদ্দমায়, বিপিনচন্দ্র যখন গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন: "I honestly believe that prosecution like that of Bande Mataram' are calculated to stiflc freedom of thought and speech in the country and interfere with the civil advancement of the people. Nor are they likely to promote the interests of public peace. I have therefore, conscientious objections to take any part in such prosecutions. This is why I declined to be sworn in and conffirmed as a witness for the prosecution in the Bande Mataram case."

বিপিনচন্দ্র সাক্ষ্য দিতে এইরূপে অস্বীকার করায় ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার ছয়মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা মাত্র, রাজপথে বাংলার তরুণ ভীষণ কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল। শান্তিরক্ষার জন্য শ্বেতাঙ্গ সার্জ্জেণ্টের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু শান্তিরক্ষার্থ শ্বেতাঙ্গ

পুলিস জনতার মধ্যে পৌঁছিবামাত্র উন্মত্ত জনসঙ্ঘ তাহাদের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিল। রাজপুরুষেরা সেদিন বুঝিলেন—বাংলার তরুণকে কেবল হুম্‌কি দেখাইয়া শাসনে রাখার আর সম্ভব হইবে না, কেবল সার্কুলার জারি করিয়া এ আবেগ, এ উত্তেজনাপ্রবাহ রুদ্ধ হইবার নহে, প্রচণ্ড শাসনদণ্ড উদ্যত করিতে হইবে। ধীরে-ধীরে রাজশক্তি রুদ্র মূর্ত্তি ধরিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীমান্ জানকীনাথ দত্ত নামে এক যুবক স্বদেশী আন্দোলনের আবর্ত্তে আইনের সীমা উল্লঙ্ঘন করায়, তাহার প্রতি কারাদণ্ডের সহিত বেত্রদণ্ডের আদেশ হয়। এই ঘটনা লইয়া দেশনেতৃগণ তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করেন। কিন্তু লালবাজারে পুলিস আদালতের সম্মুখে বাঙ্গালী যুবকগণের পুলিসের উপর হস্তক্ষেপ করার ভরসা দেখিয়া একে-একে কঠোর শাসননীতি প্রবর্ত্তিত হয়, এবং স্বদেশী আন্দোলনের মূলোৎপাটনে কর্ত্তৃপক্ষগণ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন। প্রথমেই অপরাধী যুবক ও বালকগণের উপর নিষ্ঠুর বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা হয়। লালবাজারের শ্বেতাঙ্গ পুলিসের সহিত যে দাঙ্গা হয়, তাহাতে সুশীলকুমার অপরাধী বলিয়া ধৃত হয়; বিচারকালে এই বালক নির্ভীক কণ্ঠেই নিজের অপরাধ স্বীকার করে। সে স্বর্গের পারিজাত অঙ্কুরেই শুকাইয়াছে, দেশ-প্রীতির অমৃতনির্ঝর মরুপথে হারাইয়া গেল। স্বদেশীযুগের ইতিহাসে সুশীলের পুণ্যজীবনকাহিনীটুকু যেন বাদ পড়িয়া না যায়, তাই এই কয়েক ছত্র উল্লেখ করিয়া রাখিলাম। সুশীলের উপর বেত্র-দণ্ডের আদেশ হয়—প্রেসিডেন্সী জেলে এই নৃশংস কার্য্য সাধিত হয়। প্রত্যেক আঘাতের সঙ্গে তার কণ্ঠে "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল। সন্তানের ব্যথায় বঙ্গজননীর চক্ষে অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িয়াছিল। সত্যই সেদিন শুধু সুশীলের জননীই ব্যথা অনুভব

করেন নাই, বাংলার প্রত্যেক সন্তান-জননীর চক্ষে বসুধারা ঝরিয়াছিল। সুশীলের বেত্রাঘাত সে যুগে খুব বড় ঘটনা বলিয়াই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অন্তরে অঙ্কিত হইয়াছিল। বাংলায় ইহা লইয়া যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তাহার ধুয়া ধরিয়া বিলাতের 'নেশন' কাগজে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে বুঝা যায় যে, এই বর্ব্বর প্রথা ইংরাজ-চরিত্রের আদর্শানুযায়ী হয় নাই; কিন্তু রাজ্যরক্ষার জন্য ব্রিটিশ শক্তি আদর্শের দায় কোন কালেও ভ্রূক্ষেপ করেন না। 'নেশনে' লেখা হইয়াছিল: "Public flogging carried out at the triangle placed outside every magistrate's court is still the rule in most Indian provinces, but the flogging of an educated man for a political offence is surely a novel infamy, the flogging of "politicals" is rare even in Austria."

কিন্তু গবর্ণমেণ্টের রুদ্রমূর্ত্তি সেদিন শান্ত হয় নাই। সুশীলকে প্রেসিডেন্সী জেলে লইয়া গিয়া বেত্রদণ্ড দেওয়া হয়; কিন্তু ইহার পর শ্রীমান্ পান্নালাল শেঠ ও শ্রীমান্ পঞ্চানন দাসকে আদালত-প্রাঙ্গণেই বেত্রাঘাত করা হয়। উপর্য্যুপরি বেত্রাঘাত চলিতে থাকে। শ্রীমান্ কালীপ্রসন্ন সাহা নিষ্ঠুর বেত্রাঘাতে অবসন্ন হইয়া পড়ে। শ্রীমান্ তিনকড়ি দে নামক এক পঞ্চদশ বর্ষীয় বালকের উপর পনের ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ হয়। দেশের দিক্ হইতে প্রতিবাদের কলরব তুলিলে কি হইবে—বাংলার রাজকর্ত্তৃপক্ষ ইহাতে সন্তুষ্ট হন, কলিকাতার পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের মাসিক ৫০০৲ শত টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন।

অন্যপক্ষে জাতীয় দলের সংবাদপত্রগুলি বন্ধ করার আয়োজন

হয়। "যুগান্তরের" দ্বিতীয়বার রাজবিদ্রোহ অভিযোগে বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। "বন্দেমাতরমে"র মুদ্রাকর অপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষের তিন মাস কারাদণ্ড হয়। "সন্ধ্যায়" "এবার ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে" বাহির হওয়ায়, সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব আবার ধৃত হন। এই সময়ে তাঁর অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ ছিল, ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে দুই দিন তাঁকে ঠায় দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য কবায়, তাঁর এই রোগ বৃদ্ধি পায়। তিনি জেল খাটিতে হইবে বলিয়া অন্ত্ররোগ হইতে মুক্তির জন্য ক্যাম্বেল হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করাইতে গিয়াছিলেন। হাসপাতালেই তিনি শুনিলেন যে, সম্পাদক হিসাবে তিনি পত্রিকার সকল দায়িত্ব নিজের উপর গ্রহণ করিলেও, "সন্ধ্যার" কর্ম্মকর্ত্তা ও মুদ্রাকরকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সংবাদ-শ্রবণমাত্র তাঁর সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি "সন্ধ্যার" কর্ম্মচারীকে সন্তানের তুল্য স্নেহ করিতেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের কঠিন শাস্তি সহিবার মত শক্তি তাহার হইবে না, এই ভাবিয়া সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিজের উপর গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রাণপ্রতিম কর্ম্ম-কর্ত্তাকে অভিযুক্ত হইতে দেখিয়া তিনি এক প্রকার স্বেচ্ছা-মৃত্যু বরণ করিলেন। অস্ত্র হইতে শোণিতপ্রবাহ ছুটিল। সেইদিন অপরাহ্ণে তিনি জনৈক বন্ধুকে বলিলেন—"আমি ফিরিঙ্গির জেলে বেগার খাটিব না। আমার ডাক আসিয়াছে। আমাকে কারাগারে রাখে, এমন সাধ্য ফিরিঙ্গির নাই।"—হায় কে জানিত, তাহার পরদিনে বীরযোগীর তেজোগর্ব্বিত স্পর্দ্ধাবাণী এমন অক্ষরে-অক্ষরে সত্যে পরিণত হইবে? চিরকুমার মুক্তিব্রতী সন্ন্যাসী প্রিয় জন্মভূমির মুক্তি ধ্যান করিতে-করিতে সকল বন্ধনকে উপহাস করিয়া হাসিতে-

হাসিতে মহাপ্রস্থান করিলেন। হাসপাতাল তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। মরণের একমাস পূর্ব্বে কালীঘাটের নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "মা, আবার ব্রাহ্মণদেহ দিও—কুড়ি বৎসর পরে আবার এদেশে জন্মিয়া ফিরিয়া তোমার কার্য্যে আসিব—তোমার মুক্তিব্রতের উদ্‌যাপনে আমার দেহ লুটাইব।" বিদায়কালে তাঁহার কথা: "দেশের জন্য আমার ক্ষুদ্রশক্তি খুব সামান্য কাজ করিল। আমি চলিলাম, দেশমাতৃকার মুক্তির ভার ভগবানের উপর রহিল।" যাও ধর্ম্মবীর, জন্মে-জন্মে তুমি এমনি বীরগর্ব্ব লইয়া আসিও. লক্ষ্যভ্রষ্ট ভারতবাসীকে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রাখিও। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যুসংবাদ কলিকাতা সহরে আগুনের মত ছড়াইয়া পড়িল। রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইল। তাঁর পবিত্র শবদেহ-বহনে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। পুষ্পমাল্য-শোভিত চিতা-শয্যায় দেশপ্রেমিকের বীর-বপু দেখিয়া অনেকেই সেদিন অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। ডাঃ সুন্দরীমোহনের পত্নী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উপাধ্যায়ের পুণ্যকথা উচ্চারণ করিয়া উৎসাহের সহিত শোকাশ্রুসাগরে সমবেত জনমণ্ডলীর হৃদয় ভাসাইয়া দিয়াছিলেন; তাঁর কণ্ঠের অশ্রুসিক্ত জলন্ত বাণী এখনও কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর ব্রহ্মবান্ধবের পুণ্যদেহ ভস্মমুষ্টিতে শেষ হইল। উপাধ্যায় বাঙ্গালীর প্রাণে হাহাকারের ঢেউ তুলিয়া গেলেন। এমনই আঘাতে-আঘাতে বাংলার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আর একজন মহাপ্রাণ দেশপ্রেমিক অন্তর্দ্ধান করেন। স্বদেশযজ্ঞের মহাঋত্বিক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ স্বাস্থ্যলাভের জন্য সমুদ্রযাত্রা করেন। জাহাজেই তাঁর মৃত্যু হয়। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর দৃঢ় চরিত্র সম্বন্ধে যেটুকু অভিমত প্রকাশ করেন, তাহার

কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম। তাহা পাঠ করিলেই তিনি কি প্রকৃতির লোক ছিলেন, বুঝা যাইবে: "A devoted patriot, he never spared himself in the service of the motherland······he was reckless of health and life, strong-willed, and even obstinate, above all advice and remonstrance."

তাঁর জালাময়ী লেখনী স্বদেশপ্রেমের অগ্নি বর্ষণ করিত। তাঁর সঙ্গীতের ঝরণায় অভিষিক্ত হইয়া জাতি নূতন প্রাণ পাইত। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসে "ভেইয়া, দেশকা এ কেয়া হাল" এই গানটী সমগ্র ভারতবাসীর প্রাণে দেশ-মমতার প্লাবন তুলিয়াছিল। তিনি "ব্রাইটস্ রোগে" অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন; কিন্তু দেশের ডাকে স্বাস্থ্য-রক্ষায় উদাসীন থাকিতেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে আমাদের এক সভায় আহ্বান করিয়া লইয়া আসা হইয়াছিল। বৈশাখের প্রখর রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া সৌমমূর্ত্তি দেশপ্রেমিক গরদের যোড় পরিধান করিয়া স্বদেশী মন্ত্র প্রচার করিলেন। সে স্মৃতি ভুলিবার নয়। মাথার মধ্যে কখনও-কখনও তিনি অতিশয় জ্বালা অনুভব করিতেন, তখন বরফের চাঙ্গড় মাথায় দিয়া বাংলার এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও দেশময় স্বদেশমন্ত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। জুলাই মাসের ১লা তারিখে তাঁর মৃত্যুসংবাদ দেশে পৌঁছিলে, বাঙ্গালী তাঁহাকে স্মরণ করিয়া শোকাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিল। তিনি নবোদিত স্বাধীন জাপানের পবিত্র ভূমি লক্ষ্য করিয়া প্রশান্ত সমুদ্রে নিজের দেহ ভাসাইয়া স্বাধীনতার জয় দিয়াছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এই দুই দেশনেতাকে হারাইয়া বাঙ্গালী সত্যই সেদিন বেদনা অনুভব করিয়াছিল।

জাতীয় জীবনে এই দৈব দুর্ঘটনার সহিত রাজরোষ চতুর্দ্দিকে অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। কলিকাতায় সভা বন্ধ করার পুলিস আইন সারা দেশের আইনে পরিণত হইল। সিমলা শৈলে ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ ও মিঃ গোখ্‌লে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিলেন ; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের যাহা করিতে ইচ্ছা, তাহা কোনদিন যেমন রুদ্ধ হয় না, সেদিনও তাহাই হইয়াছিল। তিন বৎসরের জন্য সভা-বন্ধ আইন পাস হইয়া গেল। লিয়াকৎ হোসেন এই আইন ভঙ্গ করিয়া বহুবার নির্য্যাতিত হইয়াছেন ; মানুষের যথার্থ অধিকার-রক্ষার দায় এমন সরল ও নির্ভীক ভাবে সেদিন আর কেহই মাথা তুলিয়া লইতে ভরসা করেন নাই। ব্যারিষ্টার এ. সি. ব্যানার্জ্জি সেদিন স্বদেশীর আগুন লইয়া খেলিতেন ; সিডিশন মিটিং বিল পাস হওয়ার পর, তিনিও ইহার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করিতে গিয়া অভিযুক্ত হন। তখন রাজদণ্ড মাথায় বহিয়া আইনভঙ্গ করার স্পর্দ্ধা দেখাইতে পারিলে উত্তেজনার আগুনে ইন্ধন পড়িত, আইনভঙ্গনীতির স্পর্দ্ধা সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। মিঃ এ. সি. ব্যানার্জ্জির অগ্নিময়ী বাণীর সঙ্গে তাঁর নির্ভীক আচরণ সকলে আশা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি মুচলেকা দিয়া অব্যাহতি লাভ করেন। "সন্ধ্যার" কর্ম্মকর্ত্তাও ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া মুক্তি পাইয়াছিলেন। একদিকে বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়কগণ সুর বদ্‌লাইয়া দেশকে প্রকৃতিস্থ করায় উদ্যোগী হইলেন ; অন্যদিকে যে জমিদারবর্গ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া দেশের প্রাণ উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই রাজভক্তিমূলক ইস্তাহার বিলি করিলেন। "বন্দেমাতরম্"-পত্রে এ সম্বন্ধে লেখা হয় : "It is no indication of treachery in the camp, but

only proves that the metal of the nation has all this time been in the crucible, and has at last thrown up its dress.”
অপর দিকে এক তরুণ জাতীয় পক্ষ দেশের ভগ্ন মনে উত্তেজনারক্ষার জন্য জ্বালাময়ী লেখনী ধরিয়া কাজে লাগিয়া গেলেন। আবার গোপনে বিপ্লবপ্রচেষ্টাও চলিতে থাকিল। দেশনেতৃগণের পশ্চাৎ কোনরূপ সংহতিশক্তি রহিল না, চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল—দলাদলি, পরস্পরের মতামত লইয়া ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রচার নেতৃদের অনিবার্য্য কর্ম্ম হইল। তাঁহাদের কথায় কেহ কর্ণপাত করিতে চাহিল না। দমননীতি যে জাতীয় মুক্তির পথে আসিবে, তাহা না জানিয়া দেশনেতৃগণ দেশের প্রাণ কেন নাচাইলেন, এইরূপ অভিযোগের সুর উঠিল। শাসনদণ্ডের সম্মুখে জাতীয় সম্মান বলি দিয়া ঘরে ফিরিবার ইচ্ছা একদল লোকের আদৌ ছিল না। যাঁহারা ফিরিবার ইচ্ছাটুকু আশ্রয় করিয়া কাজে নামিয়াছিলেন, তাঁহারা রাজরোষের আঁচ পাইয়া সরিয়া পড়িলেন—যাঁহারা ইহার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই তির্য্যক্ পথ ধরিয়া গোপন ষড়যন্ত্রে দেশে বিপ্লব-দল গড়িয়া তুলিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে রাজশক্তির প্রবল শাসন উপেক্ষা করিয়া, বিপ্লবপন্থীদের যে কয়টী কার্য্য রাউলাট রিপোর্টে বাহির হইয়াছে, তাহাই ইহার যথেষ্ট পরিচয় দিবে।

বিপ্লবপন্থিগণ প্রথম আশা করিয়াছিলেন—ইংরাজশক্তি সমগ্র জাতির মতবিরুদ্ধ কাজ করায় দেশের মনে যে অসন্তোষ ও রাজ-বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজরাজ্যের ভিত্তিনাশের প্রচেষ্টায় দেশের লোকই অর্থসাহায্য করিবে; তাঁহাদের এই আশার আংশিকভাবে পূরণ হইলেও, কাজের অনুপাতে তাহা যথেষ্ট হয় নাই

এবং এই আশা কোন কালে সফল হওয়ার সম্ভব হইবে না বুঝিয়াই বিপ্লবপন্থিগণ দস্যুবৃত্তি করিয়া অর্থসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

স্বদেশীযুগের সূত্রপাত হইতেই, একদল বুদ্ধিমান্ লোক বুঝিয়াছিলেন—বিনা বিপ্লবে মুক্তির সম্ভব হইবে না; ইঁহারা ইহা যথাসাধ্য দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে প্রচারও করিয়াছিলেন। স্বদেশীযুগের আন্দোলন সম্মুখে রাখিয়া বিপ্লবপন্থীদের গোপন ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দেই মাঝে-মাঝে অর্থসঞ্চয়ের জন্য, রাজনীতিক ডাকাতির ব্যর্থ প্রয়াসের কথা শুনা যাইত। কিন্তু ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর নারায়ণগড়ে ছোটলাট বাহাদুরের গাড়ী উল্টাইয়া দিবার প্রয়াস হইয়াছে, এই সংবাদ যখন বাহির হইল, তখন দেশের প্রাণস্রোতঃ একেবারে ভিন্নমুখী হইয়া পড়িল। "যুগান্তর", "বন্দেমাতরম্", "নবশক্তি", "সন্ধ্যা" প্রভৃতিতে যে অগ্নিময়ী লেখা বাহির হইত, তাহাতেই তরুণের প্রাণ উত্তেজনায় শিহরিয়া উঠিত। বোমা দিয়া লাট সাহেবের গাড়ী উল্টাইবার প্রয়াস যেন স্বপ্নজগতের কথা বলিয়া প্রাণে নূতন চমক লাগাইয়া দিল। ইহার পূর্ব্বে জামালপুরের দাঙ্গায় বাঙ্গালীর কৃতিত্বের কথা বেশ ঘোরাল করিয়াই সংবাদপত্রের ভিতর দিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। পুলিসের দমননীতির আতঙ্ক নেতৃদের কথার জোরে দূর হইত না; কিন্তু এই একটা ঘটনায় বাংলার প্রাণে নূতন উৎসাহ দেখা দিল। বাংলার তরুণ প্রাণ দেওয়ার সাধনায় অধিকতর উদ্বুদ্ধ হইল।

এই অবস্থার মেদিনীপুরের রাষ্ট্রসভায় নূতন ও পুরাতন শক্তির দ্বন্দযুদ্ধ বাধিয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ তখন প্রায় নীরব হইবার উপক্রম করিয়াছে। তিনি রাজনীতিক চালবাজিতেই কর্ম্মোদ্ধার করার তখন পক্ষপাতী, তাঁর বুদ্ধির মাপকাঠিতে দেশের শক্তি

নির্দ্ধারিত হইত এবং তদনুসারে চলিয়া দেশের উন্নতিলাভ তিনি শ্রেয়ঃ মনে করিতেন। কিন্তু নবযুগের ঋষি তখন অগ্নিবীণায় ঝঙ্কার দিয়াছেন; তখনকার এই লেখা পড়িলেই ইহার উপলব্ধি হইবে:

"Revolutions are incalculable in their doings and absolutely uncontrollable. The sea flows and who shall tell it how it is to flow? The wind blows and what human wisdom can regulate its motions? The will of divine wisdom is the sole law of revolutions and we have no right to consider ourselves as anything but mere agents—chosen by that wisdom."

বাংলার এই তন্ত্রই সুরাটে দক্ষযজ্ঞ বাধাইল। দেশে মুক্তিসাধনায় হিসাব রাখিয়া চলার যে সকল নীতি সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিলেন, অন্য পক্ষ তৎপরিবর্ত্তে অন্তরের অগ্নিপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ছুটিলেন। পঞ্জাবসিংহ লাজপত নভেম্বর মাসে মুক্তি পাইলেন। দেশভক্ত লাজপতকে জাতীয় সম্মান প্রদান করার জন্য বাংলার জাতীয় পক্ষ সুরাটের কংগ্রেসে তাঁহাকে সভাপতি করার ধুয়া ধরিলেন। ভারতে তখন একদল অগ্নিহোতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, বাংলার নির্দ্দেশ সেদিন সমগ্র ভারতে তাঁহাদের মাথা পাতিয়া লইতে হইত। অন্য পক্ষ ডাঃ রাসবিহারী ঘোষকে কংগ্রেসের নেতৃত্বদানে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। লাজপত এই রাষ্ট্রসংগ্রাম হইতে দূরে থাকিতে চাহিলেন; তখন ভারতের তাৎকালীন জাতীয় পক্ষ মহারাষ্ট্রকুলগৌরব লোকমান্য তিলককে এই রাষ্ট্রগৌরবের জয়টীকা দিবার উদ্যোগ করিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেস নাগপুরে হওয়ার কথা ছিল; অবস্থা বুঝিয়া মধ্যপন্থিগণ উহা

সুরাটে স্থানান্তরিত করিলেন। যে প্রাণশক্তি জাতীয় সম্মানরক্ষায় জাগরিত হইয়াছিল, তাহা স্বজাতিদ্রোহের সমস্যায় আবর্তিত হইল। যে শক্তি দেশের মুক্তি আনয়ন করে, তাহা সকল দেশেই আত্ম-বিদ্রোহে জয়ী না হইয়া কোথাও সাফল্যের স্বর্ণকিরীট লাভ করে নাই। ভারতে সেদিনের সুরাট দক্ষযজ্ঞে যে অন্তর্বিরোধের হলাহল উত্থিত হইয়াছে, তাহা যে নিঃশেষ হয় নাই—ইহা বলাই বাহুল্য এবং ইহা শেষ হওয়া যে কত বড় প্রলয়সৃষ্টির উপর নির্ভর করে, তাহা চিন্তাশীল মাত্রেই বুঝিবেন। সুরাটের স্বজাতিবিরোধ শক্তিপরীক্ষার অবাধ ক্ষেত্র না পাইয়া ধূমায়িত বহ্নির ন্যায় জাতির শ্বাস রুদ্ধ করিয়া দেয়। আমাদের এই বিশাল জাতির মধ্যে যত সহজে ঐক্যবদ্ধ জীবনের প্রত্যাশা করি, আসলে সে বস্তু তত সহজসাধ্য নহে।

সুরাটের কংগ্রেস লইয়া দেশে যখন ঝড় বহিতেছে, তখনই বিপ্লবপন্থীর অগ্নিনালিকা সর্ব্বপ্রথম গর্জ্জন তুলিল। গোয়ালন্দ ষ্টেশনে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন সাহেবকে এক ব্যক্তি গুলী করিয়া অনায়াসে আত্মগোপন করিল। এ সংবাদ তখন যুগান্তকারী ছিল। বাংলার বিপ্লবপন্থীর দল ক্রমেই যে প্রবল হইয়া উঠিতেছে—ইহা জাতীয় শক্তির পরিচয় বলিয়া তখন গর্ব্বের বস্তু বলিয়া গণ্য হইত।

বাংলায় মুক্তিকামনা অগ্নিমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। সুরাটের রাষ্ট্রসভা মূলতঃ বাঙ্গালীর চক্রান্তেই অন্তিমশয্যা গ্রহণ করে। যদিও এই ঘটনা জাতীয় গ্লানিরূপে অনেকের নিকট প্রতিভাত হয়; কিন্তু জাতীয় জাগরণ যদি কোনদিন সত্য আকারে দেখা দেয়, তাহা হইলে ইহাপেক্ষা অন্তর্বিদ্রোহের নির্ম্মম দৃশ্য আমাদের চক্ষে পড়িবে। ঐক্যের আদর্শবাদে পরিতুষ্টি যেখানে, সেখানে হয়তো ইহাতে জীবন

শিহরিয়া উঠিবে। কিন্তু সত্যকে বড় নিষ্ঠুর মূর্ত্তিতেই বরণ করিয়া লইতে হয়।

সুরাটের কংগ্রেসমণ্ডপে, স্যার রাসবিহারীকে সভাপতি-রূপে বরণ করার ভার সুরেন্দ্রনাথের উপর ছিল। তিনি এ প্রস্তাব উত্থাপন করা মাত্র, লোকমান্য তিলক ইহাতে আপত্তি তুলিলেন। আর যায় কোথা? একদল লোকমান্য তিলকের জামা ধরিয়া তাঁহাকে বসাইয়া দিবার উদ্যোগ করিল। অপর পক্ষ রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতির আসন-পরিগ্রহে উদ্যত দেখিয়া ভীষণ কোলাহল তুলিল। সে দৃশ্য সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন: "Chairs and shoes and slippers were flung at the leaders, the platform was rushed—I remained on the platform with some of my friends forming a guard around me."

কংগ্রেস-সভায় পুলিস আসিয়া শান্তি রক্ষা করিল। তিলক, খাপার্দ্দে, অরবিন্দ এবং জাতীয় পক্ষের নেতারা পুলিসের সাহায্যে সভাক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। ভারতের কংগ্রেস ইহার পর দশ বৎসর আর যোড়া লাগে নাই। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে আবার সর্ব্বদল যোগদান করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের এই ঘটনা কংগ্রেসের ইতিহাসে সকলের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

সুরাটের কংগ্রেস-ভঙ্গ হওয়ার পর, ভারতের নিখিল রাষ্ট্রসভা অন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রধান নেতা সুরেন্দ্রনাথ চরমপন্থীদলের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ রাষ্ট্রবিৎ পণ্ডিতগণের সহিত আপোষে বঙ্গভঙ্গরোধের প্রচেষ্টা আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধার আসন তিনি হারাইয়াছিলেন;

কিন্তু তাঁর প্রতিভা ও দূরদৃষ্টি দেশের প্রকৃত কল্যাণসাধনের জন্য একদিনও ম্লান হয় নাই। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মর্লি-মিণ্টো সংস্কার-প্রবর্ত্তনের সময়েও তিনি বঙ্গভঙ্গরোধের সঙ্কল্প-পূরণের জন্য ভিতরে-ভিতরে প্রাণপণ চেষ্টা করেন ; কিন্তু ‘ settled fact” আর নাকচ হয় না, এই উত্তর তাৎকালীন দেশের বড়লাট বাহাদুর মিণ্টো মহোদয়ের নিকট পাইয়া তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন।

কিন্তু লর্ড মিণ্টোর অবসরগ্রহণের পরই, লর্ড হার্ডিঞ্জ এ দেশের সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন। তিনি ভারতনেতৃগণের এক-প্রকার অপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। এইজন্য বাংলার এই সঙ্কটযুগে তাঁর শাসনকার্য্য কি প্রকার হইবে, ইহা লইয়া অনেক ক্ষেত্রে চিন্তার কারণ হইয়াছিল ; কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর গুণগ্রাম প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তিনি চতুর রাষ্ট্রবিৎ হইলেও, তাঁর সদ্ব্যবহারে ভারতের নেতৃবৃন্দ বিমোহিত হইলেন ; জাতীয়তার ঋষি সুরেন্দ্রনাথ লর্ড হার্ডিঞ্জকে লর্ড বেণ্টিঙ্ক, ক্যানিং ও রিপনের সমতুল্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, বঙ্গভঙ্গজনিত ব্যথার কথা লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরকে বিদিত করার জন্য, কলিকাতার টাউনহলে এক রাক্ষসী সভার আয়োজন হয়। এই সভার কথা শুনিবামাত্র বড়লাট বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া পাঠান। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিলে, লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রকাশ্য সভার অপেক্ষা বঙ্গভঙ্গরোধ করার উপায়স্বরূপ দেশনেতৃগণের স্বাক্ষরিত এক মেমোরিয়াল-প্রদানের সঙ্কেত প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, সুরেন্দ্রনাথ তখন সঙ্কল্প-পূরণ করিতে পারিলে দায়মুক্ত হন ; এই অবস্থায় লর্ড হার্ডিঞ্জের নির্দ্দেশানুসারে, তিনি সাধারণ সভা বন্ধ করিয়া দেন।

তারপর গোপনে-গোপনে বাংলার পঁচিশটী জিলার মধ্যে আঠারটী জিলার প্রতিনিধিবর্গের সহি লইয়া তিনি এই মেমোরিয়াল লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট দাখিল করেন।

বাংলার আন্দোলনকারিগণকে এ কথা জানান হয় নাই ; এমন কি সেই সময়ে গভর্ণমেণ্টের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ঢাকার নবাব সলিমুল্লা পর্য্যন্ত এই ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গ বুঝিতে পারেন নাই। "বেঙ্গলী"র লেখার ভঙ্গী দেখিয়া অনেকে ভিতরে-ভিতরে একটা আপোষের ব্যাপার চলিতেছে, ইহা অনুমান করিতেন ; কিন্তু এ বিষয় সুরেন্দ্রনাথ এমনই গোপন রাখিয়াছিলেন যে, কোন পক্ষই ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করার সুযোগ পান নাই।

অনেকে সুরেন্দ্রনাথকে ইহার জন্য দায়ী করেন ; কিন্তু তিনি ছিলেন বৈধী আন্দোলনের সাহায্যে ভারতে শনৈঃ-শনৈঃ স্বায়ত্তশাসন-প্রবর্ত্তনের প্রবর্ত্তক। তিনি যে রাজনীতিক জীবন আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কোনদিন বিচলিত হন নাই—সঙ্কল্পপূরণের জন্য তাঁর ছিল অলন্ত বিশ্বাস—দেশের দিক্ হইতে বিপ্লবের অশান্তি-সৃষ্টিতে এবং রাজ্যশাসননীতির কঠোর পীড়নেও তিনি বিচলিত হন নাই। বরিশালের পুলিসের লাঠিও তিনি যেমন অকাতরে সহ্য করিয়াছেন, আবার দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে অপদস্থ করার জন্য তাঁহার মাথা লইয়া গেণ্ডুয়া খেলার চিত্রও যখন বাহির হইয়াছে—তখনও তিনি ছিলেন অটল, নিথর হিমালয় ; পরিশেষে তাঁরই চেষ্টায়, দ্বিখণ্ড বাংলা অখণ্ড মূর্ত্তিতে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বরে দিল্লীর দরবারে স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরের মুখ দিয়া, বঙ্গভঙ্গরহিত হওয়ার ঘোষণা বাহির হওয়া মাত্র, দেশে উৎসাহের আগুন ছড়াইয়া পড়িল। বাঙ্গালীর পণ-রক্ষা

হইল বলিয়া সেদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িয়াছিল। "বেঙ্গলী" অফিস হইতে সুরেন্দ্রনাথকে বিপুল জনতা স্কন্ধে চাপাইয়া কলেজ স্কোয়ারে লইয়া আসে। তুমুল "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস ঘন-ঘন কম্পিত হইতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ রহিত হইল; কিন্তু বাঙ্গালীর প্রাণে স্বাধীনতার যে আগুন ধরিয়াছিল, তাহা নিভিল না। বঙ্গভঙ্গ সেদিন উপলক্ষ্য হইয়া আসিয়াছিল, তাহার রোধ হইয়াছে; বাঙ্গালীর প্রাণের আগুন নিভিবে কবে? এই জটিল সমস্যা মানুষের আপোষে নিষ্পত্তি হওয়ার নহে; স্বয়ং বিধাতাই বাঙ্গালীকে চরম শান্তি প্রদান করুন—আমাদের ইহাই প্রার্থনা।

বাংলার তরুণ বুকের রুধির ঢালিয়া যে হোরীখেলায় প্রবৃত্ত হইল, সে রক্তরঙ্গে মাতিয়া, জাতির জীবনের শুদ্ধ-শুভ্র যে আত্ম-প্রকাশ, তাহা আর ঘটিয়া উঠার সম্ভব হইল না। বাংলার রাষ্ট্র-সাধনায়, এই স্বচ্ছ আত্মপ্রকাশ কয়েকটী বিশিষ্ট ধারা টানিয়া ফুটিবার চেষ্টা করিয়াছে। বাঙ্গালী চাহিয়াছে স্বরাজ, চাহিয়াছে স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্যের প্রবর্ত্তন, চাহিয়াছে জাতীয় শিক্ষা—স্বদেশীর সাহায্যকল্পে চাহিয়াছে বহিষ্কার—বিদেশীর সাহচর্য্য, বিশেষ বিদেশী পণ্যবাণিজ্যের বয়কট—এই চতুরঙ্গ প্রেরণা ধরিয়াই বাংলার স্বদেশী যুগের সাধনা গোড়া হইতে আত্মনিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছে। এই প্রেরণার বশেই বাঙ্গালী চরমপন্থী মারাঠী চরমপন্থীর সহিত হাতধরাধরি করিয়া কলিকাতা কংগ্রেসে ভারতের রাজনৈতিক পিতামহ ৺দাদাভাই নৌজীর মুখে 'স্বরাজ'-মন্ত্র বলাইয়া লইয়াছে, গতানুগতিক ভিক্ষা-নীতির দুর্গাধিকার করিবার উৎসাহে, সুরাটের দক্ষযজ্ঞে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়াছে, নূতন জাতীয় দল গঠন করিতে শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে।

১৯০৫ হইতে ১৯১২ এই স্বল্প-পরিসর কয়েক বর্ষ কাল, অথচ তাহারই মধ্যে যে বিচিত্র যৌগিক ক্রমে জাতি-জীবনের অদ্ভুত বিবর্তন, তাঁহার সকল কথা গুছাইয়া বলিতে গেলে এক মহাপুরাণ রচনা করিতে হয়, এখানে কেবল একটী অধ্যায়ের সূচীপত্র দিতে পারিয়াছি—ইহা স্বদেশী যুগের প্রথম অধ্যায় মাত্র। আসল কথা সবখানিই বাকী রহিয়া গেল।

বাঙ্গালীর ইহা জীবন-বেদ, তার কতটুকু স্মৃতি উদ্ধার করিতে পারিলাম? সেই পার্টিশন-হুকুম অবধি তাহার রদ হওয়া পর্য্যন্ত, বাঙ্গালীর দৃঢ়পণে "settled fact unsettled" করা, ইহারই মধ্যে কত ঘটনা ছাড় পড়িয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখের মৌলিক তপঃশক্তি জাতীয় সঙ্কল্পকে উক্ত বিশেষ ঘটনায় জয়যুক্ত করিয়াছে, কিন্তু জাতীয় দল যে ভবিষ্যতের নবস্বপ্নের প্রেরণাদৃষ্টি লইয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিল, তাহার সার্থকতার সুযোগাভাবে জাতীয় জীবনে এই নূতন তপঃশক্তি অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা লইয়া ধীরে-ধীরে ধ্যান-গুহায় অবগাহন করিয়া, কেন আত্মগোপন করিল—তার নিগূঢ় কারণের উন্মেষ কিছুই করা হইল না। লর্ড মিণ্টোর 'honest swadeshi'র কথা, ফুলারের পদত্যাগের কথা, বৈকুণ্ঠ সেনের' 'impatient idealists' অভিধান দেওয়া পর্য্যন্ত নরম-গরম দলের ঘটনাঘটনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ-কথা, বোমার আবির্ভাবে কলিকাতাব্যাপী প্লাকার্ড "Beware the Nunia is coming" তাহার কথা—সবই ত বলা বাকী রহিল। একদিকে রক্তপন্থী বিপ্লবতন্ত্রী, অন্যদিকে দমনোৎসুক রাজশক্তির মুখোমুখী সংগ্রাম, আইনের নখদন্তবিকাশের সঙ্গে অগ্নিনালিকার ধস্তাধস্তি, এবং রেগুলেশনে বাংলার নবরথীর নির্ব্বাসনদণ্ড, সূর্য্যাস্ত-বিধি, কণ্ঠরোধ

আইন, প্রেস আইন, সমিতি আইনের প্রযোগ প্রভৃতি সকল কথা—সেই সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের বাংলার রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রবেশ, তাঁর কারাসাধনা ও মুক্তি, তাঁর "ধর্ম্ম" ও "কর্ম্মযোগিনের" মধ্য দিয়া নব দিব্য জাতীয়তার মন্ত্রপ্রচার, তাঁর "Open letter to my countrymen" ও সিষ্টার নিবেদিতার পরামর্শ, পরিশেষে চন্দননগরে ঐতিহাসিক অজ্ঞাতবাস—স্বদেশী যুগের বিকাশ ও পরিণতির মর্ম্ম সবই ইহার মধ্যে নিহিত—সে সব অবর্ণিত রহিল। জাতীয়ভাবের আত্ম-প্রকাশের আজ সময় নহে বলিয়া, শ্রীঅরবিন্দ যে শেষ কথাটী আমাদের নিকট রাখিয়া, নবযুগের সৃষ্টিসাধনায় মহাডুব দিলেন, এখানে শুধু তাহারই গুটিকয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া সংক্ষেপে উপসংহার করি—

"We have worshipped the Country, the National Mother as God. That was well that carried us far. But it was only a stage to bring the Europeanised mind back to spirituality. It was the worship of a *Rupa*, an *Ishta* by which to rise to the worship of God in His fullness. We used the mantra, "Bandemataram", with all our heart and soul and so long as we used and lived it, relied upon its strength to overbear all difficulties, we prospered. But suddenly the faith and the courage failed us, the cry of the mantra began to sink and as it rang less feebly, the strength began to fade out of the country. It was God who made it fade and falter, for it had done its work. A greater Mantra

than "Bandemataram" has to come. Bankim was not the ultimate seer of Indian awakening. He gave only the term of initial and public worship, not the form and the ritual of the inner secret *Upasana* .. ... when the mantra is practised even by two or there, then the closed Hand will begin to open ; when the *Upasuna* is numerousely followed, the closed Hand will open absolutely".

সেই গুঢ় উপাসনা কি ? ঋষির কণ্ঠেই বাঙ্গালীর অন্তরাত্মা উহা শুনিয়া লইয়াছে, নবীন মাতৃমন্দিরে সেই অনাহত ঋক্‌মন্ত্রই আজ সুরে লয়ে ঝঙ্কৃত হইতেছে—

—"It is a national *Atmasamarpana*—self-surrender—that God demands of us and it must be complete."

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

Then the promise will come true.

"অহং ত্বাম্ সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

স্বদেশী যুগের এক যুগের অবসান অর্থাৎ ১৯০৮ হইতে ১৯১৯ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী রক্তের আঁচড়ে টানিয়া যে নূতন ইতিহাস রচনা করিয়াছে, সে ইতিহাসের মর্ম্মকথা আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

*

* *

॥ কুড়ি ॥

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য বাঙ্গালী রক্তাক্ত পথে অভিযান করিয়াছে। ধ্বংসের ধ্বজা উড়াইয়া উল্কার ন্যায় যাঁহারা তরুণ বাংলায় অভ্যুদিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা আজ চিরস্মরণীয়। তাঁহারা বাংলার বিপ্লবযুগের প্রবর্ত্তক। সে যুগ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু স্বদেশী যুগের পরেই বাংলার এই অগ্নিযুগ ইতিহাসে অক্ষয়স্থান অধিকার করিবে।

এ যুগ ধ্বংসের। ইঁহারা ধ্বংসের দেবতা। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য ইঁহারা ইংরাজ-রাজ্য ধ্বংস করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন। বিদেশী রাজের প্রবর্ত্তিত শাসনপদ্ধতি সে যুগে অন্য অনেকেরই অনভিপ্রেত ছিল, কিন্তু তাঁহারা কেহই উহার উচ্ছেদ কামনা করেন নাই; বিশেষতঃ সশস্ত্র সমরায়োজনে কেহই ভারতের রাষ্ট্রীয় সমস্যা দূর করিতে অগ্রসর হন নাই। এইসব অগ্নিশিশু কিন্তু সেই দুর্গম পথই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইউরোপে যখন রণদামামা বাজিয়া উঠে, ভারতের আকাশ তখন কিছুদিন স্তব্ধ ছিল। অগ্নিনালিকায় যাঁহারা অগ্নিবার্ত্তা ঘোষণা করিতেন, ব্যোম বিদীর্ণ করিয়া যাঁহারা বজ্র নিক্ষেপ করিতেন, ভারতের সেই অগ্নিবীরেরা পর্য্যন্ত তখন কিছুদিন আড়ষ্ট হইয়া ছিলেন। ইউরোপে যুদ্ধ-ঘোষণার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহারা স্বকপোলকল্পিত দুষ্টের দমন করিতেন, ব্যক্তিগতভাবে দেশদ্রোহীর শাস্তি বিধান করিতেন, এই কার্য্যেই স্থানে-স্থানে ঘটনা ও ক্ষেত্র-বিশেষে তাঁহারা আত্মাহুতি প্রদান করিতেন—এইরূপ অশান্ত

নিদর্শনেই তরুণদল সে অগ্নিযুগের পরিচয় দিতেছিলেন, কিন্তু ইঁহারাও ইউরোপের রণবাদ্য শ্রবণ করিয়াই, ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্থিত হইতে পারেন নাই, পরন্তু পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসমূহ কিছুদিন ত্যাগ করিবার সংকল্প করিতেছিলেন।

যদিও অকূল প্রবাহে ইঁহারা ভাসিয়াছিলেন, যদিও দেশযজ্ঞে আত্মাহুতি ইঁহাদের অতুলনীয় সম্পদ্ ছিল, যদিও এই উজ্জ্বল প্রেরণা লইয়াই ইঁহারা দুরূহ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি আলিপুরের প্রথম ষড়যন্ত্র হইতে বরিশাল ষড়যন্ত্র পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়া আমরা দেখিয়াছি—বঙ্গীয় অগ্নিদূতগণ বাংলার তরুণ হৃদয়ে বিপ্লবযজ্ঞের সঙ্কল্প-প্রতিষ্ঠা ভিন্ন যুদ্ধোদ্যমের বড় কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহারা গভীর আশা পোষণ করিতেন। স্বাধীনতার উপাসক অগ্নিহোতৃগণ যখন জ্বলন্ত শিখা লইয়া ভারতের প্রতি পল্লীতে বিরাজ করিবে, তখন ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের জন্য, ঐক্যবল, অস্ত্রবল, ধনবল, সকল বলই সংগৃহীত হইবে—এই জ্বলন্ত বিশ্বাসই তাঁহাদিগকে তরুণ-মহলে ষড়যন্ত্র-বিস্তারে উত্তেজিত করিয়াছিল। এইরূপ ষড়যন্ত্রের মূল্য তাঁহারা অধিক করিয়াই দেখিতেন; ইউরোপের রণ-কোলাহলের মাঝে এখানে যদি একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, যদি একটি লোকও পিস্তলের গুলীতে ইহলীলা সম্বরণ করে, তাহা হইলে বোধহয় ইংরাজ প্রচণ্ড বিক্রমে এই সব ষড়যন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করিবে, বোধহয় অচিন্ত্যপূর্ব্ব কঠোর আইন পাস করিয়া ইংরাজরাজ দেশে একটা বিষম ভীতির সঞ্চার করিবে, এইরূপ চিন্তায়, দুই-এক মাস অগ্নিদূতগণ কোন কার্য্যই করেন নাই। ইহার পরেই যে-শক্তি তাঁহাদিগকে মাতাইয়া তুলে, তাহাই সত্য বিপ্লবশক্তি। ইহার পূর্ব্বে, যুগান্তরের আবির্ভাবের পর হইতে উত্তাল তরঙ্গ মন্থন করিয়া

বাংলায় যে বিপ্লবশক্তি ঝিলিক দিয়া খেলা করিতেছিল, তাহার সহিত ইহার জাতিগত কোন পার্থক্য নাই, কিন্তু উহা যাহার পূর্ব্বাভাস, তাহাই অতঃপর ইউরোপের ঘন ঘটার মাঝে বাংলার বুকে নামিয়া আসিল—বীরের দল যথার্থ বিপ্লব-সাধনায় মরণপণ গ্রহণ করিল।

এ সঙ্কল্পের পরিচয় আমরা বাহিরে খুব বেশী দেখি নাই, তরুণ ষড়যন্ত্রকারিগণ বিপ্লব বা দেশব্যাপী বিদ্রোহ ঘটাইতে পারেন নাই, ষড়যন্ত্রেই তাঁহাদের কার্য্য শেষ হইয়াছিল। কিন্তু ষড়যন্ত্র ছিল বিপ্লবায়োজনের। বিদ্রোহ সৃষ্টি করিবার সাক্ষাৎ ষড়যন্ত্রে এবার রাংলার বীরপুত্রগণ মাতিয়া উঠেন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা দল গড়িয়াছিলেন, দলরক্ষার জন্য তাঁহারা বোমা ও পিস্তল ব্যবহার করিতেন, স্বদেশীর মূলোচ্ছেদ হওয়ায় একসময়ে গভর্ণমেণ্টের ছোট-বড় কর্ম্মচারীদের প্রতিও তাঁহারা ঐ সকল অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সম্মুখ-সংগ্রামে সংলিপ্ত হইয়া ভারতের ভাগ্য-নির্ণয়ের দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষায় আত্মাহুতি দিতে তাঁহারা সেই প্রথম অগ্রসর হইলেন। নিঃশঙ্ক দুঃসাহসিকতা বাঙ্গালী অগ্নিদূতদিগের বিশেষত্ব, এই দুঃসাহসিকতা সেদিন চরমে উঠিয়াছিল, এই মহাকাঙ্ক্ষায় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে সংগৃহীত সকল আয়োজনই তাঁহারা আহুতিরূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

কেবল ষড়যন্ত্রপ্রকাশেই এসব কথা ব্যক্ত হয় নাই। এক-একটি বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা দমিত হইত, অমনই প্রজ্জ্বলিত ক্রোধাগ্নি একান্ত দুঃসাহস-বশে পুলিস-প্রহরীর অঙ্গ বেষ্টন করিয়া তাহাকে ভস্মে পরিণত করিত। যুদ্ধের সময়ে বঙ্গে যে অদ্ভুত দুঃসাহসিকতায় পুলিস কর্মচারী নিহত হইত, তাহার পশ্চাৎ বিরাট বিপ্লব-যজ্ঞের

সংকল্পাগ্নি হু-হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিত। এ-সংবাদ সকলে জানেন না, তাহার তালে-তাল দিয়াও সকলকে চলিতে হয় নাই—যে বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ এই সকল কার্য্য, সে-বিপ্লব বাংলায় বাস্তব জীবনে ঘটে নাই; কিন্তু একদল তরুণের হৃদয়-রাজ্যে বিপ্লবের স্বপ্ন জাগিয়া উঠিয়াছিল, বাংলার সেই তরুণমহল সেদিন একত্র হইয়া একবার উদাত্ত-কণ্ঠে রুদ্র মরণযজ্ঞের আবাহন করিয়াছিল। এই সময়ে বাংলার ধমনীতে যে উত্তপ্ত শোণিত প্রবাহিত হয়, তাহার সত্য ইতিহাস সকলে জানেন না।

সত্যই অগ্নিস্ফুলিঙ্গসদৃশ এক-একটি বালক তখন তেজোগর্ব্বস্ফীত ও বীরত্বমহিমোজ্জ্বল হইয়া অখণ্ড বাংলার পথে-পথে বিচরণ করিত। অবশ্য সে খুব অল্পদিনের জন্যই। ইহারই পূর্ব্ব যুগপর্ব্বে গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারীকে অন্তরের অগ্নিশিখা লুকাইয়া-লুকাইয়া বিচরণ করিতে হইত; এইরূপে অধিক দিন যে সকল যুবক বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিতেন, তাঁহাদের চালচলনে বীরত্ব ফুটিয়া উঠিত না, মরণ-যজ্ঞের লেলিহান অগ্নিরূপে তাঁহারা সকলের নয়নরঞ্জন করিতেন না; কিন্তু এই সত্য বিপ্লবোদ্যমের অনতিপূর্ব্বে এই সকল বক্ররূপণ অগ্নিসাধক মরণযজ্ঞের আলো জ্বালিয়া বড় উজ্জ্বল হইয়াই দেশের বুকে চলাচল করিতেন। এই সময়ে সুশীলকুমার সেন এইরূপ এক অগ্নিশিখা-রূপে বাংলার বৈপ্লবিক নেতাদিগের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা হইতে মুক্তি পাইয়া লেখাপড়ায় মনো-যোগ দিয়াছিলেন, বিশেষ সম্মানের সহিত আই-এস্-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এস্-সি পড়িতেছিলেন, সেই সময়ের মরণের বাজনা লইয়া যতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকারিগণ সুশীলের সমক্ষে উপস্থিত হইলে, নবীন প্রাণ তাহার সমস্ত রক্ত ঢালিয়া সে মৃত্যুপথ বরণ

করিয়া লইয়াছিল দেশমাতার মুক্তিকামনায়। সুশীলেরই ন্যায় এমন আরও শত-শত যুবকপ্রাণ বক্ষঃ চিরিয়া রক্ত ঢালিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারা বহুদিনব্যাপী ষড়যন্ত্র ভাল বুঝিত না, তাজা রক্ত ঢালিয়া যদি আজই মার উদ্ধার হয়, তাহা হইলে তাহারা যুবজনোচিত সকল স্বপ্নই বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিল! বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রকারী বাংলায় এই যে রক্ত-তর্পণের নূতন অধ্যায়, ইহাই ঠিক বিপ্লবাধ্যায়। রাসবিহারীর অগ্নিপ্রেরণায় প্রথম বাংলার নেতৃদিগের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হয়, তৎপরে সমগ্র বিপ্লবী বাংলা যতীন্দ্রনাথকে নেতৃরূপে বরণ করে। যোগ্য ব্যক্তিই যোগ্য কার্য্যে বৃত হন, সম্মুখযুদ্ধে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া ইনি বাংলার বিপ্লবযুগকে সে যুগপ্রভাতেই স্পষ্ট করিয়া গিয়াছেন। ইহার আগে ও পরে বাংলায় অস্ত্র আমদানী করার যে ব্যাপক প্রয়াস, তাহাতে তাঁহার অনেক সুযোগ্য সহকারীই কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে ঘন-ঘন পুলিস-হত্যার ফলে, বিশেষতঃ ডেপুটি সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট বসন্ত চ্যাটার্জ্জীর হত্যার পরে ইঁহাদের অধিকাংশ ইংরাজের বেড়াজালে ধৃত হন। বৈপ্লবিক বাংলার সেই বিপ্লবাধ্যায় এইভাবে অনতিকাল মধ্যেই শেষ হয়।

বিপ্লবায়োজনের জন্য বঙ্গীয় যুবকদল বিস্তৃত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন—জার্মাণ-রাজপুরুষদিগের সহিত তাঁহাদের ষড়যন্ত্রের কথা রৌলাট রিপোর্ট প্রভৃতি পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। এই ষড়যন্ত্র উপলক্ষ্যেই নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (পরে নামান্তরে মানবেন্দ্র রায়) বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। ষড়যন্ত্রের ভীষণ আবর্ত্তে পড়িয়া তাঁহার সুপ্ত বিপ্লব-প্রতিভা জাগরিত হয়, সেই প্রতিভার প্রেরণায় ভারতের বাহিরে মানবেন্দ্র রায় বিশেষ চিন্তাশীল বিপ্লবী রাজ-

নৈতিক রূপে নব সোভিয়েট রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি লেনিনের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপ, রাসবিহারী বসু প্রভৃতিও বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের জন্যই বিদেশে গমন করেন, এবং এক-একজন এক-এক স্থানে বিদেশী গভর্ণমেণ্ট বা বিদেশী গভর্ণমেণ্টের পদস্থ ব্যক্তিদের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন করেন। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ বাঙ্গালী নন, তথাপি আফগানিস্থান গভর্ণমেণ্টে তাঁহার রাজদূতের ন্যায় উচ্চাসন-লাভ বাংলার বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের প্রভাবেই সম্ভবপর হইয়াছিল, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নামও এই স্থানে উল্লেখ করিলাম।

যুদ্ধকালে বিপ্লবোদ্যোগের জন্য বাংলায় যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, তাহা তৎপূর্ব্ব যুগের ষড়যন্ত্রান্দোলনেরই পরিণতমূর্ত্তি—তজ্জন্য সুশৃঙ্খল সমিতিরূপে পরিণত করিতে ইহাতে আর অধিক পরিশ্রম করিতে হয় নাই। সেই সময়ে, আমেরিকাপ্রত্যাগত বিপ্লব-পন্থীদিগকে একটি বৈপ্লবিক কার্য্যকরী সমিতির অধীন করিতে পাঞ্জাবে রাসবিহারীকে যে সাধনা করিতে হইয়াছিল, বাংলার বৈপ্লবিক নেতাদিগকে সেরূপ গুরুতর উদ্যম করিতে হয় নাই। পাঞ্জাবী বৈপ্লবিকগণ ভাবোচ্ছ্বাসে চঞ্চলপদে অগ্রসর হইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়েন, কিন্তু কর্ম্মসূত্র ধরিয়া নিশ্চিত সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইবার কৌশল তাঁহারা অনবগত ছিলেন। এই সময়ে তাঁহারা রাসবিহারীকে পাইয়া তাই তাঁহাকে নেতৃপদে বরণ করেন। রাসবিহারী সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে একটি বৈপ্লবিক কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিয়া সুশৃঙ্খলাস্থাপনের পরে দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহের রক্তকেতন ভারতে উড়াইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সঙ্কল্পানুযায়ী কার্য্যও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল; কিন্তু

বিদ্রোহের পশ্চাৎ দৃঢ়বদ্ধ শক্তিকেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে তাঁহাকে অনেক বহুমূল্য সময় নষ্ট করিতে হয়। বাংলায় তাহার প্রয়োজন হয় নাই। একরূপ এক কথায় বাংলার সমগ্র বৈপ্লবিক সমিতিগুলি বিপ্লবায়োজনের জন্য একত্র সম্মিলিত হন, তাঁহারা সম্মিলিত হইয়া যতীন্দ্রনাথকে নেতৃপদ প্রদান করেন। কেবল ঢাকার অনুশীলন সমিতি নিজেদের পার্থক্য রাখিয়াছিলেন, তবে তাঁহারাও বৈপ্লবিক কার্য্যে নির্দ্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতে সম্মত হন। রাসবিহারী উভয়-দলের নেতৃদিগের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং চন্দননগর বিপ্লব-সমিতির সাহায্যে বাংলার কর্ম্মপ্রবাহের সঙ্গে উত্তর ভারতের কর্ম্মপ্রবাহ সংযুক্ত করিয়া বিপ্লবের অগ্নিসাধনা প্রবলতর ও প্রচণ্ডতর করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বাংলার নেতা যতীন্দ্রনাথ যখন দেখিলেন—ভারতে অস্ত্র ও রসদ-সংগ্রহের সুযোগ নাই, উপায় নাই—তখন তিনি নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ভোলানাথ চ্যাটার্জি প্রভৃতির সাহায্যে গোয়া, জাভা ও শ্যামরাজ্যে ষড়যন্ত্রবিস্তারে অগ্রসর হন। বিদেশ হইতে ইন্ধন-স্বরূপ জার্মাণ সাহায্যের কথা অবগত হইয়া বাংলার বিপ্লবপন্থীরা সেই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ও সেই পথে অগ্রসর হন। বাংলার নেতা বিদেশে লোক পাঠাইয়া বালেশ্বরের জঙ্গলে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিলেন—অস্ত্রাগারেরই প্রতীক্ষায়। রাসবিহারীও ভারতে ব্যর্থোদ্যম হইয়া জাপানে গমন করেন, তথা হইতে অস্ত্রপ্রেরণে তিনিও সযত্ন হন। এই সময়ে বাংলার এই যে বিবিধ বহির্ম্মুখী প্রচেষ্টা, তাহা সকলই বিশেষভাবে অস্ত্র এবং সম্ভবপর হইলে অর্থসংগ্রহের জন্যও হইতে থাকে। এই কার্য্যের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিবার স্থান ইহা নহে। সকল

উদ্যমই শেষে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু এই সময়ে অন্তর্ম্মুখী প্রচেষ্টায় দেশমধ্যে তাঁহারা ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের মত ফণা বিস্তার করিয়া চলিতেছিলেন, ইহার ফলে মধ্যে-মধ্যে পুলিস-কর্ম্মচারীর প্রাণ বিনষ্ট হইত। তাঁহাদের ক্রোধাগ্নি সমিধ্-বিহনে শেষে ভস্মস্তূপে লুপ্ত হয়। পরিশেষে এই ভস্মস্তূপ গভর্ণমেণ্টের মিউজিয়ম-স্বরূপ প্রথমে কারাগারে অথবা গ্রামে-জঙ্গলে রক্ষিত ও পরে ক্রমে-ক্রমে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়।

বিদ্রোহসৃষ্টির জন্য রাসবিহারী প্রথমে সশিষ্য পাঞ্জাবে ও উত্তর-ভারতে সিপাহীদিগের মধ্যে ষড়যন্ত্রবিস্তারে অগ্রসর হন, কৃষকদিগকেও তাঁহারা বশীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; বঙ্গীয় নেতৃগণ কিন্তু মূলতঃ ছাত্রমহলেই তাঁহাদের কার্য্য সীমাবদ্ধ রাখেন। বাংলার বিপ্লবযুগ-পূর্ব্ব বৈপ্লবিক নেতৃগণ ছাত্রদিগকেই সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া, আবশ্যক হইলে সম্মুখ সংগ্রামেও ইংরাজশাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিবার আশা পোষণ করিতেন। বাংলার নির্ভীক কৃষক নাই, বাংলার সৈন্য নাই, তজ্জন্যই তাঁহারা বোধহয় পূর্ব্বোক্ত পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রের যুগে সাহসী উৎসর্গপ্রাণ শিক্ষিত যুবকবৃন্দ ভিন্ন অন্য কোন সম্প্রদায়ই এরূপ দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে সাহসী হয় না, ইহা বাঙ্গালী ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন। তথাপি যাঁহারা যুবক লইয়া দীর্ঘদিন ষড়যন্ত্র করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহারা যেভাবে তাঁহাদের নবীন সহকর্ম্মী গ্রহণ করিতেন, বাংলার বিপ্লবযুগে তত পরীক্ষা করিয়া "সৈন্য" সংগৃহীত হয় নাই। অধিকন্তু ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে মাদারীপুর সমিতি ভিন্ন যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীনে কোন সমিতিই বৈপ্লবিক ভাবচর্চ্চা ও দলগঠন ছাড়া লুণ্ঠন, নরহত্যা প্রভৃতি গুরুতর কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই, তজ্জন্য সকল

বিষয়ে মন্ত্রগুপ্তির কঠোর অনুশাসনে তাঁহারা অভ্যস্ত হন নাই—ইঁহাদেরই নিকট হুড়াহুড়ি করিয়া বাংলার নবীন বিপ্লবের জন্য যাঁহারা গুপ্ত সৈনিকসংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্ফীতবক্ষে সকলকেই বিপ্লবযজ্ঞের বেদীতলে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

॥ একুশ ॥

বিপ্লবযজ্ঞে বাংলার সৈনিকদিগের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া আমরা বিপ্লবপূর্ব্ব ষড়যন্ত্রযুগের আবরণ উন্মোচন করিব। সেখানেও এই নবীন তপস্বীর দল, সেখানেও এই আশাস্ফীত স্ফুটযৌবন বঙ্গীয় যুবকগণই নেতার আসন অলঙ্কৃত করিতেছেন। যেমন রাসবিহারী চন্দননগর সমিতির পক্ষে পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন, যতীন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ অন্তরালে থাকিলেও, তাঁহার অগ্নিশিষ্য-গণই তখন নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া কলিকাতা ও মধ্যবাংলার ছাত্রমহলে উচ্চভাব, স্বার্থত্যাগ, দেশভক্তি প্রভৃতির সম্যক্ অনুশীলনে যুবকহৃদয়ে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করিতেছেন—ইঁহারা ভাবানুশীলনে যুবক-মনে মুক্তি-সেনার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রেরণাও জাগাইয়া তুলিতেছেন; অন্যদিকে অনুশীলন সমিতি ডাকাতি, লুণ্ঠন প্রভৃতি দুঃসাহসিক অনুষ্ঠান করিয়া বিশেষ শৃঙ্খলিত দলগঠনে অগ্রসর, চন্দননগর বিভিন্ন দলের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মাণ ও সংগ্রহ ও সর্ব্বপ্রকারে সকলকে সহায়তা করিতে তৎপর।

বিপ্লবপূর্ব্ব যুগেও বাঙ্গালীর সেই একমূর্ত্তি, শোণিত ঢালিয়া শোণিতের মূল্যে স্বাধীনতার্জ্জনই তাহার একমাত্র প্রতিজ্ঞা, অন্তরে ইহার সম্যক্ অনুভূতি এবং বাহিরের কোন-কোন কার্য্যে ইহার সম্যক্ পরীক্ষা হইলেই সে মনে করিত, আর দেরী নাই। অস্ত্রবল, সৈন্য-বল, জনসহানুভূতি—এ সকল দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপই ছিল না। বিপ্লবযুগের ব্রহ্মা বারীন্দ্রকুমার লোকসংগ্রহার্থ বন্ধুদিগের সহিত যখন যুগান্তর পত্র প্রচার করেন, তখন বাংলার তরুণ এই অসীম সাহসিকতা

ও শোণিতমোক্ষণের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। ইহার পূর্ব্বে সার্ব্বজনীন বিপ্লবপন্থা অনুসরণ করিয়া গুপ্তসমিতিগঠনচ্ছলে যুবক-শক্তি যে সঙ্ঘবদ্ধ হইত, তাহার মধ্যেও একটা বুদ্ধিবাদী হিসাব (calculation) ছিল, অন্ততঃ দশসহস্র সঙ্ঘবদ্ধ ব্যক্তি এবং লক্ষ মুদ্রার অস্ত্র সংগৃহীত হইবার পরে পাহাড় অঞ্চলে যুদ্ধের 'base' রচনা করিয়া তবে সে বৈপ্লবিক সমিতি তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিবে, এরূপ একটা সংযম তাহার মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের যুগান্তরপন্থী সে সব হিসাবের কথা ভুলিয়াই যান।

ভুলিবারই কথা—বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে নবপন্থার পুরোহিতদিগের নগর-নগরান্তরে ভ্রমণ করিবার ফলে যে সব চিন্তাশীল ব্যক্তি বিপ্লবপন্থার সমর্থন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ইংরাজবর্জ্জিত ভারতবর্ষের স্বপ্নটিই গ্রহণ করেন, এই স্বপ্নের মাদকতা ও লর্ড কার্জনের কঠোর শাসন তাঁহাদিগকে ভীষণ আবর্ত্তে নিক্ষেপ করে। এই সময়ে তাঁহারা ইংরাজবর্জিত ভারতের আদর্শটুকু গ্রহণ করিয়াই ইংরাজশাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে নবরাজনীতিক অনুশাসন প্রচার করেন, তাঁহাদের প্রচারের ফলে বাংলায় স্বাদেশিকতা নবালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—কিন্তু তাহাতে ছিল না বিদ্যুতের ঝিলিক, ছিল না বজ্রের কড়-কড় শব্দে গগন বিদীর্ণ করিবার শক্তি।

বিপ্লবসাধনার অনুশাসন অগ্রাহ্য করিয়া ও সংরক্ষণী চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া যখন কয়েকজন চিন্তাশীল অগ্রণী নেতা প্রকাশ্য ও অভিনব উপায়ে রাজনীতিক স্বাধীনতার্জ্জনের কথা ঘোষণা করেন, এবং দেশবাসী হাততালি দিয়া তাহার সমর্থনে আত্মহারা হয়, তখন বিপ্লবসাধনায় অগ্রদূত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, দেবব্রত বসু ও ভূপেন্দ্রনাথ

দত্ত আর নীরব থাকিতে পারেন নাই ; তাঁহারাও মনে করিয়াছিলেন, বাংলার জনসঙ্ঘকে এবং বাংলার বিপুল ছাত্রবাহিনীকে প্রকাশ্য-ভাবেই বিপ্লবের কথা শুনাইবেন। বাংলায় স্বাদেশিকতার উত্তাল তরঙ্গমধ্যে যদি বিপ্লবের জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠে, বারীন্দ্র, ভূপেন্দ্র, দেবব্রত প্রভৃতি মনে করিয়াছিলেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিজেরাই অগ্রসর হইয়া ঝটিকাক্ষুব্ধ জনসমুদ্রে ইংরাজশাসন ধ্বসাইয়া দিবেন। তাই তাঁহারা অস্ত্রের আমদানী, দলগঠন প্রভৃতির চিন্তা বোধ হয় কিছুদিন ত্যাগ করেন। কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য যে, তাঁহাদের অন্তঃকরণ হইতে এবং বাংলার বৈপ্লবিক চিন্তাধারা হইতে ইহা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। তজ্জন্যই যুগান্তরের সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতির দ্বারা বিচারালয়ে ইংরাজশাসন অমান্য করার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াই বারীন্দ্রকুমার গুপ্ত বৈপ্লবিক দলগঠনে অগ্রসর হন।

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই ক্ষুরধারবুদ্ধি উপেন্দ্রনাথ তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হন। বুদ্ধিমান্, ইউরোপীয় ধারানুসারে গুপ্তসমিতি-গঠনকৌশলী হেমচন্দ্রও বিলাত হইতে প্রত্যাগত হন, উল্লাস উল্লসিত অন্তরে বোমার রহস্য উদ্ভেদ করিয়া ইঁহাদের সহিত যোগদান করেন। কিন্তু এই যে নূতন দল গড়িয়া উঠিতেছিল, ইঁহারা যুগান্তর-পূর্ব্ব বিপ্লবনীতি গ্রহণ করিতে পারেন নাই, হেমচন্দ্রের ঈপ্সিত খাঁটি ইউরোপীয় গুপ্ত সমিতিও তাঁহারা গড়িতে পারেন নাই, তাঁহারা নিজদিগের অস্তিত্বজ্ঞাপনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন। এ ব্যস্ততা যুগান্তরপূর্ব্ব বৈপ্লবিক নেতৃবর্গের মাথার বদলে স্বদেশী রাজকর্ম্মচারীর মাথা লইবার ইঙ্গিত হইতেই কেবল আসে নাই—যে আশা লইয়া দেবব্রত, ভূপেন্দ্র, বারীন্দ্রকুমার যুগান্তর প্রচার করেন, যে চিন্তার বিদ্যুৎপ্রভায় উপেন্দ্রনাথ যুগান্তরের স্তম্ভ উজ্জ্বল করিয়া তুলেন, সেই

আশা—স্বদেশিবিক্ষুব্ধ বাঙ্গালীর সেই বীর্য্য লইয়া স্বাধীনভারত রচনা করার দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা যখন যায়-যায়, তখন একটা ক্ষুব্ধ প্রতিহিংসার জ্বালা যুগান্তরপূর্ব্ব বৈপ্লবিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে আসিতে পারে। কিন্তু ইঁহারাও মনে করিয়াছিলেন যে, দধীচির অস্থির ন্যায় নিজেদের জীবনাস্থি লইয়া তাঁহারা যদি দেশবৈরীর সম্মুখবর্ত্তী হন, তাহা হইলে কোথা হইতে বজ্র গর্জ্জিয়া উঠিবে আর অতি দ্রুত ভারতবর্ষে স্বাধীন জাতি সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিবে। এই আশা বা দুরাশা, স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন অন্তরে-বাহিরে সদাই যে জীবন্ত হইয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া আছে, ইহা জানিবার জন্য ও ইহা জানাইবার জন্য যেন বাংলার বীর-গণ দলে-দলে মরণের পথে অগ্রসর হইয়াছিল। এই দুর্জ্জয় আত্মাহুতির প্রেরণায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন ক্ষুদিরাম ও কানাইলাল। সেই শক্তি-প্রেরণার আরাধনা যাঁহারা করিয়াছিলেন, কারাগারেই তাঁহাদের অনেকের জীবনযজ্ঞ নির্ব্বাপিত হয়, অথবা ফাঁসীকাষ্ঠেই শেষ পরিণতি!

এইরূপ অপূর্ব্ব জীবনদান বাঙ্গালী বিপ্লবপন্থিগণ অধিকদিন করেন নাই। বোধহয় সামসুল আলমের হত্যার পরেই তাঁহারা মত পরিবর্ত্তন করেন। কিন্তু ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, কানাই, সত্যেন, চারুচন্দ্র, বীরেন্দ্র যাঁহারাই যে কোনরূপে বিপ্লবোদ্দেশ্যে জীবনদান করিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতি যেন বাঙ্গালী বিপ্লবপন্থীকে আর স্থির থাকিতে দেয় নাই—বিপ্লবের গভীর আয়োজনের পরিবর্ত্তে প্রাণদানের উৎসাহই তাঁহাদিগকে অধিক সঞ্জীবিত রাখিত। তাঁহাদের বিভীষিকাপ্রদ আয়োজনেই যে ভারতের তথাকথিত প্রকাশ্য রাজ-নৈতিক ভাগ্য কোনরূপে নির্ণীত হইতে পারে না, তাহাও তাঁহারা বুঝিতেন; তথাপি একটা জ্বলন্ত গর্ব্ব ও উৎসাহ লইয়া তাঁহারা গুপ্তভাবে সমিতির বিরুদ্ধাচারী ও বিশেষ-বিশেষ রাজকর্ম্মচারীর প্রাণ

সংহারে প্রবৃত্ত হন। একমাত্র পুলিনবাবুর প্রবর্ত্তিত অনুশীলন সমিতি যুগান্তরপূর্ব্ব বৈপ্লবিক নীতি অনুসরণ করিয়া বৃহৎ সঙ্ঘগঠনে তৎপর ছিলেন; যুগান্তরপ্রকাশের সহিত বাংলার বিপ্লবপন্থিদিগের রূপান্তরের প্রভাব ইঁহাদিগকে স্পর্শ করিলেও, ইঁহারা সর্ব্ববিষয়ে পুরাতন কাঠামটী বজায় রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের সহিত চন্দননগর সমিতির সংযোগ হওয়ার পর, ইঁহারাও পূর্ব্বোক্ত পথ অবলম্বন করেন। ইঁহারা ইতঃপূর্ব্বে বিশ্বাসঘাতক ও সমিতির বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তিদিগেরই প্রাণ সংহার করিতেন, ইহা ছিল তাঁহাদের দলরক্ষার জন্য সন্ত্রাস-নীতি (Protective Terrorism)। তাঁহারা চন্দননগরের সহিত মিলিত হইবার পরে পূর্ব্ববর্ণিত জিগীষু সন্ত্রাসনীতি (Aggressive Terrorism) গ্রহণ করেন। ইহা অংশতঃ রাজনৈতিক (Political) এবং অংশতঃ আত্মরক্ষামূলক (Protective Terrorism); কিন্তু মূলতঃ ইহা দেশের জন্য জীবনদানেরই তেজোময় ভাব বা প্রেরণা।

এই ভাব বা প্রেরণাশক্তি অবলম্বন করিয়াই বাঙ্গালী বিপ্লবপন্থিগণ জার্মাণযুদ্ধের সময়ে বিপ্লবযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন। বাংলায় গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই জীবনদানের অনুপ্রেরণা বাঙ্গালী সাধনফলেই লাভ করে। প্রফুল্ল, ক্ষুদিরাম, সত্যেন, চারু, বীরেন, কানাই—এই সাধনায় জলন্ত ঐতিহ্য সৃষ্টি করেন। ইহার ফলেই যুদ্ধের সময়ে বাঙ্গালীর ছেলে বিপুল সঙ্ঘ রচনা করিয়া, সৈন্য ক্ষেপাইয়া, বিদেশ হইতে অস্ত্র আমদানী করিয়া ইংরাজের হস্ত হইতে ভারতরাজ্য ছিনাইয়া লইতে অগ্রসর হয়। উদ্যম ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু ইতিহাস ইহাকে ভুলিতে পারিবে না।

*

* *

॥ বাইশ ॥

কোন্ সাধনায় শঙ্কাহীন, মরণপথের যাত্রী নবীন বাঙ্গালী মৃত্যুকে পদে দলিবার এই ক্ষমতা অর্জ্জন করিল? বীরধর্ম্মী মৃত্যুঞ্জয় স্বাধীনতাসংগ্রাম বঙ্গদেশে অধিক পরিস্ফুট হয় নাই—ইহার জন্য কোন্ মনীষিই না লজ্জিত?- ইহার ব্যথা সকলেই অনুভব করেন। ঋষি বঙ্কিম বাঙ্গালীর এ কলঙ্ক ধৌত করিতে ইতিহাসের আশ্রয় লইয়াছিলেন, বঙ্গবাসী এইরূপে ইতিহাসের বিস্মৃত গুহায় বীর বাঙ্গালীর সন্ধান পাইয়াছেন। এ ইতিহাস পাঠ করিয়া বঙ্গগৌরব বীরচরিত্রের সন্ধান মিলে—কিন্তু দাসসুলভ দৌর্ব্বল্য অন্তরে অনুভব করিয়া ঐতিহাসিক স্বাধীন বীরচরিত্রের উপাসনা বিড়ম্বনা নয় কি? এ প্রশ্ন যাঁহাদের অন্তরে আঘাত করিয়াছে, তাঁহারাই অন্তঃকরণের দাসত্ব ঘুচাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—সাহিত্যে, সমাজ-সংস্কারে, ধর্ম্মান্দোলনে, প্রত্যেক বিষয়ে আত্মনিমজ্জন করিয়া বাঙ্গালী স্বাধীন জাতির সমকক্ষ হইয়াছেন। ঋষি বঙ্কিম গর্ব্ব করিয়াই বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালী দিগ্বিজয় করে নাই, কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত ভারতীয় ধর্ম্ম সত্য-সত্যই দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিল। স্বামীজির ধর্ম্মানুভূতি জ্বলন্ত হুতাশনবৎ জাতীয় দুর্ব্বলতা দগ্ধ করিয়া সত্যই জাতিকে অনন্ত গৌরবময় ভবিষ্যৎ প্রদর্শন করিয়াছিল। ইহা সাধনলব্ধ ভারতবর্ষ। স্বামীজির প্রেরণায় সনাতন ভারত-জাতীয়তা উদ্ধার করিতে ভারতীয় মনীষিগণ নিবিষ্টভাবে আত্মনিয়োগ করেন। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবাচ্ছন্ন ভারত

যখন ক্ষণে উদ্বুদ্ধ, ক্ষণে আত্মচৈতন্যলুপ্ত অবস্থায় বিরাজ করিতেছিল—স্বামীজির প্রেরণায় ইঁহারা ভারতবর্ষের সনাতন পথ নির্ণয় করিতে উদ্বুদ্ধ হন, ভারতে জাতীয়তার ভাব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভাবুকতায় অবগাহিত কিছু চিন্তাশীল ভারতবাসী—এইরূপে অন্তরে অংশতঃ স্বাধীন হইয়া বহির্জ্জীবনে স্বাধীন রাষ্ট্রস্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন্।

ভবিষ্য ভারতের বাণীমূর্ত্তিরূপেই ইঁহারা আবির্ভূত হন। জাতির বহির্জ্জীবন—বিদেশিশাসিত ভারতবর্ষ—ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, সবই তখনও পাশ্চাত্ত্য তন্ত্রীতেই গ্রন্থিযুক্ত। ভারতের শতচ্ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডে গ্রন্থি প্রদান করিতে যাঁহারা নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা কার্য্যতঃ পাশ্চাত্ত্য রাজনীতিক কৌশলই অবলম্বন করেন; কিন্তু একজাতীয় শাসিত ও শাসকের মধ্যে যে কৌশল অবলম্বিত হয়, তাহার অধিক অন্য কিছুই তাঁহারা করেন নাই। আমরা ইংরাজ হইতে মূলে অন্য জাতি—ইহা সকলেই জানিতেন; কিন্তু এই স্বতন্ত্র ভারতবর্ষের যে একটা দিগ্বিজয়ী ভবিষ্যৎ আছে, সেই বিরাট্ ভবিষ্যতের জন্য ভারতবাসীর গ্রাসাচ্ছাদন ভিন্ন ভারতের সম্পূর্ণভাগ্যনিয়ন্ত্রণ যে একান্ত আবশ্যক, তাহা পূর্ব্বযুগের রাজনীতিকগণ তেমন বুঝিতেন না। এই সময়ে ভবিষ্যৎ ভারতের ভাবুকতায় মগ্ন চিন্তাশীল ভারতবাসী রাজনীতিক গগনে তাঁহাদের নূতন ঋক্ উচ্চারণ করেন, নূতন রাজনীতিক ও অর্থনীতিক পন্থার আবিষ্কারের জন্য তাঁহারা ইংরাজশাসনের বিরুদ্ধে সার্ব্বজনীন বর্জ্জননীতি ঘোষণা করেন। এইরূপে নূতন ও পুরাতনে ঘোর দ্বন্দ্ব বাধিয়া যায়। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষ্যে বাংলাই সে যুদ্ধের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।

কিন্তু ইহাও হইল উপরিচর লড়াই—যাঁহাদের মনীষা ছিল, যাঁহাদের মনীষা বিভ্রান্ত হইয়াছিল, তাঁহারা নষ্টোদ্ধারের স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হন; কিন্তু ভারতবর্ষে কি এমন অন্তঃকরণ তখন হয় নাই, যাঁহাদের মধ্যে ঋষি ও মনীষিদের ভবিষ্য ভারত শুধু স্বপ্নরূপে চেতনায় আসে নাই, যাঁহারা জন্ম হইতেই এই বিশ্বাস লইয়া আসিয়াছিলেন যে, ভারত ও ইংরাজ জাতিধর্মে স্বতন্ত্র—ভারতকে রাখিতে হইলে ইংরাজকে ছাড়িতে হইবে এবং ইংরাজকে রাখিতে হইলে ভারতকে ছাড়িতে হইবে। ইহা কেবল ভাবরাজ্যে ছাড়াছাড়ি নয়, বহির্জ্জীবনেও দুইটিকে সম্পূর্ণ আলাহিদা করিতে হইবে। এইরূপ বিশ্বাসপরায়ণ ব্যক্তি ভারতবর্ষে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারা দেখিয়াছিলেন—ইংরাজ বিনা যুদ্ধে ভারতবর্ষ ছাড়িবে না; অতএব যুদ্ধ-শব্দের মূল অর্থ ধরিয়া তাঁহারা গুপ্তভাবে যুদ্ধায়োজনে প্রবৃত্ত হন।

যুগান্তর-পূর্ব্ব যুগে বাংলায় প্রথম যে যুদ্ধায়োজনের ষড়যন্ত্র হয়, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাহাতে বিরাট্ সঙ্ঘগঠনের প্রচেষ্টা বর্ত্তমান ছিল। ছাত্রবাহিনীকে একত্র করিবার সুখস্বপ্নে তাঁহারা ব্যায়াম-সমিতি প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করেন। সর্ব্বত্র সমিতিপ্রতিষ্ঠা এবং বিদ্রোহভাবপ্রচারের জন্য প্রথমে পরিব্রাজকগণ বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এ সময়ে অধ্যাপক, আইনব্যবসায়ী প্রভৃতি মনস্বীদিগের সহিতই তাঁহাদের অধিক পরিচয় হয়, গুপ্ত প্রচারক-দিগের অপূর্ব্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়া প্রায় সর্ব্বত্রই 'ধন্য-ধন্য' শব্দ উত্থিত হইয়াছিল—প্রচারকগণও পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকটই গমন করিতেন। প্রচার-কার্য্যের দ্বারা বৈপ্লবিক সমিতি-গঠন বিশেষ অগ্রসর হয় নাই, কিন্তু দেশের সর্ব্বত্র নবীন প্রাণের

স্পন্দন অনুভূত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের প্রকাশ্য প্রেরণায় যাঁহারা উদ্বুদ্ধ হইতেন—কবি, শিল্পী, ভাবুক ও দার্শনিক ভিন্ন অন্যে সেই প্রেরণার সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেন না, গৃহত্যাগী না হইলে স্বামীজির সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করিবার সৌভাগ্যও কাহারও হইত না। যাঁহারা গৃহে বসিয়া তাঁহার জাতীয় ও সামাজিক বাণী অনুসরণ করিতেছিলেন, তাঁহারা তাহাতে পূর্ণ তৃপ্তি পাইতেন না। কিন্তু গুপ্ত প্রচারকগণ তাঁহাদের নিজ গৃহেই ব্যায়াম ও আলোচনা-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিবার পরামর্শ দেন, ব্যায়াম ও আলোচনার গৃহই জাতীয়তা ও স্বাধীনতার সাক্ষাৎ বেদীপীঠ, এ কথা বার-বার উচ্চারণ করিয়া প্রচারকগণ তাঁহাদের মধ্যে এক অপূর্ব্ব বিশ্বাসের উদয় করেন ; এই বিশ্বাসবশে বাংলার সর্ব্বত্র স্বাধীনতার চিন্তা ও সঙ্ঘগঠনের ইচ্ছা বলবতী হয়—কিন্তু কার্য্যতঃ সমাজসেবা প্রভৃতি সাধারণ লোকহিতকর কার্য্যেই তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রচারকগণ কলিকাতায় এই কার্য্যে বিশেষ মনোনিবেশ করেন। তাঁহারা স্বহস্তে পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়া যুবকদিগের মধ্যে লাঠিখেলা ও বিভিন্ন প্রকারের ব্যায়ামপ্রবর্ত্তনের জন্য সমিতি গঠন করেন। ভাবচর্চ্চার জন্যও তাঁহারা সর্ব্বদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রভৃতির পঠন ও পাঠনের ব্যবস্থা করেন। মরণ-জয়ের জন্য গীতা প্রভৃতি পাঠেরও ব্যবস্থা ছিল। যুবক-মনে বীর-প্রেরণাময় নবীন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে অশ্বারোহণ ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারেরও ব্যবস্থা হইত। এ সময়ে কলিকাতার একজন প্রধান ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র বঙ্গদেশের বিপ্লবী-চিন্তার নায়কত্ব করিতেন, বারীন্দ্রকুমার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন—নিরালম্ব স্বামী বা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বসু, সখারাম গণেশ দেউস্কর এবং ভূপেন্দ্র-

নাথ দত্ত প্রভৃতি এই সময়ে বৈপ্লবিক সমিতি সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা ও অবদান সংযোগ করিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পাকিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই বৈপ্লবিক নেতৃদিগের মধ্যে সামান্য মতানৈক্য দৃষ্ট হয়; কিন্তু বারীন্দ্রকুমারের আগ্রহাতিশয্য যেদিকে তাঁহাকে টানিতে থাকে, সেই দিকেই নব-নব উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশ পাইয়া বাংলাকে নূতন পথে লইয়া যায়। বারীন্দ্রকুমারের সহিত মতানৈক্যের ফলে নিরালম্ব স্বামী বৈপ্লবিক দল ত্যাগ করেন। পূর্ব্বোক্ত সমিতি যথারীতি বৈপ্লবিক পরিকল্পনা (Plan) অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন নীতি অনুসরণপূর্ব্বক যুবকদিগের মধ্যে ব্যায়ামচর্চ্চার প্রসার করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন বেশ পাকিয়া উঠে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বাঙ্গলার সমগ্র উচ্ছ্বাসকে বিপ্লবের পথে গড়াইয়া দিতে বারীন্দ্রকুমার দেবব্রত, সখারাম, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতির সহায়তা লইয়া যুগান্তর প্রকাশ করেন। ইহাতে সত্যই বাংলায় যুগান্তরের সৃষ্টি হয়—বাঙ্গালী বিপ্লবপন্থী একপথ ত্যাগ করিয়া যে অন্য পথ অবলম্বন করিল, তাহা বোধহয় তখন কেহ বুঝিতে পারেন নাই, যাহার শক্তি-সূর্য্যে উত্তপ্ত হইয়া বারীন্দ্রকুমার প্রকাশ্য বিপ্লব-নীতিপ্রচারে অগ্রসর হন। বাংলার সেই আন্দোলন-সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইলে, বারীন্দ্রকুমারকে হা-হতোস্মি অবস্থায় পতিত হইতে হয়। বাঙ্গালীও তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করে নাই, বরং অসহায় বাঙ্গালী তাঁহার উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া লজ্জানিবারণে তৎপর হয়। এ গুরুভার বহন করিবার শক্তি বোধহয় বারীন্দ্রের ছিল না, ইহা তাঁহার বুদ্ধিগ্রাহ্য না হইলেও তাঁহার অন্তরাত্মা বোধহয় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, তাই এই সময়ে অধ্যাত্মবলসঞ্চয়ে তাঁহাকে দৌড়াদৌড়ি

করিতে হয়। ব্রাহ্মণ উপেন্দ্রনাথ একই উদ্দেশ্যে তাঁহার সহিত ফিরিতে থাকেন। ইঁহারা অধ্যাত্মবলের তত ধার সেদিন ধারিতেন না, ভাবুকতার গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিবার ইঁহাদের অভ্যাসও তখন ছিল না, কিন্তু ইঁহাদের প্রচণ্ড বিশ্বাসের পশ্চাৎ ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনা ও বিশাল ভাবুকতা যেন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাই যখনই দেখিয়াছি—বিশ্বাসের অগ্নিদূতগণ একটা মানসিক ঝটিকায় পতিত হইয়াছেন, অমনই তাঁহাদের মধ্যে ভাবুকতা ও আধ্যাত্মিকতা হিল্লোলিত হইয়াছে। এই হিল্লোলে যাঁহারই বিশ্বাস একটু দ্রব হইয়াছে, তিনিই ভাবুকতা ও আধ্যাত্মিকতার আস্বাদনে মগ্ন হইয়াছেন। বারীন্দ্রকুমারের সহিত কলহের ফলে নিরালম্ব স্বামী প্রকৃত সন্ন্যাসজীবনই গ্রহণ করেন, এই সময়ে দেবব্রতও ধর্ম্মজীবনের মূলনীতি সম্পূর্ণতঃ আশ্রয় করেন।

বারীন্দ্রকুমার ও উপেন্দ্রনাথ অবশ্য সে প্রভাব কিছুটা কাটাইয়া ভালয়-ভালয় ফিরিয়া আসেন। বাংলায় তখন অসংখ্য সমিতি। পূর্ব্বোক্ত বৈপ্লবিক সমিতির সহিত সম্পর্কশূন্য সমিতি সকল যুগান্তরের ভাবই পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছিল ; কিন্তু তাহাদের প্রকৃত অনুশীলন-তত্ত্ব তখনও ফুটিয়া উঠে নাই। সন্ধ্যা, যুগান্তর প্রভৃতি সংবাদপত্র-পাঠ ও ব্যায়ামচর্চ্চা ভিন্ন গুপ্ত সমিতির রহস্যভেদ করিতে তাঁহারা তখনও ক্ষম হন নাই, কিন্তু যুগান্তরপাঠের ফলে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের কল্পনা তাঁহাদের জাগিয়াছে। বারীন্দ্রকুমার ফিরিয়া আসিয়া দ্রুতগতিতে মাণিকতলার ষড়যন্ত্র পুষ্ট করিয়া তুলিলেন। বোমাপ্রস্তুতি ইহার প্রধান বিশেষত্ব। বোমার বিশেষত্ব লইয়া বারীন্দ্রকুমার মনে করিয়াছিলেন যে, গভর্ণমেণ্ট তাঁহার এই গুপ্ত-শক্তিকে শতগুণ ভাবিয়া লইয়া মহাব্যস্ত হইয়া পড়িবেন, এক

মহাভীতির তাড়নায় গভর্ণমেণ্ট অর্থশূন্য উৎপীড়নে অগ্রসর হইবেন, তাহাতেই দেশশক্তি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে। তারপর?—তার পরের চিন্তা আর কে করে! যতটুকু চিন্তা করিয়াছি, তাহা শীঘ্র-শীঘ্র কাজে করিয়া যাই।

এই ভাব লইয়া বারীন্দ্রকুমার যত তাড়াতাড়ি ষড়যন্ত্র পুষ্ট করিলেন, একরূপ তত তাড়াতাড়িই তাহা বিনষ্ট হইল। মুজঃফারপুর বোমা উপলক্ষ্যে তাঁহারা ছত্রভঙ্গ অবস্থায় ধৃত হইলেন; তাঁহাদের বাকি যে কয়জন ছিলেন, তাঁহারাও অতিশীঘ্র ধরা পড়িলেন। আদালতে তাঁহাদের স্বীকারোক্তির মূলে, ক্ষণেকের তরে তাঁহাদিগকে মানসিক দৌর্ব্বল্য আশ্রয় করিয়াছিল—ইহা অবশ্য মনে করি না। বারীন্দ্রকুমার দেশের যুবকপ্রাণে প্রেরণা-বিস্তারের গূঢ় অভিপ্রায়েই দলের সহযোগীদের গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিতে নির্দ্দেশ দিলেন ও নিজেও করিলেন। তাহার কিছু ফলও ফলিল—তাঁহাদের এই গুপ্তচক্রান্তের নীতির পথানুসরণে বাংলার দেশপ্রাণ যুবকদল মাতিয়া উঠিল। খাঁটি বৈপ্লবিক সমিতি ভিন্ন অন্য সমিতি সকল মাণিকতলা ষড়যন্ত্র কাহিনীর প্রতি বর্ণ হইতে যে কত উদ্দীপনাময় প্রাণস্পন্দন ও ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইল, তাহা কে বর্ণনা করিবে? তৎপরে জেলের বিরাট্ কীর্ত্তি—কানাইলাল কর্ত্তৃক নরেন গোস্বামীর অগ্নিনালিকায় মৃত্যুদণ্ড বঙ্গের যুবকমহলে বড় রোমাঞ্চকর স্বপ্নের সৃষ্টি করে—তাহারা মনে করে বুঝি প্রাণের বদলে প্রাণ লইয়া বাঙ্গালী এই ভাবেই স্বাধীনতার দুর্গম পথ অনায়াসে মুক্ত করিবে—ইতিহাসে অমর কীর্ত্তি তাহারা রাখিয়া যাইবে।

এই কীর্ত্তির জন্য বাঙ্গালীর ছেলে পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। যুগান্তর-পূর্ব্ব বৈপ্লবিক সমিতিগুলি ইহাতে তেমন মত্ত হন নাই,

কিন্তু উঁহাদের সম্পর্কশূন্য বাংলার কাঁচা কাঁচা সমিতি সকল কোথাও স্বতন্ত্রভাবে, কোথাও একত্র হইয়া গুপ্তহত্যা ও অর্থসংগ্রহের জন্য ফিরিতে থাকেন। আলিপুর মোকদ্দমার প্রথম দফার রায়ের পরে ১৯০৯ সালে তাঁহারা একটু শান্ত হন, দল গুছাইতে আরম্ভ করেন। ইতিপূর্ব্বে পুলিনবাবুকে অবরুদ্ধ করায় ঢাকার অনুশীলন সমিতির বিশেষ বিশৃঙ্খলা হয়; পরে তাঁরাও নিজদিগকে গুছাইয়া লন এবং পুলিনবাবুর আগমনে তাঁহাদের পূর্ব্বধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলেন। কিন্তু পুনরায় আলিপুর মোকদ্দমা সম্পর্কেই ১৯১০ সালে বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক সামসুল আলমের হত্যার ফলে বাংলায় দুইটি বৃহৎ ষড়যন্ত্র মামলা চলিতে থাকে। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অপ্রত্যাশিত গুরুতর আঘাতে বোধহয় কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গের দল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। ইঁহারা যুগান্তরপূর্ব্ব বৈপ্লবিক নীতি গ্রহণ করিয়া বৃহৎ দল গঠন ও বিপ্লবের স্বপ্ন তত জাগরিত করিয়া তুলেন নাই, অধিকন্তু মাথার বদলে মাথা লইবার ভাবটিই তাঁদের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। তবে ইঁহারাও সুদূর স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগাইয়া তুলিতে বিভিন্ন উপায়ে ছাত্রদিগের মনোরাজ্য অধিকার করিতে থাকেন—অনেক ছাত্র জানিতই না যে, অতশীঘ্র তাহাদিগকে রক্তগঙ্গায় অবগাহন করিতে হইবে।

অনুশীলন সমিতি কিন্তু সর্ব্ব ঝঞ্ঝা মাথায় লইয়া অগ্রসর হইতে থাকেন, সমিতির নায়কগণ গুপ্তভাবেই অবস্থান করেন। বৃহৎ-বৃহৎ ষড়যন্ত্র মামলার ফলে বাংলায় গুপ্তদলগঠনের এক নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহারা জাতীয়তার অনুশীলন করিতেন এবং নয়-জনের অনধিক ব্যক্তির মধ্যে তাঁহাদের গুপ্তনীতি আবদ্ধ রাখিতেন; এই নয়জনের মধ্যে নায়ক যিনি, তিনি অন্য নয় জন-বিশিষ্ট

দলের নায়কের সহিত কেবল সম্পর্ক রাখিবার অধিকার পাইতেন। এই ধারা কিন্তু বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। বলা বাহুল্য, মধ্যে-মধ্যে নরহত্যা প্রভৃতি ত্রাসোৎপাদনমূলক কার্য্যের জন্য তাঁহারা নিজদিগকে প্রস্তুত রাখিবেন স্থির করিয়াই এই ধারা-প্রবর্ত্তনে উদ্যোগী হন। বিপ্লবায়োজনের ষড়যন্ত্র ভিন্ন শাসকসম্প্রদায়ের মনে ভীতি উৎপাদন করার কার্য্যের প্রতি বাঙ্গালীর বেশ একটু লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যে দেশের সহানুভূতি অধিলভ্য দেখিয়া অনুশীলন সমিতি নিজ বিপ্লবমতের সহিত এই কার্য্যটি গ্রহণ করেন। ফলতঃ, চন্দননগর সমিতি ও অনুশীলন সমিতি ১৯১১ হইতে ১৯১৪ সালের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বঙ্গে ও উত্তর ভারতে রাজনীতিক্ বিক্ষোভের তত্ত্বপ্রচার ও কর্ম্মায়োজনে ব্যাপৃত থাকেন। কিন্তু অন্যদিকে বাংলার ছাত্রমণ্ডল বিভিন্ন সমিতির সহিত সংযুক্ত থাকিয়া বঙ্গীয় বিপ্লবিদিগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন। সশিষ্য যতীন্দ্রনাথ, আত্মোন্নতি সমিতি, মাদারীপুর সমিতি, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও উত্তরবঙ্গ সমিতি—প্রত্যেকেই বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে স্বাধীনতা-যজ্ঞের উপাসক করিতে যত্ন করিতেছিলেন, মাদারীপুর ভিন্ন অন্যান্য সমিতি বেশ নির্ব্বিঘ্নেই কার্য্য করিতেন।

এইরূপ বিপ্লবসাধনা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। বিংশশতাব্দীর প্রথম হইতেই ইহার আরম্ভ এবং যুগান্তরের আবির্ভাবের পরেই ইহার প্রকৃতির সম্যক্ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গিয়াছে। ঘাত-প্রতিঘাত অবলম্বন করিয়া বৈপ্লবিক সমিতি সকল স্বাধীনতার আদর্শ ছাত্রমহলে পরিস্ফুট করিয়াছেন; স্বাধীনতার মূল্য জীবনদান চাই, এ ধারণা বাংলায় বদ্ধমূল হইয়াছে—কিন্তু নেতৃবর্গের মধ্যেও বিপ্লবের মূল ও জাতীয়তার মূল সম্বন্ধে গভীর চিন্তাসমূহ আশ্রয়

লইয়াছে, ইহা আমরা বেশ পরিস্ফুট দেখি নাই। তবে জীবনের আদর্শ লইয়া ঘোরতর পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে।

লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছে। যে সকল সমিতি সাক্ষাৎভাবে ইহাতে লিপ্ত থাকেন নাই, তাঁহারা ইহার ভাল ও মন্দ সম্বন্ধে বেশ আলোচনা করিয়াছেন, যুগান্তর-পূর্ব্ব প্রাচীন মতবাদ কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট হইয়া অনেকেরই মনে এই সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছে যে, লুণ্ঠনে ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইলে, বিপ্লবোদ্দেশ্যে বৃহৎ সঙ্ঘগঠন অসম্ভব হইবে। কিন্তু শঙ্কাবিহীন জীবন গঠন করিতে যে কার্য্য যিনি সহায়সূচক মনে করিতেন, তিনি সেই কার্য্যেই প্রশ্রয় দিতেন। বৈপ্লবিক নীতির (policy) পরিবর্ত্তে শঙ্কাশূন্য বৈপ্লবিক চরিত্রগঠনই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চরিত্রগঠনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইবার পরেই বিশ্বাসের অগ্নিস্ফুলিঙ্গগণ গভীর ভাবুকতায় নিমগ্ন হন। স্বামীজির ভারত-সাধনা জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিয়া ভারতীয় ভাবুকতায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ভারতীয় বৈশিষ্ট্য তখন আপন মাহাত্ম্যেই বিভোর হইয়া আছে। মহিমামণ্ডিত ভারতীয় ভাবুকতা অনন্ত ধারা বর্ষণ করিয়া ভারতবাসীর চিত্তকোষ পূর্ণ করিতেছে। অগ্রগতির জন্মগত অধিকার লইয়া যাঁহারা বিপ্লবটীকায় ভূষিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের তেজঃশক্তিও এই মহিমায় মুগ্ধ হইয়াছিল। ভারতে জন্মলাভ করিয়া কে না চায় ভারতীয় বিশিষ্টতা অর্জ্জন করিতে? ভারতজননীর পাদপদ্মে জীবনাঞ্জলি দিয়া কে না চায় তাঁহার প্রকৃত স্বরূপের সাধনা করিতে? কিন্তু অগ্নিহোতারা চাহিয়াছিলেন—ভারতশক্তি জীবন-মধ্যে আবির্ভূতা হউন, বৃথা তর্কজাল বিস্তার করিয়া ইহা ইউরোপীয় বিপ্লববাদ, উহা ভারতীয় সাধনা, এইরূপ বিশ্লেষণের পক্ষে যুবকশক্তি

যেন নিমগ্ন না হয় ; ইহাতে কাপুরুষতাই বৃদ্ধি পাইবে। অনেকেই মনে করিতেন—জীবনাহব হইতে দূরে সরিবার ইচ্ছাকেই ইঁহারা ভারতীয় মহিমাছটায় গোপন রাখিতে চান। সার্ব্বজনীন বিপ্লব-নীতির উল্লেখ করিয়া যাঁহারা লুণ্ঠন ও নরহত্যা ত্যাগ করিবার পরামর্শ দিতেন বা জাতীয়তার উপাসক বৈপ্লবিকগণ যখন লুণ্ঠনের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন, তখন ভুক্তভোগী বা বর্ত্তমান অবস্থাভিজ্ঞ বৈপ্লবিক অগ্নিহোতৃগণ সর্ব্বমতের মধ্যেই হয় কাপুরুষতা, না হয় বিপ্লববিমুখ রাজনীতিক কাপালিক (anarchist ও terrorist) ভাব আরোপ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে আপন কার্য্যে অগ্রসর হইতেন। এই নিশ্চিন্ততাই বাঙ্গালী বিপ্লবভৈরবদিগের বিশেষত্ব ; কিন্তু তাঁহাদেরই ন্যায় এক সময়ে যাঁহারা চিন্তাশূন্য নির্ভীক বিপ্লবজীবন যাপন করিতেন, তাঁহাদের চিন্তাবৈচিত্র্য লক্ষ্য না করিয়াও থাকা যায় না।

ইহার প্রথম অবস্থায় দলাদলির ভাব পরিস্ফুট হয়। দেবব্রত বসু শ্রীরামকৃষ্ণমিশনে প্রবেশ করিয়া বা তৎপূর্ব্বে বঙ্গীয় বা ভারতীয় বিপ্লবনীতির ইউরোপীয় মূল আবিষ্কার করেন ; তিনি বঙ্গীয় তরুণদের অন্তঃকরণ হইতে ইউরোপীয় মূল উৎপাটন করিয়া তাহাতে ভারতের সাধনবীজ উপ্ত করিবার জন্য বিশেষ চিন্তা ও চেষ্টা করেন। ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতা মাখনলাল সেন তাঁহার মত গ্রহণ করেন ; তিনি বিপ্লববাদের অপদার্থতা, বিপ্লব-বাদের বৈদেশিকতা, বিশেষতঃ বিপ্লবপন্থীদের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে ঘোরতর তর্ক তুলিয়া অনুশীলনসমিতির মধ্যে অন্তর্বিপ্লব আনয়ন করেন—রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শে সমগ্র যুবকশক্তিকে একত্র করিয়া মূল ভারতীয় সাধনায় তাঁহাদের অন্তঃকরণ বিধৌত করিবার বিরাট্

কল্পনা লইয়া তিনি কিছুদিন অল্পবয়স্ক নিশ্চিন্ত বিপ্লবপন্থীদের মধ্যে চিন্তা-সমস্যার সৃষ্টি করেন।

অন্যদিকে ভারত-ভাবুকতার আশ্রয় লইয়া ভারতীয় তপোবীর্য্যের উদ্বোধন লক্ষ্যে একাধারে ভারতীয় জীবনসাধনা (শুধু ভাবসাধনা বা তত্ত্ববিচার নহে) ও রাষ্ট্রীয় বৈপ্লবিক কার্য্যগ্রহণ ও সম্পাদন করিবার স্পর্দ্ধা চন্দননগর ও বঙ্গের কয়েকটি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলের মধ্যে জাগরিত হয়—তাঁহাদের বিচিত্র চিন্তাভঙ্গী এই সময়ে বঙ্গের বিপ্লবসাধনাকে সঞ্জীবিত রাখে। দেবব্রত বসু ও মাখনলাল সেনের প্রবল প্রয়াস কোন-কোন ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হইলেও, অনুশীলন সমিতি তাহাতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, তাঁহাদের নায়কগণ চন্দননগর দলের ভাবুকতা ও সাধনার মধ্যে বিপ্লবের স্থান দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতেন, এবং মাখনলাল সেনের আক্রমণের বিরুদ্ধে ইহা যে একটি নূতন অস্ত্রস্বরূপ, তাহা বুঝিতেন; কিন্তু তাঁহাদের গুপ্তনীতি সার্ব্বজনীন বিপ্লবনীতিরই প্রেরণা চাহিত, তজ্জন্য চন্দননগরের বিশিষ্ট জাতীয় মত ও সাধনার তত্ত্ব তাঁহারা যুবকমহলে প্রচার করিতেন না, ইঁহাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রচার করিয়া যুবকমহলে বিপ্লবের উদ্দেশ্যে প্রাণঢালা উৎসাহের মধ্যে গভীর ও বিচিত্র জীবনরহস্যের পথ উন্মোচন করিতেন না—চন্দননগর ও রাসবিহারী যে তাঁহাদেরই মতাবলম্বী, ইহাই অনুশীলন সমিতির নায়কগণ ভিন্ন সকলেই পরিজ্ঞাত ছিলেন।

অন্যান্য সমিতি এই সব জটিল প্রশ্নে তত আত্মনিয়োগ করিতেন না, তাঁহারা বিপ্লবভাবসূত্রে গ্রথিত আলগা দলগুলিকে কর্ম্মঠ, সঙ্ঘবদ্ধ, ক্ষিপ্র চমূতে পরিণত করিবার জন্য সকল সুযোগই গ্রহণ করিতেন—ভাবরাজ্যে ভারতীয় সাধনা ও ইউরোপীয় বৈপ্লবিক

চিন্তা উভয়ই ইঁহাদের নিকট সমান আদর পাইত। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ভারতীয় সাধনভজন ও তপঃশক্তির দিকে ইঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। বরিশালের প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী নিজে তপঃশক্তি-সম্পন্ন বিশেষ সাধক হইয়া উঠেন। যতীন্দ্রনাথও স্বীয় ভক্তহৃদয়ে গুরু ভোলাগিরির তপঃশক্তির বীর্য্য সঞ্চিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সকলেই বিপ্লবোত্থিত স্বাধীন ভারতেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

ইউরোপে যখন বিধাতার রুদ্র রোল গর্জ্জিয়া উঠে, তখন ভারতীয় বিপ্লবপন্থিদিগের নিকট বিপ্লবোত্থিতা ভারতমাতার বাণী শ্রুত হয়। তাহার বর্ণনা পূর্ব্ব অধ্যায়েই শেষ করিয়াছি। তাঁহারা ইহার জন্য তেমন প্রস্তুত ছিলেন না, তথাপি তাঁহারা যে বিপ্লবময়ী ভারতশক্তির চিহ্নিত সন্তান! তাঁহারা তাই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন —অনেকেই বলিয়াছিলেন "যদি বিজাতীয় সভ্যতা ও সাধনাই আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, আমরা জীবন দিয়া চলিয়া যাইতেছি—ইহাতে ভারত যদি স্বাধীন হয়, হে ভারতপন্থী, তোমরাই তাহার কর্ণধার হইও; আর যদি বিফল হই, আমাদেরই সাথে বিজাতীয়তা দূরীভূত হউক। ভারতের সাধনপথ উন্মুক্ত করিয়া ও ভারতীয় নীতি অবলম্বন করিয়া তোমরা জাতীয়তা বা স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা কর, আমরা তাহাতে বাধা দিব না, আমাদের আত্মাও তাহার বিরোধী হইবেন না—তবে বিপ্লব-চিতায় আমাদের জীবনদানে যদি তোমরা বিঘ্ন অনুভব কর, কাপুরুষ, পথ ছাড়িয়া দাও।" এই ভাব লইয়াই ভারতের বিপ্লবপন্থী আত্মাহুতি প্রদান করিতেন।